নির্বাচিত উর্দু গল্প

অনুবাদঃ মোস্তফা হারুন

নির্বাচিত উর্দু গল্প

অনুবাদ
মোস্তফা হারুণ

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা

বই নং-.....

বই এর ধরন-.....

শুভ্রধারা

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭৭ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ১৯৮১ ইং

মুক্তধারা ৬৪৭

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ-শিল্পী :
আবুল বারক্ আল্‌ভী
মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ
মূল্য : পনর টাকা

NIRBACHITO URDU GALPA
(Selected Modern Urdu Short Stories)
Translated By MUSTAFA HARUN

Second Print : July 1981
Cover Design : Abul Bark Alvi
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca-1
Bangladesh
Price : Taka 15·00

উৎসর্গ

সৈয়দ আবদুল মান্নান

মনিরুদ্দিন ইউসুফ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মোস্তফা হারুণের অন্যান্য বই—

আমি গাধা বলছি, হুমায়ুন নামা, হজরতের পত্রাবলী, পাঁচমিশালী, দেশ বিদেশের মেয়েরা, লাউডস্পিকার, ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ, নীলা হরিণের দেশে, হংকং-এ একরাত, ব্রেইন ফেণ্টাসী, মাণ্টো এবং কালো শেলোয়ার, গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে, গাঁধার আত্মকথা, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস ও ভুট্টো মুজিব জিয়া।

সম্পাদনা ঃ

রমন্যা ডাইজেষ্ট, কবি মোজাম্মেল স্মরণিকা, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পরিচিতি/৭৯ (Who's who in the parliament) যৌতুক।

প্রকাশিত্য—

আশার শতদল (উপন্যাস), দাম্পত্য-কথা (রম্য রচনা) ও হাতের রেখা নয়, লেখা (রস রচনা), কৌতুকী, দাঙ্গা (অনুবাদ) ও কৃষণচন্দরের শ্রেষ্ঠ গল্প।

নিবেদন

১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আমি প্রায় অর্ধ শতাধিক উর্দু গল্প অনুবাদ করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে তা দেশের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে। এই গল্প-সম্ভার থেকে বাছাই করে একটি অনুপম গল্প সংকলন পাঠকদের উপহার দেয়া হলো। আশা করি উপমহাদেশের সব রকমের গল্প পড়ার স্বাদ পাঠকরা এই একটি বই থেকেই পাবেন।

এই গল্পগুলো বাছাই করার সময় দুটি বিষয়ে আমি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তাহলো, উর্দু ছোটগল্পের জনক মুন্সী প্রেমচান্দ থেকে শুরু করে আজকের নবীন উর্দু লেখকদের মাঝে মোটামুটি একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক গত বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখা।

বইটি প্রকাশের মুহূর্তে আজ আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে সাপ্তাহিক পূর্বদেশের সম্পাদক ও 'নটীর প্রেম' খ্যাত সাহিত্যিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস-এর কথা। প্রথম দিকে আমি কবিতা ও ছোটগল্প লিখতাম। কিন্তু তা থেকে হঠাৎ অনুবাদের জগতে প্রবেশ করার পেছনে কাজী ভাইর প্রথম প্রেরণা আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা। কাজী ভাই বলেছিলেন, আমাদের এখানে অনুবাদের বড় অভাব। তুমি অনুবাদ করো, আমি "তিতাস বুক্‌স' থেকে তোমার একটা সংকলন করিয়ে দোব। কিন্তু আজ তিতাসও নেই, কাজী ইদরিসও নেই এবং সেই প্রস্তাবিত সংকলন বের হলো দীর্ঘ দেড় দশক পরে মুক্তধারা থেকে।

বইটিতে এমন দু'একটি গল্প রয়েছে যেগুলোর অনুবাদ প্রথম দিকের এবং কিছুটা কাঁচা হাতের ছাপ রয়েছে তাতে। সময়ের স্বল্পতার জন্য লেখাগুলো মাজাঘষা করা সম্ভব হয়নি। আগামীতে সংকলনটিকে আরো পরিমার্জিত করার ইচ্ছে রাখি। সহৃদয় পাঠকরা যদি বইটির উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।

২০শে জুলাই ১৯৭৭

—মোস্তফা হারুন
বি ৭৫/জি-৮
মতিঝিল কলোনী ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

সারাদেশে 'নির্বাচিত উর্দু গল্প'ই একমাত্র গল্প সংকলন, যাতে উপমহাদেশের সেরা উর্দু লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনা পেশ করা হয়েছে। উর্দু ছোটগল্পের ঐন্দ্রজালিক ভুবন সম্পর্কে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকরা পাকিস্তানী আমল থেকেই ওয়াকেফহাল। উর্দু গল্পের রোমান্টিকতা, বিষয় বৈচিত্র্য এবং সার্বজনীনতা স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের মন কেড়ে নেয়। ফলে আজ দেশে প্রায় ৫০টি উর্দু গল্প উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম নিবেদনেই বলা হয়েছে এই গল্প সংস্করণটির আয়োজন করা হয়েছিল প্রায় দেড় দশক আগে। ইতিমধ্যে উর্দু ছোটগল্পের জগতে আরো কিছু নতুন লেখক পদার্পণ করেছেন এবং ছোটগল্পের আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সুযোগের অভাবে এসব লেখকদের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। বইটির আগামী সংস্করণে এদের কয়েকটি লেখা সংযোজনের ইচ্ছা রইল। অচিরেই এই বইর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোক এই আশা নিয়ে আজ ইতি টানছি।

মোস্তফা হারুণ

১০ই জুলাই, ১৯৮১ ইং

১২০/৪০ উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা--১৭

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

সূচী

৯ পঞ্চায়েত/মুন্সী প্রেমচান্দ
১৮ করিম খান/কৃষণ চন্দর
২৩ শহীদ/সা'দত হাসান মান্টো
৩০ রামুর হাঁসুলী/খাজা আহমদ আব্বাস
৩৬ সেই দুটো চোখ/কুররাতুল আইন হায়দার
৫১ অনাথ আশ্রম/কুদরতুল্লা শাহাব
৬১ খালি বোতল/সা'দত হাসান মান্টো
৬৯ পরিখা/রবীন্দ্র সিংহ
৭৪ মা/কুদরতুল্লা শাহাব
৮৬ কারমিন/কুররাতুল আইন হায়দার
৯৯ দুই চোর/আনোয়ার খাজা
১০৫ রীতা গুজরাল/রামলাল
১১১ শেরগুল/আবু সাইদ কোরায়শী
১১৫ বি, ডি, ইসরানী/কৃষণ চন্দর
১২৩ দ্বন্দ্বরাজ/মুন্সী প্রেমচান্দ
১৩০ চতুর্থ পথ/বেজাহাত আলী সিন্দিলুভী
১৩৭ ভেজাল/সা'দত হাসান মান্টো
১৪২ ডাকাত/খোদেজা মাসতুর
১৫১ ঠাণ্ডা-গোস্ত/সা'দত হাসান মান্টো
১৫৭ কুকুর/হাজেরা মসরুর
১৬২ রেলওয়ে জংশন/কুদরতুল্লা শাহাব
১৬৯ পরাজিত/সা'দত হাসান মান্টো
১৭৪ পর্যটক/কুররাতুল আইন হায়দার
১৮৩ সোনার চুড়ি/খাজা আহমদ আব্বাস

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection
বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

পঞ্চায়েত

মুন্সী প্রেমচান্দ

জুমন শেখ এবং আলগু চৌধুরীর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। তারা ভাগে চাষাবাদ করতো। কায়কারবারও অনেকটা একত্রে ছিল। এ ওর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখতো। যে বারে জুমন হজ করতে গেলো, ঘর-সংসার আলগুর হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল। আর আলগুও যখন কোথাও যেত, জুমনের উপর তার সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে যেত। তারা না ছিল একবাড়ীর না একান্নভুক্ত। শুধু সমখেয়ালী ছিল এবং এটাই বন্ধুত্বের আসল কারণ।

এই বন্ধুত্বের জন্ম সেকালে হয়েছিল যখন ছেলে দুটি জুমনের শ্রদ্ধাস্পদ পিতা শেখ জুমরাতির সামনে নতজানু হয়ে বসত। আলগু ওস্তাদের বেশ কদর করেছিল। অনেক বাসন-কোসন মাজত, খুব করে পেয়ালী ধুয়ে দিত আর দমে দমে তামাক সেজে হাজির করতো। এই সেবা-যত্নের মধ্যে শিষ্যসুলভ আনুগত্য ছাড়া প্রচ্ছন্ন আর অন্য কিছুই ছিলনা, এটা আলগু জানতো। আলগুর বাপ সেকেলে-টাইপের লোক ছিল। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ওস্তাদের সেবা-যত্নের উপর খুব ভরসা রাখত। সে বলতো, ওস্তাদের দোয়া চাই। যা কিছু হয় ফয়েজেই হয়। যদিও ওস্তাদের ফয়েজ বা দোয়া আলগুর উপর পড়েনি তবু সে নিশ্চিত ছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার কোন সূক্ষ্ম প্রচেষ্টাও সে বাদ রাখেনি। আসলে বিদ্যা তার তকদীরেই ছিল না। শেখ জুমরাতি স্বয়ং দোয়া বা ফয়েজের ব্যাপারে বেত্রাঘাতেরই বেশি পক্ষপাতি ছিলেন। এবং জুমনের উপর তার যথার্থ প্রয়োগ করেন। ফলে, আজ এ তল্লাটের সবখানে জুমনের দেদার পূজা চলছে। তার বয়নামা এবং রেহেননামার পাকা মুসাবিদায় ঝানু তহশীল-দারও কলম ধরতে পারে না। এলাকার পোস্ট ম্যান, কনস্টেবল এবং তহশীলের চেলাচামুণ্ডা সবারই কাছে তার যশস্বী হাতের খুব খ্যাতি। ধনদৌলত আলগুকে সম্ভ্রান্ত করে দিয়েছে বটে ; কিন্তু জুমনও অপরিসীম বিদ্যার খ্যাতিতে প্রোজ্জ্বল।

শেখ জুমনের এক বুড়ী বিধবা খালা ছিল। তার হাতে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল। কিন্তু নিকটতম উত্তরাধিকারী কেউ ছিল না। জুমন ভাবী সুখের রঙীন প্রতিশ্রুতি দিয়ে খালাম্মার সম্পত্তি নিজের নামে করে নিল। যে পর্যন্ত হেবা নামা রেজিস্ট্রী হয়নি, খালাম্মার খুব যত্ন আত্তি হতো। খুব মিষ্টি লোকমা এবং সুস্বাদু সালুন খাওয়াতো। কিন্তু রেজিস্ট্রীতে সীল মোহর হোতেই সেবা-যত্নেও মোহর পড়ল। জুমনের বউ ফাহিমন রুটির সাথে কিছু তিক্ত কথার সালুনও দিতে শুরু করল। এবং আস্তে আস্তে সালুনের পরিমাণ রুটিকে অতিক্রম করে গেল। —বুড়ীর মরার ইচ্ছা কি একটুও নেই? অনাবাদী দু'তিন বিঘা যা দিয়েছে, তাতো কেনার-ই শামিল। বেশি ডাল না দিলে রুটি গলার নিচে যেতে চায়না। যত টাকা তার পেট পূজায় গিয়েছে তা' দিয়ে গোটা গ্রামই কিনে ফেলা যেত এতদিনে। প্রথম প্রথম খালা এসব শুনল এবং সয়ে রইল। কিন্তু যখন আর সহ্য হলনা তখন জুমনের কাছে এসে ফরিয়াদী হল। জুমন সন্ধি-প্রিয় লোক। কাজেই ঘরোয়া ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করা ভাল মনে করলো না। তাই আরো কিছুদিন খালার কেঁদেকেটে কাটল। শেষে এক দিন খালা জুমন কে বলল, 'বেটা তোমার সাথে আমার থাকা চলবে না। তুমি আমাকে টাকা দাও, আমি আলাদা পাক করে খাই।'

জুমন হৃদয়হীন হয়ে জবাব দিল, 'টাকা কি এখানে গাছে ফলে?' খালা বিগড়ে গিয়ে বলল, 'তা হলে আমার খাবার ব্যবস্থা হবে কি হবে না?' জুমন নিষ্ঠুরের মত জবাব দিল, 'কেন হবে না? আমার রক্ত চুষে নাও। অনেকেই একথা জানেনা যে, তুমি খাজা খিজিরের পরমায়ু নিয়ে এসেছ।' খালা নিজের মরার কথা শুনতে পারত না। কাণ্ডজ্ঞান হারা হয়ে পঞ্চায়েতের ধমকি দিল। জুমন শুনে হাসল। বিজয়ীর হাসি। জালবদ্ধ হরিণীর দিকে যেতে যেতে যেমন করে শিকারীরা হাসে। বলল, 'হাঁ, নিশ্চয়ই পঞ্চায়েত করো। ফয়সলা হয়ে যাক। আমারও রাতদিন আর ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগেনা।'

এর পর বুড়ী খালাম্মা ক'দিন ধ'রে লাঠি হাতে এপাড়া ওপাড়া এ গ্রাম ও গ্রাম চক্কর দিতে লাগল। কোমর ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। এক পা চলাও মুস্কিল, কিন্তু করা কী? কথা যখন এসে পড়েছে, এর বিহিত হওয়া চাই।

শেখ জুমনের স্বীয় শক্তি, দৃঢ়তা এবং তর্ককৌশলের উপর নিজের

পুরা আস্থা ছিল। সে কারো কাছে ফরিয়াদ করতে গেল না।

বুড়ী যথাসাধ্য আহাজারী করলো। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, কেউ এদিকে মাথা দিলনা। শুধু 'হু' করেই সরে পড়ল, অনেকে আবার কেউ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিল। 'বুড়ীর কাণ্ডটা দেখনা? কবরে পা দিয়ে বসে আছে, আজ মরলে কাল হবে দু'দিন। বলি, তোমার এখন ঘর-বাড়ী জমা-জমির দরকারটা কি বাপু। এক লোকমা খাও, ঠাণ্ডা পানি পান করে খোদাকে স্মরণ করো'। বেশীর ভাগ লোকই উপহাস করলো। শীর্ণ কোমর, ফোকলা মুখ, শ্বেত শুভ্র কেশ এবং বধির---যখন এতগুলো উপহাসের উপকরণ রয়েছে, তখন হাসি আসাতো স্বাভাবিক। চারদিকে ঘোরাফেরা করে অবশেষে বৃদ্ধা আলগু চৌধুরীর কাছে এসে লাঠি ঠুকল। এবং দম নিয়ে বলল, 'বাবা, তুমিও একটু পরে আমার পঞ্চায়েতে চলে এসো---আসবে তো বাবা!'

আলগু বিমুখ হয়ে বলল, 'আমাকে ডেকে কি করবে? কয়েক গ্রামের লোকত আসবেই।' খালা হাঁপিয়ে বলল, কি জানি আমার ফরিয়াদ তো সবার কানে ঢেলে দিয়ে এসেছি। আসা না আসার খবর আল্লাহ্ জানে। আমার কান্না কি কেউ শুনবে না?

আলগু বলল, 'তা আসার দরকার যখন আসব, কিন্তু পঞ্চায়েতে মুখ খুলবনা।' খালা বিস্মিত হলো, 'কেন বাবা?' আলগু নিষ্কৃতি পাবার জন্য বলল, 'এখন তার কি বলব? যার যার মন। জুমন আমার পুরাণ বন্ধু। আমি তার বিপক্ষে যেতে পারি না।' খালা শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাল। 'বিপক্ষের ভয়ে কি ঈমানের কথা বলবে না?'

সন্ধ্যাবেলায় এক গাছের নিচে পঞ্চায়েত বসল। বসবার পুরো সতরঞ্চি এবং হুক্কা পানিরও বন্দোবস্ত হয়েছে। অবশ্য শেখ জুমনের সৌজন্যে। সে আলগু চৌধুরীর সাথে একটু দূরে গিয়ে বসেছিল। ফাঁকে ফাঁকে কেউ আসলে দীর্ঘ আদাব দিয়ে তাকে সে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শুধু তাদেরকেই দেখা যাচ্ছে, যারা জুমনের সন্তুষ্টির কোন পরোয়াই করেনা। পাজীগুলো তাদের অনুকূল পরিস্থিতি দেখে দলে দলে এসে ভিড় জমাচ্ছে।

যখন পঞ্চায়েত পুরোপুরি বসে গেল, বৃদ্ধা খালা সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, 'পাঞ্চু, আজ তিন বছর হলো আমি আমার সব সম্পত্তি বোন-পো জুমনের নামে লিখে দিয়েছি তা' আপনারা বেশ জানেন। বিনিময়ে জুমন আমার আজীবন খানাপিনার ওয়াদা দিয়েছে। এক বছরের ওপর ত আমি কেঁদেকেটে কাটালাম জুমনের

সাথে। কিন্তু এখন আর রাতদিন এসব সয়না। বলতে গেলে আমি পেটের খাবার টুকুও পাইনা। আমি অসহায় বিধবা। মামলা মকদ্দমা করতে পারিনা। তোমাদের ছাড়া আর কার কাছে ফরিয়াদ করবো? তোমরা যে পথ বের করে দেবে সেই পথেই চলব। কোন আপত্তি করবনা। যদি আমার কোন দোষ থাকে তো মুখে জুতা মারো জুমনের কোন অন্যায় দেখতো তাকে বোঝাও! কেন এক অসহায়াকে সে এত কষ্ট দেবে?"

রামধনজী মিছির বলল, 'জুমন মিয়া, বিচারক কাকে মানবে এখনি ঠিক করে নাও।'

জুমন সবাইর প্রতি একটা আড় দৃষ্টি ফেলল। সে যেন বিরোধী-দের কাবুতে পড়েছে। বীদরর্পে বলল, 'খালাজান যাকে চায় করে নিক। আমার কোন আপত্তি নেই।' খালা চিৎকার করে বলে উঠল, 'আরে খোদার বান্দা, নামটা বলে ফেললেই তো হয়।' জুমন বৃদ্ধার দিকে কড়া চোখে চেয়ে বলল, 'আমার মুখ কিন্তু খুলিও না। যাকে চাও বানিয়ে নাও।' খালা প্রতিবাদ করে বলল, 'বেটা, আল্লাকে ভয় করো। আমার জন্য কেউ আর নিজের ঈমান বিকাবে না। এত লোকের মধ্যে সবাই কি তোমার শত্রু? আচ্ছা সবাইকে যেতে দাও—আলগু চৌধুরীকে তো মানবে?'

জুমন খুশিতে ফুলে উঠল। সংযত হয়ে বলল, 'বেশ আলগু চৌধুরীই হোক। আমার কাছে রামধনজী যেমন আলগুও তেমন।'

আলগু হাত নেড়ে উঠল। সে এই ঝামেলায় মাথা দিতে চায় না। আপত্তির স্বরে বলল, 'বুড়ীমা, তুমি বেশ জান, জুমন এবং আমার মধ্যে বন্ধুত্ব আছে।' খালা বলল, 'বেটা, দুস্তির জন্য কেউ নিজের ঈমান নষ্ট করেনা। বিচারকের রায় আল্লার রায়। বিচারকের মুখ দিয়ে যে কথা আসে তা' আল্লার পক্ষ থেকে আসে।'

আলগুর আর কোন উপায় রইল না। সে বিচারকদের মধ্যমণি হয়ে বসল। কিন্তু রামধনজী মনে মনে বৃদ্ধাকে অভিশাপ দিতে লাগল। আলগু চোধুরী বলল,—'শেখ জুমন, তুমি এবং আমি পুরানো বন্ধু। দরকার মত তুমি আমায় সাহায্য করেছ। আমার দ্বারাও যতটুকু সম্ভব তোমার সহানুভূতি ও সহযোগিতা হয়েছে। কিন্তু এ সময় না তুমি আমার বন্ধু, না আমি তোমার। এখানে ন্যায়নীতির কথা। খালাজান নিজের কথা সবাইকে শুনিয়েছে, তুমিও কিছু বলার থাকলে বল।'

জুমন গর্বদীপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল, 'পঞ্চ' আমি খালাকে মা বলেই জানি। এবং সেবা-যত্ন করতেও কোন ত্রুটি করিনি। তবে হাঁ মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বনি-বনা হয় না। এখানে আমি অক্ষম। মেয়েদেরতো এটা অভ্যাসই। কিন্তু মাসে মাসে টাকা দেওয়াও আমার শক্তির বাইরে। ক্ষেত-খামারের কথাতো কারো অজানা নেই। তবু পঞ্চা'তের হুকুম শিরোধার্য।

আলগু চৌধুরীর আদালতে যাওয়া-আসা ছিল। আইনজ্ঞ লোক। জুমনের সাথে জেরা করতে লাগল। এক এক প্রশ্নে জুমনের মনে হাতুড়ি পিটাতে লাগল। রামধন মিছির এবং তার বন্ধুরা মাথা নেড়ে নেড়ে প্রশ্নাবলীর স্বীকৃতি দিতে লাগল। জুমন হাঁপিয়ে উঠল। আলগুর এ হলো কি? এইতো কিছু আগে আমার সাথে বসে কত মজার আলাপ করছিল। এরি মধ্যে কি করে বদলে গেল? আমার হাঁড়ির খবর ধরে টান দিচ্ছে। ভাল বন্ধুত্বই করে-ছিলাম। এর চেয়ে রামধনই তো ভাল ছিল। সে তো আর জানতো না যে, আমার কোন ক্ষেতে কি জন্মাচ্ছে, কি খরচা হচ্ছে। নচ্ছারটা একদম সব বিগড়ে দিয়েছে।

জেরা খতম হবার পর আলগু রায় শুনাল। স্বর নিতান্ত স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর---'শেখ জুমন, পঞ্চায়েত তোমার বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছে বাড়াবাড়ি শুধু তুমিই করেছ। ক্ষেতে যথেষ্ট ফসল হয়। তোমার কর্তব্য খালাজানকে মাসিক ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করে দেয়া। আর এটা না মানলে হেবানামা বাতিল হয়ে যাবে।' জুমন এই সিদ্ধান্ত শুনে ঘাবড়ে গেল। পাশের লোককে বলল, 'ভাই' একেই বলে একালের বন্ধুত্ব। যে আপন লোকের উপর ভরসা করে তার গলাতেই ছুরি। একেই বলে চালবাজি। যদি মানুষ এমন ধোঁকাবাজ আর বিশ্বাসঘাতকই না হবে তো দেশে এত বালাই কেন আসে? কলেরা, প্লেগ বিশ্বাসঘাতকদের অপকর্মেরই ফল নয় কি?'

কিন্তু ওদিকে রামধন মিছির, ফতে খাঁ এবং জগু সিং এই নিরপেক্ষ বিচারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এরি নাম পঞ্চায়েত। দুধের দুধ পানির পানি। বন্ধু বন্ধুত্বের জায়গায়। বিচারকালে ইমান ঠিক রাখা চাই। এ রকম লোক আছে বলেই তো দুনিয়া টিকে আছে, নইলে এমনি করেই নরক হয়ে যেত এটা।

এই বিচার আলগু এবং জুমনের বন্ধুত্বকে ডালপালা সমেত আমূল উপড়ে দিল। কিছুই আর বাকী থাকলো না। আজকাল উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হয় কিন্তু তা ঢাল আর তীরের মতো। জুমন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই ভুলতে পারলো না, প্রতিরোধ নেবার জন্যে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলো। সৌভাগ্যক্রমে সুযোগও মিলে গেল। গত বছর আলগু মেলা থেকে এক জোড়া ভাল ষাঁড় কিনে এনেছিল। ভাল জাতের খুব নাদুস-নুদুস ষাঁড়। প্রথম মাস তো পাড়া-প্রতিবেশীদের ষাঁড় দুটাকে দেখতে আসতেই কেটে গেল। বিচারের মাস দেড়েক পর সেই জোড়ার একটি গেল মরে। জোড়া ভাঙল। জুমন বন্ধুদের বলল, 'এই হল দাগাবাজির সাজা। মানুষ তো সব সয়ে যায় কিন্তু খোদা ভালা-বুরা সব দেখে।' আলগুর সন্দেহ হলো, জুমন সম্ভবত গরুটাকে বিষ দিয়েছে। এছাড়া চৌধুরানীর ধারণা হলো তাকেও জাদু করা হয়েছে। চৌধুরানী এবং ফাহিমনের মধ্যে একদিন তুমুল বচসা হয়ে গেল। উভয় খাতুনই তর্কে কম যাননি। উপমামণ্ডিত বাক্যশৈলীর মাধ্যমে বাকযুদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময় জুমন এসে সব বন্ধ করে দিল। স্ত্রীকে খুব শাসাল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে টেনে নিয়ে গেল। ওদিকে আলগু চৌধুরীও ডাণ্ডা দিয়ে চৌধুরানীর মিষ্টি বচসার পারিশ্রমিক দিল।

এখন এক ষাঁড় দিয়ে তো কোন কাজ চলে না। বহু অনুসন্ধান করেও এর জোড়া পাওয়া গেল না। শেষে নিরুপায় হয়ে সেটাকে বিক্রি করাই সিদ্ধান্ত হলো। গাঁয়ে সমঝু বেপারী ছিল। সে এক্কা-গাড়ী হাঁকত। গা হ'তে গুড়, ঘি নিয়ে বাজারে চলে যেত আর বাজার থেকে তেল-নুন এনে গাঁয়ে বেচত। সেই ষাঁড়ের জন্য সমঝুর মাথাটা বিগড়ে গেল। সে ভাবে, যদি ষাঁড়টা নিতে পারতো দিনভর বিনা মেহনতে তিন খেপ চলতো। গাঁয়ে তো আমার দিকেই সবাই চেয়ে থাকে। সে ষাঁড় দেখল। গাড়ী জুড়ে দৌড়াল। খুটে পিটে দেখল। দরদামও করল এবং তুলে নিয়ে নিজের দরজার সামনে বেঁধে ফেলল। পাওনার জন্য এক মাসের ওয়াদা দিল। চৌধুরীরও দায়-দেনা ছিল। লোকসানের কোন চিন্তা করল না।

সমঝু নতুন ষাঁড় পেয়ে পা মেলে দিল। দিনে চার-পাঁচবার করে খেপ দিয়ে চলল। ঘাস পানিরও চিন্তা করতো না। শুধু খেপ

দিয়ে বেড়াত। এক্কা বাজারে গিয়ে পৌঁছলে কিছু ভূষি ফেলে দেয়। অবলা জীবটি দম না নিতেই আবার ঘানি জুড়ে দেয়। আলগুর সেখান থাকতে কত আরামে ছিল। নিয়মিত খাবার, পরিষ্কার পানি আর খৈল মাখা ভূষি। সকাল সাঁঝে একজন এসে দলাই মলাই করত, গায়ে হাত বুলাত এবং ঘুম পাড়াত। আজ কোথায় সে বিলাসব্যসন আর কোথায় এ আট প্রহর খাটুনি। খাটুনির ঠেলায় এক মাসেই বেচারা ভেঙ্গে পড়লো। গাড়ী। জুড়তেই হাঁটু গেড়ে বসে। এক পা চলতেও কষ্ট। হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে। তবু জাতগরু বলে তেমন বেগ পেতে হয় না।

একদিন বেপারী ডবল মাল তুলল গাড়ীতে। ষাঁড়টি সারা দিনের ক্লান্ত। বড় কষ্টে পা উঠছিল। এর উপরই বেপারী সপাং সপাং শুরু করে দিল। ষাঁড়টি মরিয়া হয়ে দৌড় দিল। কিছুদূর গিয়ে দম নেবার জন্যে থামল। ওদিকে বেপারীর শীঘ্রি যাবার তাড়া। কয়েকটি ঘা বড় নিষ্ঠুরের মতোই পড়লো। ষাঁড়টি আর একবার দৌড়াবার উপক্রম করল, কিন্তু শক্তিতে কুলালো না। মাটিতে থুবড়ে পড়ল। এমন করেই পড়ল যে, আর উঠল না। বেপারী খুব পিটাল। পা ধরে টানল। নাকে লাঠি দিল। কিন্তু লাশ আর উঠলনা। যখন সন্দেহ হলো, খুঁটিয়ে দেখল ষাঁড়টাকে। তারপর জোয়াল থেকে আলাদা করে খুলে রাখল। দুর্ভাবনায় পড়লো, গাড়ী কি করে বাড়ী পৌঁছবে? অনেক হাহাকার চিৎকার করল। পল্লীর রাস্তা---সন্ধ্যা থেকেই আনাগোনা বন্ধ, কাউকে দেখা গেল না। আশেপাশে কোন বস্তিও ছিলনা। রাগে ক্ষোভে মরা ষাঁড়টিকে আরও কষাঘাত করল। হতভাগা, আজকেই কি তোর মরার পণ ছিল? যদি না মরলেই নয় তা হলে ঘরে গিয়ে মরলেই পারতিস। আধা পথেই তুই দাঁত বের করে দিলি! এখন গাড়ী নেবে কে বল্। খুব বকল। কয়েক জালা গুড়, কয়েক টিন তৈল আর কোমরে বাঁধা আড়াই শো টাকা। কয়েক বস্তা লবণও। ছেড়ে যেতেও পারেনা। কি করা যায়। অগত্যা গাড়ীতে বসে পড়ল। এখানেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত করল। আধা-রাত এটা ওটা করে জেগে রইল। হুক্কা খেল, গান ধরল, ফের হুক্কা টানল। আগুন জ্বাল্‌ল, আগুন পোহাল। তার ধারণা, সে তো জেগেই ছিল। কিন্তু যখন ভোর হল, চমকে উঠে কোমরে হাত দিল। খুঁজে কোমরের থলি। আর পাওয়া গেলনা। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। কয়েকটা টিন ও তেল গায়েব। মাথায় হাত দিল আর ঘন

ঘন মাথা পেটাতে লাগল। অবশেষে প্রায় সব খুয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

বেপারিনী এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা শুনে বুক চাপড়াতে লাগল। প্রথমে খুব কাঁদল, হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করল। অবশেষে আলগু চৌধুরীকে গালাগালি দিতে লাগল। লক্ষ্মীছাড়া এমন এক গরু দিল যে, সারা জীবনের কামাই চোরে নিয়ে গেল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পর। আলগু যখন ষাঁড়ের দাম চাইত বেপারী এবং বেপারিনী লেলিয়ে দেওয়া কুত্তার মতো হা হা করে দৌড়ে আসতো। "একেতো সারা জনমের কামাই লুটে নিলো, ফকির হয়ে গেলাম, তার উপর গরুর দাম চাই। মরা একটা গরু দিয়ে আবার দাম চাই। চোখে ধুলো দিয়ে একটা মরা ষাঁড় গলায় বেঁধে দিয়েছিল। একটা পাগল ঠাওড়িয়েছে আর কি। কুয়ার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে এসো। দামের জন্য সবুর না যদি সয় আমাদের ষাঁড় খুলে নিয়ে যাও। মাসের বদলে ছ'মাস খাটিয়ে নাও। আর কি নেবে?" প্রায়ই এ ধরনের জবাব শুনে চৌধুরী ফিরে আসত।

কিন্তু দেড়শ' টাকা থেকে একে বারে হাত গুটিয়ে বসাও তো সহজ নয়। একদিন সেও বিগড়ে গেল। বেপারীও গরম হলো। বেপারীও উত্তেজনায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। খুব তর্কাতর্কি হলো। ক্রমে সুর পঞ্চমে উঠলো। গ্রামের লোকেরা ছুটে এলো। উভয় পক্ষকে বুঝাল এবং বলল, এভাবে নিজেদের মধ্যে মাথা ফাটা ফাটিতে কাজ নেই। বিচার বসাও যা কিছু সিদ্ধান্ত হয় তাই মেনে নাও। উভয় সে কথায় সম্মতি দিল।

পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি চলল। উভয় দলের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। তৃতীয় দিনে আবার সেই ছায়াঘন বৃক্ষের নীচে বৈঠক বসল।

সেই সন্ধ্যে বেলা। ক্ষেতের মাঝে কাকদের পঞ্চায়েত বসেছে। বিতর্কের বিষয় হলো মটরসুটির ওপর তাদের দাবি ন্যায্য, না অন্যায্য? এবং যতক্ষণ অবধি এর বিহিত না হবে ততক্ষণ সেই রাখাল ছেলেটির অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে অসন্তোষ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আর গাছের ডালে তোতাদের বিরাট বাক্‌বিতণ্ডা। বিষয়বস্তু হচ্ছে জাতি হিসেবে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়ার কি অধিকার আছে মানুষের?

পঞ্চায়েতে সবাই যখন এসে বসল রামধনজী বলল, 'আলগু, বল কাকে বিচারক মান।' আলগু বিমুখ হয়ে বলল, 'সমঝু শেঠই

বেছে নিক।' সমঝু শেঠ মুহূর্তে দাড়িয়ে গেল, 'আমার মতে শেখ জুমনের নাম লিখে নাও।'

আলগু জুমনের নাম শুনে ঝিম খেয়ে গেল, পিত্তটা মোচড় দিয়ে উঠল। রামধনজী আলগুর বন্ধু। তার বুকটাও তাই কেঁপে উঠল। বলল, 'চৌধুরী, তোমার তো কোন আপত্তি নেই, না ?'

চৌধুরী নিরাশ স্বরে বলল, 'না, আমার কি আপত্তি থাকতে পারে ?'

এরপর আরো চারজনের নাম মনোনীত হলো। আলগু পয়লা চক্কর খেয়েই হকচকিয়ে গিয়েছিল। খুব ভেবে-চিন্তে মনোনীত করল এবার। এখন প্রধানের নির্বাচন বাকী। আলগু ইতস্তত করছিল। এমন সময় হঠাৎ সমঝুর বন্ধু গুদড়শা' বলল, 'সমঝু ভাই, সর্বপ্রধান বিচারপতি কাকে বানাবে ?' সমঝু চমকে উঠে বলল, 'জুমন শেখকে'।

রামধনজী চৌধুরীর দিকে সহানুভূতির নজরে তাকিয়ে বলল,— 'তোমার কোন আপত্তি থাকলে বলে ফেল'। আলগু অদৃষ্টের মাথা খেয়ে বলল, 'না, আমার কোন আপত্তি নেই।'

পঞ্চায়েত শুরু হলো। উভয় পক্ষ যার যার বর্ণনা দিল। জেরা হলো। সাক্ষী নেওয়া হলো। উভয় পক্ষের লোকরা খুব টানা-হেঁচড়া করল। এতক্ষণ জুমন গভীর মনযোগ দিয়ে বিচারকের আসনে বসে সব শুনল। সারাক্ষণ সে সচেতন রইল যে সে বিচারকের আসনে বসে রয়েছে। সবকিছু শুনে ধীরে সুস্থে রায় দিল।

---'সমঝু শেঠ এবং আলগু চৌধুরী, পঞ্চায়েতরা তোমাদের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছে। চৌধুরীকে ষাঁড়ের পুরা দাম সমঝু শেঠকে দিতে হবে। যখন ষাঁড় তার বাড়ীতে এসেছিল, তখন কোন অসুখ ছিল না। আর সে সময়ে যদি টাকা দেওয়া হত তা'লে সমঝু এখন টাকা ফিরিয়ে নেবার কথাও ভাবত না।

রামধন মিছির বলল, 'মূল্য ছাড়াও কিছু জরিমানা তার থেকে নেওয়া উচিত। সমঝু গরুটাকে পিটিয়ে মেরেছে।' জুমন বলল, 'মূল বিচারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।' গুদড়শা বলল, 'সমঝুর প্রতি কিছুটা অনুকম্পা দেখান উচিত। বেচারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিজের কর্মফল পেয়েছে।'

জুমন বলল, 'এও মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। এ শুধু চৌধুরীর দয়ার উপর নির্ভরশীল। সে ইচ্ছা করে ক্ষমা করুক, না হয় না করুক।'

আকাশে ততক্ষণে তারা ফুটে উঠেছে।

সাপ্তাহিক পূর্বদেশ ১১ই নভেম্বর '৬২। মূল গল্পটির রচনাকাল ১৯৩০ সাল।

করিম খান

কৃষণ চন্দর

বান্দ্রো এবং কারলাইল রোডের শেষ প্রান্তের মোড়ে ফতে মোহাম্মদের পানের দোকান থেকে ফজল এক বাণ্ডিল জাহাজ মার্কা বিড়ি কিনল। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বাস স্টপের দিকে যাচ্ছিল। ফতে মোহাম্মদ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল,—ঐ দেখ্ করিম খান আসছে। দাঁড়া তোর সাথে আলাপ করিয়ে দিই। বড় মজার পাঠান। এমন লোক কখনও দেখিস্ নি।

ফজল একবার কেশে নিয়ে করিম খানের দিকে তাকিয়ে বলল,

—একেতো আমি ফি-রোজ দেখি। করে কি লোকটা ?

—ফলের আড়তদার। বড়ই খানেপিনেওয়ালা খোলা দিল পাঠান। আমার সাথে খুব খাতির। আমার ঠিকানায় চিঠিপত্র আনায়। রোজ একবার করে এখানে আসে।

ফজল কি জানি বলতে যাচ্ছিল, অমনি করিম খান এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো। ছ' ফুট লম্বা শক্ত সুঠাম পাঠান। গায়ের রং জমকালো তামাটে। ঘন সরু গোঁফ। সালোয়ার, কামিজ আর জ্যাকেট বিলকুল ধোপ-দুরস্ত, কোথাও একটু কুঁচকে নেই। করিম খান সবাইকে আস্সালামু আলাইকুম বলে সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। পকেট থেকে রেশমী রুমাল বের করে মুখ মুছলো। তারপর মাথার টুপি সমেত পাগড়িটি ফতে মোহাম্মদের দিকে এগিয়ে দিল। ফতে মোহাম্মদ তা সিগারেটের প্যাকেটের ওপর সযত্নে রাখল।

—'এর নাম ফজল, শেঠ মাওলাদিনার বাংলার চকিদার।'

ফতে মোহাম্মদ পরিচয় করিয়ে দিলো। করিম খান ফজলের সাথে সাগ্রহে হাত মেলাল।

—'আরে ভালকথা, তোমার চিঠি এসেছে।'—ফতে মোহাম্মদ বলল।

করিম খান পোস্ট কার্ডটা হাতে নিল। দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে বিরক্তির সঙ্গে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলল। ফজল চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল,

—কি ব্যাপার ?

—আরে ভাই, বউর চিঠি।

—বউর চিঠি বলে পড়তে হবে না ?

—পড়ে কি হবে ? দু'দিন পর পরই চিঠি। আর সব চিঠিতেই টাকার তাগাদা।

—ঠিকই ভাই—মেয়ে জাতটা টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না।

ফজল এমন স্বরে বলল, যেন সে কয়েকবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে ফিরে এসেছে।

ফজলের এক স্ত্রী, ছ'টি বয়স্থা মেয়ে। ফজলের চলার পথে বেশ কয়েকটা গভীর পরিখা। কিন্তু সব কিছু সে মেনে নিয়েছে।

'কিন্তু পয়সাতো আমি পাঠাই। তবে সব সময়তো আর পাঠাতে পারি না। তিন চার মাস পর পর হাজার খানেক টাকা পাঠিয়ে দি।'—করিম খান বলল।

—'হাজার টাকা পাঠাও, তাহলে কম কি ?' ফজল চিঠিটা করিমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল।

করিম খান চিঠিটা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলল,

—হাড় জ্বালাতন করে ছাড়লো এই মাগীটা—এর চেয়ে আমার দ্বিতীয় বউটা—

—'তোমার দ্বিতীয় স্ত্রীর কি হয়েছিল ?'

—'সারাদিন জ্বরে ভুগত। বড় বউটা সারাদিন ওকে ধরে ধরে মারত। মার খেয়ে খেয়ে ওর কালাজ্বর হয়েছিল।

—বড় বউ ছোট বউকে মারত আর তুমি কিছুই বলতে না ?'

—'কি বলব বলো, সে যে আমারও বড়। আমার বয়স যখন সাত, তখন খানমের সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ে হবার পর থেকেই খানম আমাকে মারতে শুরু করে।

কতকাল আর একজনের মার সহ্য করা যায় ? তারপর আমি বড় হয়ে ফরখন্দাকে বিয়ে করি। ফরখন্দাকে বিয়ে করার পর খানম আমাকে ছেড়ে ফরখন্দাকে মারতে শুরু করল। মার খেয়ে বেচারী একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। আমি অবাধ্য হয়ে চার্সদা ছেড়ে

ফরখন্দাকে নিয়ে সুরাটে চলে এলাম আর এই ড্রাই ফ্রুটের কারবার শুরু করলাম। কিন্তু এখানে এসে বেচারী এমন কংকালসার হয়ে পড়লো যে, তাকে দেখলে রীতিমত ভয় করতো। রাতে আমি তার কাছে থাকতাম না। একজন মরদ একটা কংকালকে নিয়ে কি করে বাঁচে বল ? অথচ ওকে আমি প্রথম যখন দেখি, কি খুবসুরতই না ছিল। পাতলা কোমর হেলে দুলে যেনো নেচে নেচে হাঁটতো। প্রথম দর্শনেই আমি ওর প্রেমে পড়ে যাই। খোদার কসম করে বলছি—'

—কিন্তু তুমি ওর চিকিৎসা কেন করাওনি ?

—'অনেক করিয়েছি—অনেক, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সুরাট থেকে ষাট মাইল দূরে জুনাগড়ে এক হাকিম সাব থাকতেন, সবাই বলল, তার কাছে যাওয়ার জন্যে। আমি জুনাগড় রওনা হলাম, ফরখন্দা পথে খাবার জন্য মুরগী মোসল্লম, কাবাব, পরাটা বানিয়ে দিল।

জুনাগড় পৌঁছে আমি হাকিম সাবকে ফরখান্দার সব কথা বললাম। আমি বলি আর তিনি লেখেন। তাকে ফরখন্দার অবস্থা বলছিলাম আর উঠোনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম একটা মেয়ে টানা দিয়ে লাউয়ের পাতা পাড়ছে। প্রথম দর্শনেই মজে গেলাম। এমন রূপসী মেয়ে আগে কখনও দেখি নি। আমি কথা বন্ধ করে বললাম,

—এ মেয়ে কার হুজুর ?

—আমার।

—তাহলে হুজুর আর লিখবেন না। এর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। খোদা, রসুল এবং পীর-পয়গম্বরের দোহাই। আমি ফরখন্দাকে নিয়ে মোটেই সুখী না। তার চেহারা দেখলে আমার ভয় করে।

হাকিম সাহেব প্রথমে চমকে উঠলেন। পরে আমার রুজী-রোজগার ও বংশ পরিচয় ইত্যাদির খবর নিয়ে রাজী হয়ে গেলেন।

বাড়ী এলে ফরখন্দা বলল,

—আমার জন্যে ঔষধ এনেছ ?

—ঔষধ আনি নি তবে বিয়ে করে এসেছি।'

শুনে ফরখন্দা খুব কাঁদল। আমি তাকে আদর করে বললাম,

---তুমি জীবিত থাকতে তাকে এখানে আনব না।

আমি বলার বেলায় তো বললাম একথা। আর ওর করুণ পাণ্ডুর মুখ দেখে একথা না বলে উপায়ও ছিল না। আল্লার কসম আমার মনে কোন বেঈমানী ছিল না। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল ও জীবিত থাকতে মারজানকে আনব না।

এরপর এক মাস গেল, কিন্তু ফরখন্দা মরল না। শুধু কি তাই, এর পর সে দিব্যি দু'বছর বেঁচে রইল। আমি মাসের পর মাস তার মরার আশায় থাকি অথচ সে মরে না। ওদিকে জুনাগড় থেকে চিঠির ওপর চিঠি আসে। আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। বাধ্য হয়ে আমি মারজানের জন্যে মাসে দু'শো করে টাকা পাঠাতে শুরু করলাম। ভাবলাম, যাক এতে ওর মুখটা অন্তত বন্ধ হবে।

---প্রতিমাসে দু'শো টাকা ?

---হাঁ, দুশো কেন, কখনো কখনো বেশীও পাঠাতাম। কারণ তখন কায়কারবার ভাল ছিল।

---তারপর ?

---তারপর টাকা পাঠাতে পাঠাতে মাস পনের পর হঠাৎ দু'মাস টাকা পাঠাতে পারলাম না। মারজান একদিন এসে উপস্থিত হল আমার বাড়ীতে। ফরখন্দার কাছে দেয়া আমার ওয়াদার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ফরখন্দা আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

---মারজান তোমার স্ত্রী, কতদিন আর তাকে দূরে রাখবে। আমি আজ থেকে অন্য কামরায় শোব। আমার কি, আজ আছি কাল নেই।

এ ঘটনার পাঁচ মাস পর ফরখন্দা মারা গেল। অবশ্য আরো কিছু দিন বেঁচে থাকতে পারত। বজ্জাত মারজানটা তার অষুধপথ্য যদি বন্ধ করে না দিত। সারা সংসারের উপর মারজান দোর্দণ্ড প্রতাপ খাটাত। প্রতি মাসে দু'শ টাকা পকেট খরচ নিত। বলত,

---বাবার বাড়ী ছেড়ে এসেছি। এ পকেট খরচ তো আমাকে নিতেই হবে।

আমি ঠিক করে রেখেছিলাম ফরখন্দা মরলে ওর পকেট খরচ বন্ধ করে দোব। কিন্তু তারপরও কি করে যেন সে উসুল করে নিত।

আল্লাতালার কসম, এমন বাজে মেয়ে আর হয় না। অথচ লাউয়ের পাতা পাড়ার সময় দেখে মনে হয়েছিল ওর জন্যে কোরবান হয়ে যাই। আমার ভাগ্যটা দেখ। তিন তিনবার বিয়ে করলাম কিন্তু বিয়ের সুখ পেলাম না।

এই প্রকাণ্ড কাহিনী শুনতে শুনতে ফজল আবার চিঠিটা কুড়িয়ে নিল। কাহিনী শেষ হলে আবার চিঠিটা এগিয়ে দিল। করিম খান চিঠিটা আবার ফেলে দিলো।

—লানত দাও চিঠিকে। পয়সা, পয়সা, পয়সা। পয়সা ছাড়া মাগীটা আর কিছু চিনেই না।

রাস্তা দিয়ে একটা মেয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। চিঠিটা উড়ে গিয়ে ওর ওড়নায় পড়ল। মেয়েটির এক হাতে তেলের বোতল অন্য হাতে বাজারের থলে। সে চমকে ফজল এবং করিম খানের দিকে তাকাল। লজ্জায় আরক্ত হয়ে গেল মেয়েটি। কোনমতে ওড়না থেকে চিঠিটি গড়িয়ে ফেলে দিয়ে আরো দ্রুত পায়ে চলে গেল।

করিম খান এবার চিঠিটা তুলে নিল। কিন্তু একটুও পড়ে দেখল না। শুধু অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটির অপসৃয়মান দেহ বল্লরীর দিকে তাকিয়ে রইল।

—এই মেয়েটি কার? প্রায়ই এপথে আসতে যেতে দেখি।'

ফজল মাথা নিচু করে বলল, আমার।

চট করে করিম খান ফতে মোহাম্মদের পা চেপে ধরে বলল,

—আল্লা পাকের কসম, ঠিক এরকম এক মেয়েই আমি চাই। ভাই ফতে মোহাম্মদ, তুমি যদি সত্যি আমার বন্ধু হও, তাহলে তোমার এই বন্ধুকে বলো ওর সাথে যেন আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। কি নামটা যেনো বললে তোমার এই বন্ধুর?

সাপ্তাহিক পূর্বদেশ ১৩ই শ্রাবণ ১৩৭৪ বাং।

শহীদ

সা'দত হাসান মাণ্টো

আমার বাড়ী ছিল গুজরাটের কাটিয়াদারে। আমরা জাতে বেনে। দেশ ভাগাভাগির দরুন সর্বত্র যখন 'আকাল' পড়ে গিয়েছিল, আমি একেবারে বেকার হয়ে পড়েছিলাম। মাফ করবেন, আমি 'আকাল' শব্দ ব্যবহার করেছি। কিন্তু এতে ক্ষতি নেই। কারণ, ভাষার মধ্যে এ জাতীয় শব্দ আসা দরকার।

জী হাঁ যা বলছিলাম, আমি একেবারে বেকার হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ছোটখাট একটা দোকানের কারবার ছিল। তা দিয়ে কোন মতে দিনটা চলে যেত। যখন দেশ ভাগাভাগি হল আর হাজার হাজার লোক পাকিস্তান যেতে শুরু করল, আমিও পাকিস্তান যাবার মনস্তাপ করলাম। দোকানের কারবার না চলে না চলুক অন্য কোন কারবার করা যাবে। সুতরাং পাকিস্তানে রওনা হয়ে পথি মধ্যেই কিছু ডান হাত বাঁ হাতের কারবার করে পাকিস্তানের পাক-মাটিতে এসে পা রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে এসে একটা জমকালো কারবার ফেঁদে বসব। সুতরাং পাকিস্তানে এসে সোজা এলট্‌মেন্টের ধান্ধায় নেমে পড়লাম। তোষামোদ এবং তেলমালিশ ইত্যাদিতে আমি প্রথম থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম। কথার মধ্যে কিছু মধু-চিনি মিশিয়ে দু'চারজন ইয়ার-বন্ধু জুটিয়ে নিলাম। অল্প দিনের মধ্যে আমার নামে একটা বাড়ী এলট্‌মেন্ট হয়ে গেল। বাড়ীটা থেকে বেশ পয়সা কড়ি আসতে লাগল। এ কারবারটা নেহাত মন্দ না দেখে একেবারেই লেগে থাকলাম। আরো বাড়ী এলট্‌মেন্টের ধান্ধা করতে লাগলাম।

সব কাজেই অল্প-বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়। এলট্‌মেন্টের ব্যাপারেও আমার বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। মোট কথা, এটা একটা বিরাট ঝকমারি। ভাল বাড়ী এলট্‌মেন্ট করবার জন্য আমাকে সারা শহর চষে বেড়াতে হয়েছে। কারণ আজেবাজে বাড়ী এলট্‌মেন্ট করিয়ে তেমন সুবিধে করা যায় না।

মানুষের পরিশ্রম কোন দিন বৃথা যায় না। এক বছরের মধ্যেই লাখো টাকার মালিক হয়ে বসলাম। খোদার দেয়া সব কিছুই ছিল। চমৎকার বাংলা, চাকর-নকর, পেকার্ড গাড়ী এবং ব্যাংকে যথেষ্ট মালপানি, ক্ষমা করবেন, ভাষার মধ্যে এসব শব্দ আসা দরকার।

জী হাঁ, যা বলছিলাম, খোদার দেয়া সব কিছুই ছিল আমার। ব্যাংকে আড়াই লাখ টাকা, অপর দিকে আলাদা কারখানা এবং দোকান পাটও ছিল। কিন্তু এত কিছু থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে কেন যেন শান্তি ছিল না। যখন কোকেনের ব্যবসা করতাম তখনও মাঝে মাঝে এমন লাগত। কিন্তু আজকাল মন বলতে কোন কিছু আছে বলেই মনে হয় না। অথবা অন্য ভাবে বলা যায় মনের উপর ভারী বোঝা জমা হতে হতে মন তার নীচে তলিয়ে গেছে। কিন্তু এ অশান্তিটা কিসের?

মানুষটা ছিলাম বড় ঘাগু। সব রকম প্রশ্নেরই একটা না একটা হিল্লা করে ফেলতে পারতাম। স্থিরচিত্তে (আসলে আমার চিত্ত বলতে কোন কিছু আছে কি না কে জানে) এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করলাম। কি জন্যে আমার এমন লাগছে।

নারী? হয়তবা। আমার আপন বলতে অবশ্য কেউ ছিল না। যে ছিল, সে গুজরাটে থাকতেই মারা গেছে। কিন্তু অপরের ঝি-বউ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের মালীর বউর কথাই ধরা যাক। মাফ করবেন, যার যেমন পসন্দ। তবে মেয়েদের চেহারার জৌলুষ থাকা চাই। লেখা পড়া না থাকলেও চলে। কিন্তু একটু নাচ-গান আর ঠমক থাকা চাই। ঠমকটাও আমাদের ওদিককার ভাষা।

মাথাটা ছিল বড় পরিষ্কার। যে কোন সমস্যার তলানিটুকু পর্যন্ত দেখে নিতে পারতাম। কারখানা, দোকান-পাট দিব্যি চলছিল। আপনিতেই টাকা তৈরি হচ্ছিল। আমি একান্তে বসে অনেক ভেবে-চিন্তে মনের অশান্তির যে কারণটা শেষ অবধি উদ্‌ঘাটন করলাম, সেটা হল আমি এখানে এসে অবধি কোন পুণ্যকাজ করি নি।

দেশে থাকতে তবু কিছু পুণ্য কাজ করেছিলাম। বন্ধু পাণ্ডরিং যেবারে মারা গেল তার বিপন্ন বউকে তুলে নিয়ে এলাম এবং পুরো দু'বছর বসিয়ে খাওয়ালাম।

বিনায়েকের কাঠের পা'টা ভেঙ্গে গিয়েছিল, নতুন একটা পা কিনে দিয়েছিলাম আবার। পুরো চল্লিশটা টাকা গাঁট থেকে খুলে দিতে হয়েছিল সেবারে। যমুনাবাঈর দেহে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছিল শালীর, (মাফ করবেন) আমি তাকে ডাক্তার দেখালাম এবং ছ'মাস

তার চিকিৎসার মালপানি যোগালাম। কিন্তু পাকিস্তানে এসে এ ধরনের কোন পুণ্যকাজ করি নি। মনের অশান্তির এ-ই একমাত্র কারণ।

এখন কি করা যায়? ভাবলাম, দান-সদ্‌কা করব। কিন্তু একদিন শহর ঘুরে এসে যে অভিজ্ঞতা হল, তাতে দেখলাম, প্রায় সব লোকই অভাবী। কারো পেটে ভাত নেই---কারো কাপড় নেই--কাকে রেখে কাকে দেবো। ভাবলাম, একটা লঙ্গরখানা খুলে দেবো। কিন্তু একটা লঙ্গরখানায় কি হবে? তাছাড়া তরি-তরকারি এটা ওটা ব্লাকমার্কেটিং ছাড়া যোগাড় করাও মুশকিল হবে। সুতরাং পাপের সাহায্যে পুণ্য অর্জন করার মধ্যে সার্থকতা কোথায়?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমি মানুষের দুঃখ সুখের কথা শুনেছি। সত্যি বলতে কি, এ জগতের কোন লোকই সুখে নেই। ছোট বড় সবাই অসুখী। যারা পায়ে চলে তাদের দুঃখ হলো, তাদের জুতা নেই। আর যারা গাড়ীতে করে বেড়ান তাদের দুঃখ হলো, নতুন মডেলের গাড়ী নেই তাদের। ছোট বড় সবারই একটা না একটা অভিযোগ আছে এবং প্রত্যেকেরই ন্যায্য অভিযোগ।

আমি আল্লাবখ্‌শ্‌ শোলাপুরের আমিনাবাঈ চিতলকরের মুখে গালিবের একটা গজল শুনেছিলাম। গজলের একটা চরণ মনে রয়ে গেছে।

কেসকি হাজত রাওয়া করে কুই

মাফ করবেন, এটা গজলের দ্বিতীয় চরণ। কি জানি, প্রথম চরণ ও হতে পারে।

জী হাঁ, কে কাকে সাহায্য করবে বলুন? শতকরা এক'শ জনেরই ঠেকা। কাকে রেখে কাকে সাহায্য করব?

এরপর আমি দেখলাম, দান-খয়রাত করাটা আসলে তেমন ভাল কাজও নয়। আপনি হয়ত এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন না। কিন্তু আমি মোহাজের ক্যাম্পে গিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে যেটুকু বুঝলাম তাতে দেখলাম, দান-খয়রাতের বদৌলতে বহু শক্তসমর্থ লোক অকর্মণ্য হয়ে বসেছে। সারাদিন তাস পিটে, গালি গালাজ করে, জুয়া খেলে আরো এমনি কত অনাসৃষ্টি করে। এসব করে অথচ দিনের শেষে তাদের খাবার ঠিকই থাকে। এসব অকর্মণ্য লোকদের দ্বারা পাকিস্তানের কি উন্নতি হতে পারে? সুতরাং দান-খয়রাত করে পুণ্য অর্জনের খেয়ালটা আমি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলাম।

এরপর আমি আবার চিন্তিত হয়ে পড়লাম---কি করে আবার পুণ্য অর্জন করা যায়। ইতিমধ্যে মোহাজের ক্যাম্পে মহামারী দেখা

দিল। কলেরা-বসন্ত এটা ওটা হয়ে গণ্ডা গণ্ডা লোক মারা যেতে লাগল। হাসপাতালে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। এসব দেখে আমার প্রাণ বিগলিত হয়ে গেল। ঠিক করলাম, একটা হাসপাতাল বানিয়ে দেবো। সব কিছু প্লান-প্রোগ্রাম প্রায় সেরে ফেলেছিলাম। দরখাস্তের ফি-ও জমা হয়ে যেত। টেণ্ডার কল করে তা নিজেই এক কোম্পানীর নাম দিয়ে ধরে নিতাম। তারপর যেখানে এক লাখ টাকার টেণ্ডার সেখানে সত্তর হাজার দিয়ে কাজ শেষ করে বাকী ত্রিশ হাজার টাকা নিজের পকেটে পুরে নিতাম। সব কিছু ঠিকঠাক। শুধু কাজ শুরু করার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু একটা কথা ভাবতেই পুরো পরিকল্পনাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হাসপাতাল তৈরি করে লোকদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার পেছনে আমি কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পেলাম না। সমাজে আজকাল যে হারে লোক বাড়ছে তা বরং কমানো দরকার। তা না করে লোক বাঁচাতে যাই কোন্ দুঃখে ?

সমাজে আজকাল মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। লোক বাড়ছে বলেই যত ঝগড়া-ফ্যাসাদ অরাজকতা দেখা দিয়েছে। এমন তো নয় যে মানুষ বাড়ছে বলে জমা-জমিও বাড়ছে। মানুষ বাড়ছে অথচ বর্ষাও বেশী হচ্ছে না, ফলনও বেশী হচ্ছে না। সুতরাং মানুষ বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে কোন ভালাই নেই।

তারপর চিন্তা করলাম, না, কোন একটা মসজিদ তৈরি করব। কিন্তু আল্লাবখ্শ্ শোলাপুরের আমিনাবাঈ চিতলকরের গাওয়া একটা গান মনে পড়ে গেল।

নাম মনজুর হায়তো ফয়েজকে
আসবাব বনা
পুল বনা চাহ বনা মসজিদ অ
তালাব বনা।

কার সাধ্য এ জগতে নাম-কাম করে ? নামের জন্যে একটা সেতু তৈরি করলে তাতে পুণ্য হবে থোড়াই। না, এই মসজিদ তৈরির খেয়ালটাও আগাগোড়া বেকার। তাছাড়া আলাদা আলাদা মসজিদ তৈরি করাও জাতির জন্যে ক্ষতিকর। কারণ, তাতে জাতির মধ্যে ভাগাভগি প্রবণতা এসে পড়ে। অবশেষে আমি সব কিছু বাদ দিয়ে হজে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। শেষকালে আল্লা নিজেই একটা পথ বাতলে দিলেন দেখছি। এমন সময় শহরে কিসের একটা সভা হল। সভার শেষে শ্রোতাদের মধ্যে বদহজমী ছড়িয়ে পড়ল এবং তা নিয়ে

লোকদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে প্রায় ত্রিশজন লোক নিহত হল। এই দুর্ঘটনার খবর পরদিন যখন খবরের কাগজে বের হল, জানতে পারলাম লোকগুলো নিহত হয় নি বরং শহীদ হয়েছে। শহীদ? শহীদ আবার কি ধরনের মৃত্যু? ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্যে ক'জন মৌলবীকে জিজ্ঞেস করলাম। পরে বুঝলাম, যারা স্বাভাবিক ভাবে না মরে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা যায় তারা পরকালে শহীদী দরজা পায়। শহীদ হয়ে মরার চেয়ে বড় সাফল্য আর হয় না। সত্যি তো? লোকেরা এমনি না মরে যদি শহীদ হয়ে মরে সেটাই তো সবচে' ভাল। আমি ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভাবিত হয়ে পড়লাম। যেদিকেই তাকাই না কেন মানুষের অবস্থা বড় জর্জরিত। চোখ কোটরাগত হাড্ডি সার দেহ---বেওয়ারিশ কুকুরের মত পথে-ঘাটে, অলি-গলিতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরাফিরা করছে। কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে যে এরা বেঁচে আছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। একবার কলেরা-বসন্ত দেখা দিলে এরা দলে দলে মারা পড়ে। তাছাড়া শীতে গরমে ক্ষুধা-অনাহারেও ধুঁকে ধুঁকে কত মারা যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই।

জীবনটা যে কি, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ঠিক আছে।

উসনে খত না উঠায়া
ইয়ে ভি ঠিক হ্যায়

কার যেন কবিতাটা। আল্লাবখ্শ্ শোলাপুরের আমিনাবাঈ চিতলকর কত দরদ দিয়ে গাইত;

মরকে ভি চয়ন না পায়া
তো কিধার জায়েঙ্গে।

মানে বলছিলাম, মরণের পরেও যদি ইহকালের মত ধুঁকতে হয়, তাহলে আর বেঁচে থেকে কি লাভ?

আজ এ জগতে যারা দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে, তারা যদি পরকালে পরমানন্দে পায়ের উপর পা রেখে দিন কাটাতে পারে, বেশ মজা হবে তা' হলে। এবং সেজন্য এরা যত শহীদ হয়ে মরতে পারে ততই ভাল।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এরা শহীদ হবার জন্যে রাজী হবে কি না? কেন, রাজী হবে না কেন? মুসলমান হয়ে যদি শাহাদত বরণ করার ইচ্ছা না থাকে, সে আবার কিসের মুসলমান? আজকাল মুসলমান-

দের দেখাদেখি হিন্দু এবং শিখরাও শহীদ হবার জন্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কিন্তু এক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম,

'তুমি শহীদ হতে চাও ?'

লোকটি সরাসরি জানাল, 'না'।

বুঝতে পারলাম না লোকটি বেঁচে থেকে কি লাভ করবে ? আমি তাকে অনেক করে বুঝালাম, দেখ বাবা, তুমি যদি বাঁচ, বড় জোর আর দেড় মাস বাঁচতে পার। এর বেশী একদিনও বাঁচতে পারবে না, চলতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাও। কাশতে কাশতে একেক সময় প্রাণটা বেরিয়ে যায় মনে হয়। তোমার কাছে কোন পয়সা-কড়িও নেই। জীবনে সুখের মুখও দেখ নি। মোট কথা, তোমার জীবনের সকল আশা ভরসা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সুতরাং সময় থাকতে দেখে শুনে তুমি নিজেই যদি শহীদ হবার বন্দোবস্তটা করে নাও।

তা কেমন করে হয় ?'

'কেন হবে না ? মনে কর, পথের উপর কলার খোসা ফেলে রাখলাম, আর চলতে গিয়ে তুমি পা ফসকে ধড়াস করে পড়ে গেলে সেখানে। পড়েই শাহাদত বরণ করলে। সাধারণভাবে মরার চেয়ে শাহাদত বরণ করার কত উপকার তা কি তুমি জান ?'

কিন্তু লোকটাকে ঠিক বুঝানো গেলো না ব্যাপারটা। সে সোজা বলল,

'আমি কেন বাবা চোখে দেখে কলার ছিলকায় পা দিতে যাব ? আমার প্রাণের মায়া নেই ?'

হতভাগার কথা শুনে আমার খুব আফসোস হল। আরো আফসোস হল যখন শুনলাম, পরদিনই খয়রাতি হাসপাতালের লোহার চারপেয়ের উপর কাশতে কাশতে লোকটির প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। অথচ লোকটি কত স্বচ্ছন্দে শাহাদত বরণ করতে পারত।

এক বুড়ী ছিল, এখন মরে তখন মরে অবস্থা। আমার খুব দয়া হল। আমি তাকে তুলে নিয়ে রেল লাইনের উপর শুইয়ে দিলাম। ওমা, বেচারী রেলের আওয়াজ শুনতেই ধড় মড় করে উঠে বসল এবং প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাল। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। তবু দমলাম না। জাতে ছিলাম বেনে। জানেন তো, বেনেদের বুদ্ধি বড় পাকা। পুণ্য অর্জনের এমন একটা মাধ্যমকে আমি সহজে হাতছাড়া করতে চাইলাম না।

মোগল আমলের নেহাত পুরনো একটা দুর্গের মত বাড়ী ছিল। তাতে একশ' একান্নটা কামরা ছিল। অবস্থা একেবারেই জড়সড়।

অনেক অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুমান করলাম, ভালমতো একটা বর্ষা হলেই এর ছাদ ধ্বসে পড়বে। অতএব দশহাজার টাকা দিয়ে আমি দুর্গটা কিনে নিয়ে এক হাজার কায়ক্লেশে খেটে খাওয়া লোক-দের থাকতে দিলাম। মাথা পিছু এক টাকা করে মাস দুয়েক থাকতে দিলাম। তারপর তৃতীয় মাসেই আমি যা অনুমান করেছিলাম, প্রবল বর্ষার দরুন ছাদ ধ্বসে পড়ল এবং প্রায় সাত শ' লোক ছাদ চাপা পড়ে মারা গেল।

আমার মনের ভারটা একটু হালকা হলো। এক সাথে সাত শ' লোক শাহাদত বরণ করল এবং সমাজের বিরাট সংখ্যক লোক কমে গেল।

এরপর আমি এ কাজই করতে লাগলাম। আর না পারলেও রোজ দু'চার জন লোককে শাহাদত বরণের সুযোগ করে দিতাম। আমি আগেই বলেছি, সব কাজে পরিশ্রম আছে ভাই। আল্লা বখ্‌শ্ শোলাপুরের আমিনাবাঈ চিতলকরের মুখে একটা গান প্রায়শঃ শুনা যেত। ক্ষমা করবেন, গানটি আসলে এ জায়গায় প্রযোজ্য নয়। না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ব্যাপার যা-ই হোক আমাকে কিন্তু পরিশ্রম করতে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনাই বলা যায়। একটা অপোগণ্ড লোককে শহীদ করার জন্যে দশদিন ধরে আমি চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। দশ দিন ধরে পথেঘাটে কলার খোসা ছড়িয়ে রাখতাম। কিন্তু কোন দিনই লোকটি খোসায় পা দিত না। অবশেষে দশম দিনে পা দিল। আসলে এ দশম দিনই তার শাহাদত বরণের নির্দিষ্ট দিন ছিল।

আজকাল আমি একটা বিরাট বিল্ডিং তৈরীর কাজে হাত দিয়েছি। একটা কোম্পানী তৈরী করে নিজেই সেটার কন্ট্রাক্ট নিয়ে নিয়েছি। দু'লাখ টাকার কন্ট্রাক্টে তৈরী হচ্ছে। নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা বেঁচে যাবে। বিল্ডিং-এর বীমাও করিয়ে নিয়েছি। যথা সম্ভব তৃতীয় তলার কাজ শুরু হলেই সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়বে। কারণ, মাল-মশলাই আমি সে ভাবে ব্যবহার করেছি। এ কাজে এখন একশজন মজুর কাজ করছে। খোদার ইচ্ছায় আমার যতটুকু ধারণা, এরা সবাই শহীদ হয়ে যাবে। যদি কেউ কোনমতে বেঁচে যায় তাহলে বুঝতে হবে এক নম্বর গুনাগার সে, শহীদ হওয়া তার কপালে নেই।

সচিত্র সন্ধানী, ১৯৬৭ ইং

রামুর হাঁসুলী

খাজা আহমদ আব্বাস

সারা খেতে যবের শীষগুলো কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। রামুর মনে আশার কুসুম কলি দোল খাচ্ছে তা দেখে দেখে। দেখতে মাত্র একটা ছোট খেত কিন্তু যে ফসল তাতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কাটাই ছাঁটাইর পর কমপক্ষে পঞ্চাশ মণ যবের নিকাশী হবে। রামু মনে মনে হিসেব কষে। মেণ্ডিতে যবের দর প্রতি মণ পনের টাকা। সমুদয় ফসলের দাম দাঁড়ায় গিয়ে তাতে সাড়ে সাত শ' টাকা। এতে এমন কোন ধনভাণ্ডার আসছে না তার ঘরে। তবু পাকা যবের পুষ্ট শীষগুলোর দিকে তাকিয়ে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছে না রামু। বিকেলের পড়ন্ত রোদের ছটায় ঝলমল করছে খেতখানা তার। সোনামল স্বর্ণকারের দোকান যেন সারাটা খেত। সোনা রূপোর কত গহনা-পত্র কাচের আলমিরায় থরে থরে সাজানো সেখানে। এ বছরের শস্য বেচা-কেনার পরই রামু এক গাছি রূপোর হাঁসুলী কিনবে লাজুর জন্যে। ভাবতেই রামুর চোখে যবের সব শীষগুলো মিলিয়ে গিয়ে এক চমকালো হাঁসুলী বনে যায়। এবং সে হাঁসুলীতে লাজুর লম্বা পাতলা গলা আর পাকা যবের মতো উজ্জ্বল লাবণ্যময় মায়া ভরা মুখখানি সুশোভিত।

লাজু তার স্ত্রী। দুই সন্তানের মা। ছ' বছর হলো সে তাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে। যেদিন প্রথম সে ঘোমটা তুলে লাজুর মুখ দেখল, সত্যি সত্যি সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর বৌ তো তাদের সারা গাঁয়েও একটি নেই। প্রায়ই সে মাঠে যায় না। শুধু সব সময় বউয়ের চার পাশেই সে ঘুর ঘুর করে। এমন কি শেষে মা এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে বলে,

---'আরে বেশরম, গায়ের লোক কি বলবে ? এখনি বৌর গোলাম হয়েছিস ?'

ছ'বছর ধরে রামু প্রত্যেক শস্যখন্দেই লাজুর জন্য হাঁসুলী বানাবার প্রোগ্রাম নেয়। কিন্তু প্রত্যেক বারই তার এ পরিকল্পনা মাটিতে মিশে গেছে। পয়লা বছর এমন অসময় বর্ষা হলো যে, আধপাকা শস্য বিনষ্ট হয়ে গেল। পরের বছর হলো অনাবৃষ্টি। সারা ক্ষেত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তৃতীয় বছর এলো প্লাবন, ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব শস্য। চতুর্থবার সব শীষ পোকায় কেটে ফেলল। পঞ্চম সালে এমন পালাই পড়ল যে, যবের গাছ আর বড়ই হলো না। ষষ্ঠ বারে হলো প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড়। সব কিছু পিটিয়ে ঝাটিয়ে শেষ করে দিয়ে গেল। কিন্তু এ বছর সব ঠিকঠাক। নতুন খালের বদৌলতে অনেক পানি পেয়েছে। সরকারী কৃষি অফিস থেকে সার এবং পোকা মারার পর্যাপ্ত ঔষুধও পেয়েছে রামু। বর্ষা বেশীও হয় নি, কমও হয় নি। এবছর রামু খুবই নিশ্চিত যে, তার লাজুর গলে রূপোর হাঁসুলী অবিশ্যি চমকাবে। কত দিন ধরে হাঁসুলী সোনামলের কাচের আলমারিতে এ দিনের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

নিজের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে রামু ভাবে, হাঁ, এখন এক আধ দিনের মধ্যেই কাটাই শুরু করে দেয়া দরকার। এমন সময় ক্ষেতের এক প্রান্তে একটুখানি ছায়া ভেসে এলো। কেন জানি রামুর মন ভয়সংকুল হয়ে উঠল। চোখ তুলে দেখল আকাশের পশ্চিম কোণে একটুখানি মেঘ দেখা দিয়েছে। সে ভাবে, আবার অকালে বর্ষা হবে নাকি? এ কেমন কথা? অন্যান্য বছর এ সময় তো বাদলা আসে না। তার বরাবর সামনের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে গংগাও একই কথা ভাবছিল।

---'আরে রামু, এ বছর কি অসময় বর্ষা হবে নাকি রে?'

---তাই তো ভাবছি ভাই।'

এতটুকু বলতেই যে বাদলা মামুলী ভাবে আনাগোনা করছিল, দেখতে দেখতে তাদের মাথার উপর এসে পড়েছে। হঠাৎই বর্ষার প্রথম ফোঁটা রামুর নাক গলিয়ে যবের এক পাকা শীষে যেয়ে পড়ল। কিন্তু সে ফোঁটা পানির নয়। বিষাক্ত বুভুক্ষ ফোঁটা। চোখের পলকে সারাটা খেত ছেয়ে গেল।

রামু চিৎকার করে উঠল---'পোকা।'

গংগা চিৎকার করল---'পোকা।'

আশেপাশের অন্যান্য ক্ষেতগুলো থেকেও আওয়াজ ভেসে এল, 'পোকা, পোকা'।

এর আগেও এ দৈব বালাই ক্ষেতে পড়তো। তারা তখন মন্দিরে ঘন্টা পিটাত, মসজিদে দোয়া করত এবং ক্ষেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিল্লা-পাল্লা করত। কিন্তু এত করেও সর্বনাশা পোকাকুলকে তাড়াতে পারতো না। এমনি করে সারা বছরের কষ্ট তাদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যেত। তারপর তাদেরকে বাধ্য হয়ে জমিদার এবং মহাজনদের দরবারে ধর্না দিতে হতো।

কিন্তু এখন তো আর সেকাল নেই। দেশ বদলেছে, ভূমি পাল্টেছে---জমিদারী নেই। এখন কৃষকদেরই নিজের জমি। এখন সাহায্যদাতা থাকলে আছে একমাত্র সরকার।

এবারে ক'জন প্রবীণ লোকই মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে বিধাতার কাছে ফরিয়াদ করল। আর বাদবাকী কৃষকরা নিজেদের কত কষ্টের এই ফসল বাঁচাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। প্রথম প্রথম অনেক ঢাক ঢোল এবং টিনের পেটরা পিটিয়ে পোকাকে ভয় দেখালো। কিন্তু এ দুশমন পেছপা হবার নয়। বেগতিক দেখে ফের তারা লাঠি এবং ডাণ্ডা নিয়ে পোকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়ে এবং ছোট ছেলেরাও ঘরে থাকল না। কিন্তু দুশমন এত সহজে কাবু হবার নয়। হাজার পোকা মারলে দশ হাজার এসে জটলা করে। মনে হয়, আকাশে একটা ছিদ্র হয়েছে। আর সেখান থেকে অবিরাম পোকা বর্ষণ হচ্ছে। লক্ষ পোকা। কোটি পোকা। তবু মোকাবেলাকারীরা পেছপা হলো না। রাতের আধারেও মশাল জ্বেলে জ্বেলে পোকার উপর হামলা চালাতে থাকলো।

এই প্রতিরোধ-কর্মে সবার আগে রামু। রাত দিন না খেয়েছে, না পান করেছে, না এক দণ্ডের জন্যে বিশ্রাম নিয়েছে। কেউ সাহস হারিয়ে ফেলে যদি বলে, এই আসমানী বালা আমরা কি প্রতিরোধ করতে পারব নাকি? একমাত্র এথেকে দয়াময় মুক্তি দিতে পারেন।' রামু তখন চোখ রাঙিয়ে বলে, 'পুরুষ মানুষ হয়ে সাধারণ পোকার সাথে হার মেনে যাব? পুরা ছ'মাস ধরে ঘাম রক্ত এক করে যে ফসল ফলালাম আর তা এই দুশমনের হাওলা করে দিয়ে যাব? চল, উঠ, হিম্মত হারিও না।'

রামুর মনে হয়, এ পোকাগুলো তার ঘোর দুশমন। শুধু তার ফসলই নয় বরং তার জীবনের সব আশা এবং সাফল্য ছিনিয়ে নিতে চায় এ পোকাগুলো। তাও নয়, তার সেই চির বাঞ্ছিত হাঁসুলীকেও

যেন রাক্ষসের মতো চিবিয়ে খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে। শুধু তাও নয়, পোকা যেন বিটকেলে থাবা দিয়ে তার প্রিয়তমা লাজুর ঘাড় মটকে ধরে রক্ত চুষে খাচ্ছে। এতটুকু ভাবতেই সে উদ্ধত লাঠি নিয়ে পোকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার। লোক বিস্মিত হয়ে ভাবে, রামুর দেহে এত শক্তি কোত্থেকে এলো।

রাত ভর কষ্ট করে সাত সকালে যখন তারা চোখ মেলল, পূবদিক থেকে---আর এক ঝাঁক পোকা উড়ে আসতে দেখা গেল। এক বুড়ো উপর দিকে একটা লাঠি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এখন একমাত্র খোদাই সহায় নইলে বাঁচা দায়।'

আবার তখনি আকাশের দিগন্তে ক্রমাগত শোঁ শোঁ একটা আওয়াজও শুনতে পেল তারা। যেন এক ঝাঁক বেহেস্তী মৌমাছি এগিয়ে আসছে। কিন্তু তা মৌমাছি নয়। উড়ো জাহাজ। পোকা তাড়াবার জন্যে সরকার পাঠিয়েছে। হঠাৎ উড়ো জাহাজখানা শূন্যতায় একটা চক্কর দিল। তারপর যবের শীষ ছুঁই ছুঁই করে ঘুর পাক খেল। এবং তার পেছন থেকে একটা ধোঁয়াটে বাদলা এসে সারা ক্ষেতগুলোকে সযলাব করে দিল। এরপর তারা দেখল শীষে বসা পোকাগুলো টপ টপ করে মাটিতে পড়ছে আর মরে যাচ্ছে।

যাহোক রামুর ক্ষেত বাঁচল। আর দশজন কৃষকের ক্ষেতও বাঁচল। এরপর রামু ফসল কাটাই করে আর ভাবে, এই তো আমাদের নতুন শক্তি রয়েছে শত পোকার ঝাঁক এলেও প্রতিরোধ করতে পারব আমরা।

তারপর শস্য গাড়ীতে চড়িয়ে মেণ্ডিতে নিয়ে গেল সে।

সরকারী দর পনের টাকা। কিন্তু লালা কড়োরীমল আড়তী গোঁপ নেড়ে নেড়ে বললেন,

---'শস্য পোকা থেকে বেঁচে গেছে। এজন্যে মেণ্ডিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল এসেছে। সেহেতু দামও কম।'

---'তো আপনি বলেন আমাদের ফসল পোকায় কাটলেই ভালো হতো?'

---'আমি তাতো বলছি না। কিন্তু দামতো বাড়তো। এখন এত ফসল মেণ্ডিতে এসেছে যে, আমি ক'দিনের জন্যে কেনা কাটা বন্ধ করে দিয়েছি।'

তারপর একটু নীচু স্বরে বললেন,

---'তা বারো টাকা মন দরে দিতে চাওতো আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি।'

---'কিন্তু সরকারী রেট তো পনের টাকা।'

---'তা শতই হোক, আমি তো বলি মাল বেশী জমেছে। আমার এখন প্রয়োজন নেই।'

---'তা'হলে আমি লালা বংশীধরের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'---রামু একথা বলে সামনের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

কিন্তু লালা বংশীধরও তাই বলল যা কড়োরীমল বললেন। এবং বংশীধর যা বলল লালা সেগুন চাঁদও তাই বলে দিল।

বাধ্য হয়ে সে লালা কড়োরীর সেখানে ফিরে গেল। লালাজী বললেন,

---'এই কিছুক্ষণের মধ্যেই দর আরো কমে গেছে। অষ্ট্রিয়া থেকে ক'টা জাহাজ এসেছে। আর আমেরিকাতেও ভাল ফসল হয়েছে এবার। সারা জগতে যবের দর কমে এসেছে। এখন আমি মাত্র এগার টাকা দিতে পারি।"

অবশেষে রামুকে এগার টাকাতেই মাল ছাড়তে হলো। সে যাই হোক। সে ভাবল, 'লাজুর জন্যে হাঁসুলী অবিশ্যি নোব। আর শেঠ মাখন লালের বীজের কর্জটা পরিশোধ করে দোব।'

শেঠ মাখন লালের নাম হওয়া উচিত ছিল শেঠ সুখন লাল। হালকা পাতলা দেহ। হাড়ক্লিষ্ট এবং গাল ভাঙ্গা। কিন্তু টাকা দেখেই তার কুত কুতে চোক চমকে উঠল। আসল দু'শো টাকা। চব্বিশ টাকা সরকারী সুদ এবং ছাব্বিশ টাকা নজরানা—বেসরকারী।

পকেট হালকা করে রামু হাঁটছিল। হঠাৎই খালের পাটোয়ারী চৌধুরী মালখন সিংএর সাথে দেখা। কৃষকদের জীবনে এর স্থান অনেক উঁচু পর্যায়ে। যাকে ইচ্ছে পানি দেয়, যাকে ইচ্ছে দেয় না। আবার যাকে চায় বেশী দেয়, যাকে ইচ্ছে কম দেয়। মালখন সিংএর কলপ-মাখা ঘন কালো বড় বড় গোঁফ। হামেশা তেল মেখে রাখে। যখনি কোন কৃষকের কাছ থেকে টাকা পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাঁর গোঁফ লোভী কুকুরের মতো নড়তে থাকে। চৌধুরী মালখন সিংএর কথা হচ্ছে, 'যত গুড় দেবে ততই মিষ্টি হবে।'---তার মানে হচ্ছে যত টাকা পাটোয়ারীর পকেটে ঢালবে, তত পানিই তোমার ক্ষেতে পৌঁছবে। তাই রামু ভাবী ফসলের জন্যে পানির বন্দোবস্ত করে

নিল। ফলে, পকেট তার আরো হালকা হয়ে গেল। তারপর যখন সে সোনামল স্বর্ণকারের দোকানে পেঁছে কাঁচের আলমারীতে সাজান হাঁসুলী দেখল মনে মনে বলল, 'আগামী খন্দে অবিশ্যি হাঁসুলী নোব।'

অনেক রাত করে বাড়ী ফিরে দেখল লাজু তার প্রতীক্ষা করতে করতে চুলোর কাছে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শানকিতে রুটি রাখা হয়েছে। চুলোর পরে হাড়িতে শাক পাক হচ্ছে। সে যখন লাজুকে আওয়াজ দিতে যাচ্ছিল দরজার কপাটে পাখাওয়ালা একটা পোকাকে লাজুর মতো করে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে দেখল। হাত বাড়িয়ে পোকাটা ধরে ফেলল রামু।

—'পোকা, তাহলে এখনো পোকার দল শেষ হয়নি।'

তার আংগুলে আটকা পড়ে পোকাটা কিলবিল করতে থাকে। আইটাই করে তার প্রাণটা যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু দিব্যি জ্যান্ত। কুপির আলোতে নিয়ে এলো সে পোকাটা। পোকাটার পেট যব খেয়ে টিম টিমে। ছোট ক'গাছি গোঁফ লোভী কুকুরের লেজের মতো দোলাচ্ছে।*

*মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৭০ বাং

সেই দু'টো চোখ

কুররাতুল আইন হায়দার

তারাবাঈর চোখ দুটো শুকতারার মত জ্বল জ্বল করতে থাকে সারাক্ষণ। সব কিছুতেই একটা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি তার। চেহারার মধ্যে ওই একজোড়া চোখই তার সব। ভাতে-মরা অভাব-অনটনক্লিষ্ট তারাবাঈ মাস তিন চারেক হল এ বাড়ীতে এসেছে। মেম সাবদের সাজগোজ এবং আসবাবপত্র দেখে সারাক্ষণ চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে থাকে তার। হায় রাম, এত আরাম আয়েশ আর প্রাচুর্য স্বপ্নেও দেখেনি সে কোনদিন।

তারাবাঈ গোরক্ষপুরের এক বাল্য-বিধবা। শ্বশুর এবং মা-বাপ মারা যাওয়ার পর তার মামা তাকে বোম্বেতে নিয়ে এসেছে। তার মামা দুধের গোয়ালাগিরি করে ওখানে।

বেগম আলমাস খুরশিদ আলমের মঙ্গলোরের আয়াটি 'দেশে' চলে গিয়েছিল। উপায়ান্তর না দেখে বিশিষ্ট সমাজসেবী বেগম ওসমানী খালাম্মা এম্‌প্লয়মেন্ট একচেঞ্জে ফোন করলেন এবং পর-ক্ষণের এই তারাবাঈ স্বপ্নের মত কাম্বালা হিলের 'স্কাই স্ক্রেপার'-এর 'গুলে নাস্তারিনের'র দশম তলায় এসে উপস্থিত হল। আলমাস বেগম সবদিক চিন্তা করে মেয়েটিকে পছন্দ করলেন। কিন্তু অন্যান্য চাকর বাকররা যখন তাকে তারাবাঈ বলে ডাকল সে বিগড়ে গেল। কিন্তু শেষ অবধি সে ডাকটাই তাকে গায়ে মেখে নিতে হল। তারাবাঈ সারাদিন কাজ নিয়ে থাকে। কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে মেম সাব এবং তার সাহেবকে চুপিসারে দেখতে গিয়েই তার দু'চোখে অপার বিস্ময় ফুটে ওঠে। চোখে পলক পড়ে না আর।

মেমসাব পারতপক্ষে স্বামী রত্নটিকে চোখের আড়াল করতে নারাজ। আর বাসায় কোন গাট্টা গোট্টা জোয়ান আয়া রাখারও ঘোর বিরোধী তিনি। ওসমানী খালাম্মা তাঁর মর্জি মতোই তারাবাঈকে নির্বাচন করেছেন। এ ব্যাপারে খালাম্মার তারিফ করতে হয়।

তারাবাঈ সকাল বেলা বেডরুমে চা দিতে আসে। সাহেবের জুতা পালিশ এবং কাপড় ইস্ত্রি করতে যেয়ে ভয়-বিহ্বলতায় তার হাত দু'টো কাঁপতে থাকে প্রায়শঃ। সাহেবের শেভের পানিও এনে দিতে হয় তাকে। ঘরদোর সাফ করার সময় তারাবাঈ তার ডাগর চোখ দু'টো দিয়ে সব কিছু খুঁটে খুঁটে দেখে। বিশেষ করে সাহেব প্যারিস থেকে যে সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে তার। তারাবাঈ প্রথম যেদিন ঘরদোর সাফ করতে করতে ভায়োলিনটার কাছে পেঁছিল, অনেকক্ষণ ধরে সেটাকে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল। কিন্তু গত পরশু যখন রোজকার মতো ঘর সাফ করতে যেয়ে ভায়োলিনটায় হাত দিয়েছিল এবং নাড়াচাড়া করছিল, তখন সাহেব এসে উপস্থিত হলেন এবং হাত থেকে ভায়োলিনটা ছিনিয়ে নিয়ে আলমিরার ওপরে তুলে রাখলেন। ভয়ে লজ্জায় তারাবাঈর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। রীতিমত কেঁদে ফেলল সে। সাহেবও এতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বারান্দার দিকে চলে এলেন। বারান্দায় মেমসাব চা-পান করছিলেন। অবশ্য মেম সাহেবের বেশীর ভাগ সময়ই হেয়ার ড্রেসার এবং বিউটি সেলুনে কাটে। মেনি কিউর, পেডি কিউর, ম্যাসাজ, ফ্যাসন---রং বেরং-এর ডজন ডজন শাড়ি এবং এটা ওটা দিয়ে মেম সাবের আলমারি একেবারে ভর্তি। তারাবাঈ মনে মনে ভাবে, ভগবান মেম সাবকে সব কিছুই দিয়েছেন। ধন দৌলত, মান সম্মান, আর রাজপুত্রের মতো এমন সুন্দর স্বামী, কিন্তু তার নিজের চেহারাটার বেলায়ই ভগবান কার্পণ্য করে গেছেন।

সাহেব নাকি মেম সাব এবং মিস সাবদের সমাজে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু বিয়ের পর বেগম সাব তার উপর নানা বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছেন। অফিসে গেলে কিছুক্ষণ পর পরই ফোন করেন। বিকেলে কোথাও একা বের হলে গোয়েন্দার মত খোঁজ রাখেন। এবং ফোন করে খোঁজ-খবর নেন। তাছাড়া বিকেলে কোন পার্টি বা মজলিশে যখন দু'জনে একত্রে বের হন, মেম সাব তাঁর উপর সচকিত দৃষ্টি রাখেন। অন্য কোন মেয়ে এসে সাহেবের সাথে একাকী কথা বলবে এমন কোন অবসরই তিনি দেন না।

মেম সাবের এসব নিয়ম-কানুন সাহেব হাসি মুখেই বরণ করে নিয়েছেন। কারণ, মেম সাবের নাকি বিস্তর টাকা-পয়সা। সাহেবের চাকুরীটাও তার বিত্তবান বাবারই দেওয়া। বিয়ের আগে সাহেব

নেহাত গরীব ছিলেন। স্কলারশিপের টাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্যে ফ্রান্স গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বেকার ঘুরছিলেন। এমতাবস্থায় মেমসাবের বাড়ীর লোকেরা তাঁকে ফাঁদে ফেলেছেন।

বড় লোকদের এসব চমকপ্রদ কাহিনী সে বাবুর্চি হাম্মাদ এবং অন্যান্য চাকর-ছোকড়াদের কাছে শুনেছে। শুনে শুনে তারাবাঈর উজ্জ্বল চোখ দুটো আরো কপালে ঠেকছে।

খুরশিদ আলম সাহেব ভালো ভায়োলিন বাজাতে পারেন। কিন্তু বিয়ের পর বেগমসাবের মহব্বতে সে সব ধান্ধা একেবারে ভুলে বসেছেন তিনি। বহুদিন হয়েছে ভায়োলিনে হাত দেননি তিনি। কারণ বিবিসাব এ যন্ত্রটাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। বেগম সাবের কাছে সাহেবের অনেক ঋণ। কারণ, এ বিয়ের বদৌলতে তার ভাগ্য ফিরে গেছে। জীবনের এত বড় পাওয়ার বিনিময়ে ভায়োলিনের মত নগণ্য শিল্প-সাধনাকে তিনি বেমালুম বিসর্জন দিতে পারেন। আগে আলম সাহেব ভাঙ্গা-চোরা বাড়ীতে থাকতেন এবং চাকরীর ধান্ধায় বাসে চড়ে সারা শহর চষে বেড়াতেন। কিন্তু এখন লাখোপতির মত কালাতিপাত করছেন। পুরুষের জন্যে অর্থ সম্পদই আসল।

খুরশিদ আলম সাহেব আর কোনদিন হয়ত ভায়োলিনে হাত দেবেন না।

এসব বছর দেড়েক আগের ঘটনা। আলমাস বেগম তখন মালাবার হিলে বাবার সুদৃশ্য বাংলোতে থাকতো। সোস্যাল ওয়ার্ক ছাড়া আর কোন কাজ ছিলনা তার। তাছাড়া বয়েস বেশী হয়ে যাওয়াতে বিয়ের আশা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলো। এমতাবস্থায় এক পার্টিতে খুরশিদ আলমের সাথে তার পরিচয় হয়। ডাকসাইটে ওসমানী খালাম্মাই এই ফাঁদটা পাতলেন। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের মারফতে আলমের খবরাখবর নিলেন। আলমের বাড়ী ইউ. পি-তে। সবে ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছে এবং জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফিরা করছে। কিন্তু এ সময় তার বিয়ের কোন ইচ্ছা নেই। কারণ প্যারিসে নাকি এক পার্সী মেয়েকে কথা দিয়ে এসেছে। সে বোম্বেতে ফিরে এলেই বিয়ের কথা ভাববে। কিন্তু বেগম ওসমানী তাকে জেঁকে ধরলেন। আলমাসের বাপকে বলে তাদের এক ফার্মে দেড় হাজার টাকা মাইনের এক চাকুরীর বন্দোবস্ত করিয়ে দিলেন। এরপর আলমাস বেগমের মা একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। এভাবে

আলমাসের সাথে তার ওঠা-বসা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আলমাসের প্রতি আলমের তেমন কোন আহামরি গোছের আকর্ষণ প্রকাশ পেল না। অফিস ছুটির পর বেশীর ভাগ সময়ই আলমাসের বাড়ীতে তাকে কাটাতে হতো। আলমাসের কথা শুনতে শুনতে যখন তার কান ঝালাপালা হয়ে যেত, আস্তে করে মুক্ত ব্যালকনিতে যেয়ে দাঁড়াত। এবং দূর সমুদ্রের তাণ্ডবের দিকে তাকিয়ে ভাবতো, একদিন না একদিন 'ও' আসবেই। আলমের সাথেই 'ও' আসতে পারতো কিন্তু ওর কোর্স তখনো শেষ হয়নি। ব্যালকনির রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে আলম বার বার ভাবতো ও একদিন আসবেই এবং সেই আশার ভারে সে যেন একেকবার নেতিয়ে পড়তো। এমন সময় আলমাস এসে তার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলত, 'কি ভাবছ তুমি?'

জবাবে সে একটুখানি মুচকি হাসত শুধু।

রাতে খাবার টেবিলে আলমাসের বাবার সাথে দেশের রাজনীতি তথা হাই ফাইন্যান্স সম্পর্কে আলোচনা করে বাড়ী ফিরতে তার অনেক রাত হয়ে যেত। বাড়ী ফিরে হাতে কোন কাজ থাকতো না। ভায়োলিনটা হাতে তুলে নিত। সুরের মূর্ছনায় ডুবে গিয়ে সে প্রবাসিনীর কথা ভাবত। ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যেত। প্রতি তিন দিন অন্তর তাদের চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়। সর্বশেষ চিঠিতে আলম তাকে জানিয়েছে যে, সে ভাল মাইনের একটা চাকুরি পেয়েছে। কিন্তু আনুষঙ্গিক যে ভয়াল গ্রাসটা ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে, তা সে ঘুণাক্ষরেও জানালো না তাকে।

এক বছর কেটে গেল। কিন্তু খুরশিদ আলমকে কোনমতেই বাগানো গেল না। অবশেষে ওসমানী খালাম্মা নিজেই কথাটা পাড়বেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু এসময় আবার আরেক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ প্রতাপগড় থেকে টেলিগ্রাম এল যে, খুরশিদ আলমের বাবা মরণাপন্ন। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র ছুটি নিয়ে সে বাবাকে দেখতে চলে গেল।

অবশ্য আলমাস বেগম খুরশিদ আলম সম্পর্কে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে ততদিনে। খুরশিদ আলম চলে যাবার ক'দিন পরেই তাজমহলে এক জার্মান পিয়ানো বাদকের কনসার্ট উপলক্ষে আলমাস বেগমরা আমন্ত্রিত হলো। ক্রিস্টল রুমে অসম বয়েসী অনেক পার্সী মেয়ে পুরুষ জটলা পাকিয়ে বসে আছে। এক অনিন্দ্য সুন্দরী পার্সী মেয়ে সবার মধ্যে প্রোগ্রাম বন্টন করছিল। মেয়েটির চোখ জোড়া

অত্যন্ত সুন্দর। এমন সুলোচনা মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। এক ভদ্র মহিলা তার সাথে আলমাসের পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটি গ্রোগ্রাম বিলি করে আলমাসের কাছে এলো। তার আপাদ মস্তক খুঁটে খুঁটে দেখে আলমাস বলল, 'আপনার নামটা যেন কি বললেন ?'

'পিরোজা দস্তুর।'

'ওহ্, কিন্তু আপনাকে তো আর কোন কনসার্টে দেখিনি কোনদিন।'

'আমি সাত বৎসর পর মাত্র গত সপ্তাহে এসেছি প্যারিস থেকে।'

'সাত বছর.....প্যারিসে ! তা'হলে আপনি তো দিব্যি ফ্রেন্স বলতে পারেন।'

'পারি বৈকি, কিছুটা।'

বলেই মিস পিরোজা মৃদু হাসল।

বিশিষ্ট মেহমানরা ক্রমশ জার্মান পিয়ানিস্টের কাছের 'সি' লাউঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পিরোজা আলমাসের কাছে ক্ষমা চেয়ে এক ইংরেজ মহিলার সাথে পিয়ানো বাদন সম্পর্কে টেকনিকেল পর্যায়ে নানা সমালোচনা শুরু করে দিল। ঘুরে ফিরে 'সি' লাউঞ্জের কাছাকাছি আবারও মেয়েটির মুখোমুখি হল সে। হল ঘরে চায়ের আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। 'আসুন এখানে বসা যাক।'

পিরোজা একজোড়া আসনের দিকে ইশারা করে তাকে বসতে বলল। দু'জন একসাথে বসে পড়ল সেখানে।

'ওয়েস্টার্ণ মিউজিক সম্পর্কে আপনার বেশ জানাশুনা আছে দেখছি।'

আলমাস একটু খোঁচা দেবার মত করে বলল। কারণ, কম বয়েসী সুন্দরী মেয়েদেরকে তার বড্ড অপছন্দ।

'জ্বী হা, আমি প্যারিসে পিয়ানো সম্পর্কেই পড়াশুনা করতে গিয়েছিলাম।'

আলমাসের মনে 'টুন' করে একটা বিপদের ঘন্টা বেজে উঠল যেন। দূর সমুদ্রের নীল দিগন্তে একটা উদাস দৃষ্টি মেলে একটা কৃত্রিম খুশী প্রকাশ করে বলল,

'হাউ ইন্টারেস্টিং ... ... তা'হলে একদিন এসো না আমাদের বাড়ী। নিজেদের পিয়ানো আছে আমাদের।'

'অবশ্যি আসব।'

'শনিবারে তোমার কি কোন কাজ আছে ? আমি একটা হেন পার্টি (Hen party) করছি। আমার বান্ধবীরা তোমাকে পেলে বেশ খুশী হবে।'

'আই উড লাভ টু কাম।'

'তুমি থাক কোথায় পিরোজা?'

পিরোজা তারুদেবের একটা অন্ধকার গলির নাম করল। গরীব ধরনের পার্সীরা থাকে সে মহল্লায়। আলমাস একটা স্বস্তির নিশ্বাস টানল।

'আমি আমার চাচার কাছে থাকি। আমার বাবা-মা নেই। কোন ভাই-বোনও নেই। চাচা-চাচী নিঃসন্তান। তারা আমাকে লালন-পালন করছেন। চাচা এক ব্যাঙ্কের কেরানী।'

পিরোজা স্বচ্ছন্দে তার আত্মপরিচয় দিয়ে যেতে লাগল। তারপর আরো নানা ধরনের কথাবার্তা হলো তাদের মাঝে। কথার ফাঁকে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে পিরোজা বলল, 'জাহাজটা যখন আস্তে আস্তে এই সমুদ্রের কূলে এসে ভিড়ল, নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। এই কাঠখোট্টা শহরে, তুমি তো বেশ করেই জানো আলমাস, এখানে সত্যিকার বন্ধু পাওয়া দুষ্কর। অথচ কি সৌভাগ্য আমার, আজই তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল।'

আলমাস সহানুভূতিসুলভ ভাব দেখিয়ে মাথা দোলাল। 'সি' লাউঞ্জে তখন কথার তুবড়ি ছুটছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎই আলমাস বলল, 'কিভাবে তুমি প্যারিসে গিয়েছিলে?'

'স্কলারশিপ নিয়ে। পিয়ানোতে ডিগ্রী নিয়ে ওখানকার এক কলেজে কিছুদিন রিসার্চও করেছিলাম। ওখানে বেশ ভালই ছিলাম। কিন্তু এখানে চাচা-চাচী একেবারে একা। দু'জনই বুড়ো হয়ে গেছেন। চাচী তো বয়েসের ভারে একেবারে বধির হয়ে গেছেন। তাদের কথা ভেবেই আমি ফিরে এলাম। তা ছাড়া----------'

'হ্যালো আলমাস, তুমি এখনো এখানে? মিসেস মুলগাঁওকর তোমাকে ডাকচেন যে।'

একজন রাশভারী মহিলা এসে বলল। পিরোজার কথা শেষ হতে পারল না। আলমাস তাড়াতাড়ি অনুমতি চেয়ে জানাল যে, সেদিন তার জন্যে গাড়ী পাঠিয়ে দেবে সে। বলেই আলমাস 'সি' লাউঞ্জের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শনিবারে যথাসময়ে পিরোজা আলমাসের বাড়ী যেয়ে পৌঁছল। মুরগী মুসল্লমের ধুম চলেছে। অনুচ্চস্বরে বিট্‌ল্‌স্‌দের রেকর্ড বাজছে। ক'দিন আগের একটা ফ্যাশন শোতে অংশ গ্রহণকারী ক'টি মেয়ে ফ্যাশন শো সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিল জোরালো কণ্ঠে।

এসব মেয়েদের মাতৃভাষা উর্দু, হিন্দী, গুজরাটি বা মারাঠি। কিন্তু অনর্গল ইংরেজীতেই তারা কথা বলছে। অত্যন্ত আঁট সাট পাতলুন তাদের পরনে। মুহূর্তের জন্যে পিরোজার মনে হল এখনো সে প্যারিসেই আছে। এদেরকেই পাশ্চাত্যের অন্ধ পূজারী বলা হয়। আসলে সে বিলক্ষণ জানে অজন্তার জ্যান্ত চিত্রের বদলে এসব পাশ্চাত্য ঘেঁষা মেয়েদের দেখে ইংরেজদেরও আফসোস এবং হতাশার অন্ত থাকে না। দেশের এই দৈন্য ঘুচাবার জন্যে সে প্যারিস এবং রোমে সম্পূর্ণ ভারতীয় বেশে চলা ফেরা করত। বোম্বের এই কৃত্রিম আমেরিকান গার্লদের অতি অভিনয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পিরোজা এক সময় ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল। হিলের পাদদেশ থেকে সাগর সৈকত অবধি একটা বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপী গোরস্তান। ঝোপ ঝাড় ভর্তি ডিবি ডিবি কবর দেখে পিরোজার গা শিউরে উঠলো। গোরস্তানের আকাশ সীমায় ক'টা ক্ষুধার্ত কাক চিল ওড়াওড়ি করছে। দূর সমুদ্রের শো শো তর্জন গর্জন ছাড়া সম্পূর্ণ এলাকাটায় একটা মৃত্যুশীতল নীরবতা। পিরোজা ভয় পেয়ে আবার প্রাণ বন্যায় উচ্চকিত হলঘরে ফিরে এল এবং একটা শোফায় এলিয়ে পড়ল।

হল ঘরের এক কোণে স্টেন ভি-র গ্রাণ্ড পিয়ানো রয়েছে একটা। পিরোজা বেশ জানে, কামরার শোভা বাড়াবার জন্যেই ওটাকে ওখানে আনা হয়েছে। মেয়েরা তখনো দেদার হৈ চৈ করছে। রেডিও-গ্রামে হেরিবেলা ফন্টের পুরনো ক্লাপ্সোর 'জ্যামাইকা ফেয়ার অয়েল' বাজছিল। শিল্পীর সুমধুর কণ্ঠ আর হৃদয় নিঙড়ানো গিটারের মূর্ছনা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছিল ঃ

Down the way where the night are gay.
And the sun shines daily on the mountain Top,
I took a trip on a sailing ship.
And when I reached Jamaica I made a stop.
But I am sad to say I am on my way and
Won't be back for many a day;
My heart is down, my head is turning around,
I had to leave a little girl in Kingston Town.

আলমাস চুপ চাপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল। রেকর্ড শেষ হতেই সে ভেতরে এসে বলল, 'আমাদের মত বেরসিক আর হয়না। একজন

বিলাত ফেরত পিয়ানিস্ট থাকতে পচা রেকর্ড বাজাতে শুরু করেছি। চলো ভাই, ওঠো- - - -।'

পিরোজা মুচকি হেসে আস্তে আস্তে পিয়ানোর টুলে যেয়ে বসল। 'কি শুনাব ? আমি ক্লাসিক বাজাতে ভালবাসি।'

'কেন, পপ (pop) বাজাতে পার না ?' মেয়েগুলো হৈ চৈ করে উঠল। 'আচ্ছা না হয় ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সং বাজাও।'

'ফিল্ম সংও বাজাতে পারিনা। তবে একটা গজল- - -হাঁ একটা গজল, যা আমি প্রায়শঃ- - -'

'গজল ?' ও- - -আই লাভ উর্দু পোয়েট্রি।' একজন খাস উর্দু ভাষী মুসলমান পরিবারের মেয়ে বলল।

পিরোজা পিয়ানোর পর্দায় হাত বুলালো আলতো ভাবে। এক মধুর সুর মঞ্জরী গুঞ্জন করে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে এক মন-মাতানো সুরের ইন্দ্রজাল আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল সবাইকে।

'শুধু বাজালে হবে না, সাথে তুমি নিজে গাও।'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

'আমি তো ভাই গাইতে পারি না। আমার উর্দু উচ্চারণ খারাপ---অত্যন্ত খারাপ।'

'আচ্ছা, তাহলে চরণ দুটো বলে দাও, আমরা বরং গাই, তুমি বাজাও।'

পিরোজা চরণ দুটো বলে দিল ঃ তু সামনে হ্যায় আপনে
বাতলা দে তু কাঁহা হ্যায়, কেহ তারাহ্ তুম কো দেখোঁ
নজজারা দরমিয়ান হ্যায় ?

মেয়েরা সাথে সাথে গাইতে শুরু করল! 'নজ্জারা দরমিয়ান হায়'
'নজ্জারা দরমিয়ান হায়- - - -

গজল শেষ হলো। করতালির গুঞ্জনে ভরে উঠল হলঘর।

'এবারে একটা ওয়েস্টার্ণ মিউজিক হোক।' কে একজন ফরমাস করল।

'শোপাঁ-র ম্যাডেনস্ ফ্যান্সি বাজাব ? প্যারিসে আমরা প্রায়শ ওটা বাজাতাম।'

এক পক্ষ কালের মধ্যেই পিরোজার সাথে আলমাসের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। ইতিমধ্যে পিরোজা এক কনভেন্ট-কলেজে পিয়ানিস্টের চাকুরি পেয়ে গেছে। ছুটির পরে কলেজ খুললে পিরোজা জয়েন করবে। সপ্তাহে তিনবার এক আমেরিকান ভদ্রলোকের বছর দশেকের এক মেয়েকে পিয়ানো শেখাবার ট্যুশনিও পেয়ে গেছে একটা। আমেরিকান ভদ্রলোকের সম্প্রতি পত্নী বিয়োগ হয়েছে। শোক ভুলবার জন্যে এদেশ

সফর করতে এসেছেন। ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে ভদ্রলোক জুহুর সান এণ্ড সিণ্ড-এ অবস্থান করছেন। তারুদেব থেকে জুহুর দূরত্ব অনেক। কিন্তু ভদ্রলোক পিরোজাকে ভাল মাইনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পিরোজার দিনগুলো মোটামুটি কেটে যাচ্ছে বেশ। ক'দিন পর 'সে'ও দেশ থেকে ফিরে আসছে। চাকরি এবং ট্যুশনির খবরটা দিয়ে তাকে ভড়কে দেয়া যাবে।

একদিন আলমাসের সাথে গার্ডেনে পায়চারী করছিল সে। ফোয়ারার কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎই আলমাস তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা, ওই উর্দু গজলটা তোমাকে কে শিখিয়েছিল? ওই যে পিয়ানোতে বাজিয়েছিলে সেদিন?'

'ওহ্--------সেটাতো প্যারিসে শিখেছিলাম। আমার লাভার আমাকে শিখিয়েছিল।'

'ইওর লাভার, হাউ ইন্টারেস্টিং? তুমি এক নম্বর ফোর টুয়েন্টি, কৈ, একদিনও তো বললে না তার কথা।'

'ও তো তোমাদের কম্যুনিটিরই।'

'বাহ্ সত্যি বেশ মজাতো।'

'হ্যাঁ, আমরা অবশ্য পুরোপুরি দস্তুর সম্প্রদায়ের। কিন্তু আমার চাচা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদার। তিনি স্বচ্ছন্দে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।'

'নামটা জানতে পারি কি তার?'

নামেরও একটা সুন্দর ইতিবৃত্ত আছে। খুরশিদ আলম পিরোজার নার্গিস নয়ন যুগলের উপর মজেছিল। প্যারিসের ভারতীয় দূতাবাসে খুরশিদ আলমের সাথে পিরোজার যখন প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়ে একজন বলল,

'নিন্, পরিচয় করুন, ওঁর নাম পিরোজা দস্তুর।'

উত্তরে খুরশিদ আলম রসিকতা করে বলেছিল, 'আপনার নাম তো নার্গিস হওয়া উচিত ছিল।'

'নার্গিস? ছি, নার্গিস তো আমার আণ্টির নাম।'

'তওবা---আচ্ছা, আপনার খোরসেট, নার্গিস, পিরোজা---এমন সুন্দর সুন্দর ইরাণী নামগুলোকে কিভাবে বাগিয়ে দিয়েছেন বলুন তো! আমি কিন্তু আপনাকে বরং পিরোজা বলেই ডাকব, কোন আপত্তি নেই তো?'

'না, আপত্তি কিসের আবার।'

পিরোজা হাসতে হাসতে বলেছিল।

এরপর একদিন নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে খুরশিদ আলম তাকে চরম আবেগ ভরে বলেছিল, 'তোমার চোখ দুটোর তুলনা হয় না পিরু। তোমার দু'চোখে হাজারো গান হাজারো কাকলি লুকিয়ে আছে। একজোড়া নাগস ফুল সহসা কেমন করে তোমার দু'চোখে রূপান্তরিত হল, আশ্চর্য !'

'কৈ নামটা বললে না তো।'

আলমাসের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল সে।

'খুরশিদ আলম'।

বলেই একটা দীর্ঘ লয় নিয়ে পিরোজা মাথা নত করল। কালো রঙের শাড়ি পরিহিতা আলমাস কোমরে হাত রেখে একটা কালো উটের মত ঘাড় কাত করে পিরোজার একেবারে মুখোমুখি হয়ে বলল, কি আশ্চর্য পিরু দেখ দেখি। আমার ওর নামও কিন্তু খুরশিদ আলম ! সেও বেশ পিয়ানো বাজাতে পারে। কিছুদিন হল প্যারিস থেকে এসেছে বাবার অসুখের খবর শুনে দেশে গেছে।'

আগস্টের আকাশে সহসা কড় কড় করে বিজলী চমকালো। কিন্তু কেউ দেখলো না, কেউ জানলো না, একটা শাণিত বজ্রখণ্ড এসে নিপতিত হলো পিরোজার সুকোমল ষোড়শী হৃদয়ে। বজ্রাহত পিরোজা যখন সম্বিত ফিরে পেল, চোখ দুটো ছানাবড়া করে চার দিকের বিরাট উঁচু উঁচু দেয়ালের দিকে তাকাল। নিজের মনের ক্যামেরায় বিরাট বনেদী মহলের ছবিটা এক্সরে করে নিল সে। কাঙ্গালা হিলের এই শীর্ষ সমাজে, এই বিলাস স্বর্গের পাশে তারুদেবের একখানি জীর্ণ কুটিরের একটি অভাবগ্রস্ত পার্সী মেয়ের কিইবা দাম, কীইবা তুলনা। অদূরে আর একবার বিজলী চমকালো। হিলের সারি সারি স্বর্গরাজী পলকের জন্যে ঝকমক করে উঠল আবার।

পিরোজা একটা দুর্দান্ত চাপা শ্বাসকে দমন করে নিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়াল। খুরশিদ আলমের শেষ চিঠিগুলো কেন যে কিছুটা খাপছাড়া হয়েছিল, এবার আর বুঝতে বাকী রইলোনা তার। প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হল।

'আচ্ছা, আলমাস, এখন আসি। তোমার আশা পূরণ হোক, খোদা হাফেজ।' পিরোজার কণ্ঠে একরাশ ক্লান্তি।

'চললে নাকি পিরু, দাঁড়াও গাড়ী বের করে দিচ্ছি, ড্রাইভার।'

'দরকার নেই আলমাস, শোকরিয়া।'

একজন পরাস্ত পলাতকের মতো সে হাঁপাতে হাঁফাতে সড়কে এসে পৌঁছল। সাথে সাথেই একটা বাস এসে দাঁড়াল। পিরোজা উঠে লেডিজ সিটে বসে পড়ল।

এ ঘটনার তিন দিন পর খুরশিদ আলম আলমাসের বাবার কাছে আরো ক'দিনের ছুটি প্রার্থনা করে এক চিঠি লিখল। কারণ, বাবা তার এখনো অসুস্থ। সে যে আলমাসের বদলে এক গরীব পার্সী মেয়েকে সম্প্রতি বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তার চিঠিতে এমন কোন আভাসই পাওয়া গেলনা। চিঠির আগাগোড়াই তার বাবার কথা বলা হয়েছে সবিস্তারে। তবে আলম যে খুবই ব্যস্ত চিঠি পড়ে তা অনেকটা আঁচ করা যায়।

বাবার বদলে আলমাসই তার চিঠির জবাব দিল ঃ

তোমার যতদিন ইচ্ছা বাড়ীতে থাক। তোমার বিপদ-আপদে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমরা সবাই তোমাদের জন্যে চিন্তিত। ডেডি তোমাকে তো আর পর মনে করে না যে, এজন্যে আবার ঘটা করে ছুটি চাইতে হবে।

সেদিন সান এণ্ড সিণ্ড-এ সুইমিং করতে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ এক পার্সী মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ হল। সুন্দরী, সুনয়না, সবেই প্যারিস থেকে এসেছে। ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে। সম্ভবত কোন আমেরিকানের গার্লফ্রেণ্ড। তার সাথেই হয়ত সান এণ্ড সিণ্ড-এ থাকছে। তুমিও মেয়েটিকে প্যারিসে দেখে থাকবে হয়ত।

না হয় এক কাজ কর, আব্বা মিয়াকে এখানে নিয়ে আস। আসার আগে অবশ্য টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিও, যাতে করে 'ব্রিচ কেনেডি হসপিটালে' কামরা রিজার্ভ করে নিতে অসুবিধা না হয়।

ইতি
তোমারই
আলমাস

সন্ধ্যায় তারুদেবের জৌলুসহীন গলিতে একখানি টেক্সি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে খুরশিদ আলম বেরিয়ে এল। নোট বুক খুলে নম্বর দেখতে দেখতে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বারান্দার সিঁড়ি রাস্তা অবধি নেমে এসেছে। একটা অন্ধকার কামরার জানালার কাছে এক পার্সী বৃদ্ধ কোমরে বাঁধা 'কুস্তি' খুলে গিরা দিয়ে দোয়া-দরুদ পড়ছেন। বুড়োর গায়ে সিদ্রিয়া ; পরণে ময়লা পাতলুন আর মাথায় গোলাকার টুপি। কামরার একদিকে একটা জড়োসড়ো আরাম

কেদারা পড়ে আছে। মাঝখানে একটা টেবিল পাতা। দেয়ালে জরথস্ত্রর একটা বিরাট প্রতিকৃতি লটকানো। ভেতর থেকে নারকেল এবং মাছের গন্ধ ভেসে আসছিল। এক বুড়ো পার্সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। পরনে লাল জর্জেট শাড়ি, মাথায় রুমাল বাঁধা।

'মিস দস্তুর আছে?'

'কে, পিরোজা?' ভদ্রমহিলা খুরশিদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'সে জুহু গেছে, সান এণ্ড সিণ্ড-এ।'

'মিস দস্তুর কি ওখানেই থাকছেন?'

মহিলা সম্মতি জানিয়ে মাথা দোলাল।

'ওখানে কে আছে, কার কাছে..... ?'

মহিলা ভেতরে গিয়ে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এলেন। কার্ডে একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের নাম রয়েছে।

'তোমার নাম কি মিঃ খুরশিদ আলম? পিরোজা বলেছে তুমি আসতে পারো, তুমি আসলে আমি যেন তাকে ফোন করে জানিয়ে দিই। কিন্তু তার ঠিকানা তোমাকে দিতে বারণ করেছে।'

বলেই মহিলা ব্লাউজের পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করল। খুরশিদ আলম ভ্যাবাচেকা খেয়ে বুড়ো মহিলাকে দেখছিল বার বার।

'এ সম্পর্কে আপনার কোন বক্তব্য নেই?'

বৃদ্ধা মহিলা নেতিবাচক মাথা দোলালেন।

'না বাপু, আমরা গরীব-সরীব মানুষ, ও এখন এক আমেরিকানের সাথে আছে-----।

হঠাৎই ভদ্রমহিলার খেয়াল হল তাকে বসবার জন্যে তো বলা হয়নি। একটু বিনীত হয়ে বললেন, 'আরে, ভেতরে এসো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন দেখায়।'

খুরশিদ আলম কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ ঘুরে টেক্সিতে যেয়ে বসল। বৃদ্ধা হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল।

ওদিক বুড়ো দোয়া-দরুদ শেষ করে সবে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে টেক্সি আড়াল হয়ে গেছে।

আলমাস এবং খুরশিদ আলমের বিয়ের দিনটা বেশ দুর্যোগপূর্ণ ছিল। প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া আর ইলশে গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। ডিনারের পূর্বক্ষণে বৃষ্টিটা থেমে গেল। আলমাসদের পারিবারিক বন্ধু ডঃ সিদ্দিকী সবেই বোম্বেতে বদলী হয়ে এসেছেন। তিনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা প্রত্যক্ষ করছিলেন। ঝড়ো হাওয়া গোরস্তানের ঝোপঝাড়ের সাথে শাঁ শাঁ করছে।

ভেতরে ঝাড়বাতি ঝলমল করছে। মেহমানদের হাসাহাসি এবং গালগল্পে হল গমগম করছে। এমন সময় একজন ভৃত্য এসে খবর দিল আলম সাহেবের ফোন এসেছে। বিয়ের সাজগোজ শুদ্ধই আলমাস ত্বরা করে রিসিভার তুলে নিল। হাসপাতাল থেকে এক নার্স ব্যস্তসমস্ত হয়ে শুধু জিজ্ঞেস করছে, 'এখানে খুরশিদ আলম বলে কেউ আছেন?'

'তাকে দিয়ে আপনার কি দরকার, সেইটেই বলুন আগে।'

'দেখুন, ব্যাপার হলো মিস পিরোজা দস্তুর নামে এক প্যাসেন্ট বেশ কিছু দিন থেকে আমাদের এখানে আছে। এখন তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। সে মিঃ আলমকে শুধু একবার দেখতে চায়। যদি দয়া করে একটু-----'

'মিঃ আলম এখানে নেই।'

'আর ইউ সিওর?'

'ইয়েস আই এম ভেরী সিওর।' আলমাস গর্জন করে উঠল, 'কেন আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না?' বলেই ধরাম করে রিসিভার রেখে দিল।

দু'ঘণ্টা পর আবার ফোন এলো।

ডঃ সিদ্দিকী অপনার কল। হাসপাতাল থেকে ডাকছে আপানাকে।' গ্যালারী থেকে কে একজন বলল।

ডঃ সিদ্দিকী ত্রস্তে রিসিভার তুলে নিলেন। তারপর আলমাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভাই,আমাকে ক্ষমা করতে হবে। জরুরী কল, এক্ষুণি ভাগতে হচ্ছে আমাকে।'

আলমাস দরজা পর্যন্ত গিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে বলল, 'কিন্তু' কালকে অবশ্যই আসবেন। আমরা এক সপ্তাহের জন্যে পুনা যাচ্ছি।

'অবিশ্যি আসব, গুড নাইট।'

খুরশিদ আলমের পিতা ব্রিচ কেনেডি হসপিটাল থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে প্রতাপ গড় ফিরে গেলেন। যৌতুক হিসাবে নব দম্পতিকে কাম্বালা হিলে একটা ফ্লাট দেয়া হল। ফ্লাটটি বাসোপযোগী করে তোলার পূর্বে খুরশিদ আলম আপাততঃ শ্বশুরালয়েই থাকছে। সকালে অফিসে যাবার আগে প্রয়াশঃ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ানোটা খুরশিদ আলমের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। নিচে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সরু আকাবাঁকা একটা জনপথ নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশঃ গোরস্থান অবধি গিয়ে মিশেছে। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ডিবি ডিবি কবর। শাদা কফিনে ঢেকে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে

কিছু অজানা অচেনা লোক। আশেপাশের গাছগাছালিতে কাক চিল আর মাংসখেকো বিরাটকায় পাখী ঝিমুচ্ছে। নতুন শিকারের আশায় আকাশে ওড়াওড়ি করছে। ঝোপে ঝাড়ে দু'চারটা শ্বাপদ খেঁকশিয়াল 'খেক' 'খেক' করছে। অদূরে লোহার তৈরী ফটক। কি সাহস, এই মরণ খোলায় সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে একজন শাদা দাড়ি-অলা ভয়ানক চেহারার পাশী দারোয়ান বসে থাকে সারাক্ষণ। চিরনিদ্রায় শায়িত বিদায়ী, মেহমানকে রেখে পোশাকধারী শোকাকুল পাশী মেয়ে পুরুষ আস্তে আস্তে ফটক ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং রুমালে চোখ মুছতে মুছতে গাড়ীতে এসে বসে। ওদিকে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর সকল মৌনতার, সকল স্তব্ধতার বিরুদ্ধে হুমকি জানিয়ে শোঁ শোঁ করতে থাকে, ফোঁস ফোঁস করতে থাকে ফণাধর উদ্ধত সাপের মত।

ওদিকে ইরিত্রিয়ার মহারাজার সমাধি মন্দিরে নিত্যকার মানবিক বিজ্ঞাপন মানুষের চেতনাকে দেশ-দেশান্তরে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

একদিনকার বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ঃ চেতনার হাজার চোখ, কিন্তু মনের চোখ একটি। কিন্তু যে মানুষের প্রেম ফুরিয়ে যায়, সারা জীবনই তার নিরর্থক, অসাড় হয়ে উঠে।

সেই মরণ খোলাতেই যদি তার আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে থাকে, কাক চিল এবং বন্য শ্বাপদরা তার পরিত্যক্ত দেহকে তাহলে কবেই হজম করে বসে আছে। আর তার আত্মা? আত্মা তার অমর-লোকে বিচরণ করছে এখন। সহগামী কোন আত্মাকে হয়ত সে বলছে, 'আমি ভাই একেবারে নতুন।'

তারাবাঈ এখনো তার রহস্যময় ডাগর চোখ দুটো দিয়ে সব কিছু খুঁটে খুঁটে দেখছে। রোজ সাহেবের ফাই-ফরমাশ খাটে, কিন্তু তবুও সাহেবকে দেখলে তার চাখের পলক পড়তে চায়না। মাঝে মাঝে সাহেবও ভ্যাবাচেকা খেয়ে যান ওর চাহনি দেখে। আলমাস বেগম আজকাল বেশ ভারী হয়ে উঠেছেন। খুব শিগগীরই তারাবাঈর কাজ বেড়ে যাবে।

আজ সকাল বেলা আই স্পেশ্যালিস্ট ডঃ সিদ্দিকী এসেছিলেন। মেহমানদের জন্যে তারাবাঈ যখন চা নিয়ে এলো, ডাক্তার রীতিমত আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, 'আরে, তারাবাঈ যে। তুমি এখানে কাজ করছ বুঝি?'

'জী ডাক্তার বাবু।'

'এখন বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?'

'জী, সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection
বইটি সাবধানতা এবং মমতার সাথে ব্যবহার করুন।

'গুড।' তারপর তিনি আলম দম্পতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জান আলমাস, ওকে নিয়ে আমরা ভাল একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। দশ বছর বয়েসে ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানতো, সেই তোমাদের বিয়ের রাতে হঠাৎ করে বের হয়ে গেলাম। আসলে না যেয়ে আমার উপায়ও ছিলনা। পিরোজা নামের এক পার্শি মেয়ে প্রায় এক মাস রোগে ভুগে সে রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুর আগে সে তার চোখ দুটো খুলে আই ব্যাঙ্কে জমা দেবার কথা বলে গিয়েছিল। সুতরাং মরার সাথে সাথেই চোখ দুটো খুলে নেবার জন্যে আমাকে ডাকা হল। আমি তো চোখের ডাক্তার। জীবনে বহু চোখ দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দর একজোড়া চোখ আমি আর কোনদিন দেখিনি আলমাস। চোখ দুটো খুলতে গিয়ে আমার হাত জমে গিয়েছিল।

এর কিছুদিন পর তারাবাঈর মামা তাকে আমার কাছে নিয়ে এল, কোন এক ডাক্তার নাকি তাকে বলেছে, নুতন কুনিয়া লাগালে মেয়েটি দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে। আমি সেই মেয়েটির সুন্দর চোখ জোড়া এনে ওর চোখে লাগিয়ে দিলাম। দেখ, কি সুন্দর দেখতে পাচ্ছে মেয়েটি। সত্যি মেডিক্যাল সায়েন্সের প্রশংসা না করে উপায় নেই।'

ডাক্তার সিদ্দিকী কথা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন। মুহূর্তের মধ্যে আলমাসের চেহারায় এতটা ভীতির ছায়া ফুটে উঠল। খুরশিদ আলম অনেকটা সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে নিজেকে লুকাবার জন্যে পড়ি মরি করে বেডরুমের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। শরবিদ্ধ কপোতীর মত যন্ত্রণাকাতর আলম প্রায় হুমড়ি খেয়ে শোফার উপর পড়ে গেল। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালায় তার বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে যেতে লাগল।

তারাবাঈ এসব দেখে শুনে একেবারে হতবাক। সে ভাবল, না জানি কি অপরাধ করে বসেছে সে। এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে রওনা দিল। কিন্তু বেডরুমে বসে তার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন সাহেব? সাহেব তার চোখে কি খুঁজছেন? কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে থালা বাসন টেনে নিয়ে সে রোজকার মতো মাজতে বসে গেল। দূরের গোরস্তানে শ্বাপদ জানোয়ারদের দাপাদাপি আর কাক চিলদের কা কা চিঁ চিঁ ভেসে আসছিল রান্না-ঘরের জানলা দিয়ে।

কাগা ছব তন খাইও
চুন চুন খাইও মাছ
দুই নান্নিয়া মত খাইও
জিন্ সে পিয়া মিলন কি আস।

কুদরতুল্লা শাহাব

'তাহলে লঙ্গরখানাতেই মর গিয়ে।' হরিবল্লভ গোমস্তা ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়া গোঁফরাজি সরিয়ে নিয়ে বলল, 'এখানে ধুঁকে মরলে কে দেখবে তোকে শালী? যা, বিকেল পর্যন্ত ভেবে দেখ।' বাঁ হাত দিয়ে গোঁফগুলো আর একবার সামলে নিল সে। শালী, আমি তোর বাপের সমান। পাথরের ভগবানরা ভোগ চায়, কিন্তু আমাদের ভগবান সারা জীবন মানুষের সেবা করে।'

বলেই হরিবল্লভ একটু কৃত্রিম হাসির চেষ্টা করল। কাঁচা-পাকা-ভারী এক গুচ্ছ গোঁফের ফাঁকে তিনটা ময়লা হলদে দাঁত চাপা আবেগে শিরশির করছিল তার। একটা অব্যক্ত গালি মাথা কুটে মরছিল তার মধ্যে।

হরিবল্লভের ক্রূর ঠোঁট দুটোর ফাঁকে বিষ মেশানো রয়েছে মনে হয় কামিনীর। হরিবল্লভের নিষ্ঠুর হাসি দেখলে কামিনীর বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। কামিনীর বাপ থাকতে সে যখন তহসিলদারী করতে আসতো, তার মুখের অসংযত গালি-গালাজ শুনে তার মা লজ্জায় কুঁকড়ে যেতো। তার বাপ ঘন ঘন কেশে হরিবল্লভের উদ্ধত কণ্ঠকে চাপা দিতে চেষ্টা করতো। কামলা খাটাবার দিনে তো তার মূর্তি আরো নিষ্ঠুর আকার ধারণ করত। ছাতির বদলে হাতে থাকতো ছড়ি, কথায় কথায় ছড়ি চলতো।

এর পর যেদিন কামিনীদের ঝুপড়ি জনশূন্য হয়ে পড়ল. খোলা মাঠের মত খাঁ খাঁ করতে লাগল বহু স্মৃতিবিজড়িত একটি পূর্ণকুটির, কামিনীর মনে হল সে একটি ছিন্ন মাকড়সার জালের মধ্যে অসহায় একটি পোকার মত আটকা পড়ে গেছে। একান্ত একা, সহায়হীন, কণ্ঠরুদ্ধ একটি নারীসত্তা—হরিবল্লভ তার কুটিল অভিব্যক্তি নিয়ে হাজির হল এবং ময়লা দাঁতের ফাঁকে লোলুপ জিহ্বা নেড়ে চিবিয়ে

চিবিয়ে গালিবর্ষণ করে বশ করে নিল তাকে ভগবানের জন্যে, গণ-দেবতা সুশীল ঠাকুরের জন্যে।

'কেঁদে কি হবে পাগলী, তোর বাপ গেল, মা গেল, ভাই গেল—সবাইতো গেল—কেউ থাকবে না—উপরে ভগবান, চল্—তুই আমার মেয়ের মত—সুশীল ঠাকুরের কাছে তোর কোন কষ্ট হবে না, পাথরের ভগবান ভোগ চায় কিন্তু আমাদের ভগবান—'

একান্ত একা, সহায়হীন, রুদ্ধকণ্ঠ কামিনী অবলম্বনটাকে আঁকড়ে ধরল। সুশীল ঠাকুর শুধু হরিবল্লভেরই ভগবান নন—বরং আট-খানা গ্রামের ভাগ্যদেবতা, অন্ন বিধাতা। দেবতা বাগডোরটাকে টেনে টেনে আকৃষ্ট করতে লাগলেন। কখনো হেঁচকা টানে, কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে আদর দেখিয়ে, রাগ দেখিয়ে, আবেগ দেখিয়ে—আস্তে আস্তে আবিষ্ট হতে লাগল চোখ বুঁজে, লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে মন্ত্র-মুগ্ধের মত ক্রমশ ফাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। লজ্জা-সম্ভ্রম—এতো শুধু চোখের একটি হালকা পর্দা। ছোট বেলায় পাঠ-শালায় তাকে কত কানমালা খেতে হতো। কাঁচা ছড়ির উপর্যুপরি প্রহার খেয়ে বাহু লাল হয়ে যেত। গীতার শ্লোক ভুলে যাওয়াটা তার রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পণ্ডিত মশাই ছড়ি দোলাতে দোলাতে উচ্চ-স্বরে পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে এক সময় হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে উরু চুলকাতে শুরু করতেন এবং পুরানো রেকর্ডের মত গুন গুন করে গেয়ে উঠতেন,

ও বঁধু তোমার ঘোমটা খোল
নয়ন ভরে দেখব তোমায়
------ঘোমটা খোল।

বাগডোরে এমন হেঁচকা টান পড়ল একদিন, সবকিছু ছিন্ন হয়ে গেল। আটখানা গ্রামের ভাগ্য-বিধাতা, গোমস্তা এবং কামিনীর অন্ন-দেবতা সুশীল ঠাকুর-এর একি রূপ? কামিনী চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। ঠাকুর একেবারে নগ্ন হয়ে কামড়াতে দাঁড়িয়েছিল একেবারে নেংটা শিশুর মত। কামিনী রেগে মেগে গজর গজর করতে করতে মুখে যা এল তাই বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। এত-বড় অবলম্বনটা সে নিজের হাতে পায়ে দলে চলে এল। একটা নিদা-রুণ অস্বস্তি তার বুকটাকে নিষ্পিষ্ট করছিল। ঘন ঘন উষ্ণ শ্বাস বেরুচ্ছিল তার নাক-মুখ দিয়ে। কামিনী যেন কোন ছিদ্র দিয়ে

আকাশের দেবতাদের বিষ্ঠা খেতে দেখে ফেলেছে। আবার ঝুপড়িতে ফিরে এল সে। এসেই এক ঝটকা টানে তুলসী গাছটাকে উপড়ে ফেলল। এবং ছোট্ট বেদীর ওপর রাখা মাটির দেবতাটিকে তুলে পেছনের পুকুরে ছুড়ে মারল। গট্ গট্ গট্----জল খেতে খেতে নিষ্প্রাণ দেবতাটি ডুবে গেল পুকুরের অতলে। কামিনীর বুকটা একটা হালকা আমেজে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

'তোরা কুত্তা, কুত্তার জাত---চারদিন থেকে পেটে পাথর বেঁধে পড়ে আছিস, কই, কেউ জিজ্ঞেস করল? চল্---ওঠ্---আবার তোকে ঠাকুরের বাড়ীতে দিয়ে আসি। আমি তোর বাপের সমান, আমার কথা ফেলিস না।'

'না চাচা, আমি আর ওখানে যাব না।'

'তাহলে কোথায় যাবি? ওরে আমার মহারাণীরে।'

'কেন, লঙ্গরখানায়।'

'তাহলে সেখানেই মর গিয়ে।' বাড়ন্ত গোঁফ গুচ্ছ সামলে নিয়ে হরিবল্লভ গোমস্তা বলল, 'এখানে তোকে কেউ দেখবে না মাগী।'

কামিনীর ভয়ে বুক দুরু দুরু করছিল, আবার রাগও লাগছিল তার। আমি তো লঙ্গরখানায় যাবই। কিন্তু চাচার এত নাক গলানো কেন? চাচার কি ঠেকা পড়েছে? হরিবল্লভ তার শেষ বিট-লেমি হাসিটা চুঁয়ে চুঁয়ে বিকশিত করে আস্তে উঠে দাঁড়াল, কামিনী একটা স্বস্তির নিশ্বাস টেনে নিয়ে পুড়ির আঙ্গিনায় একবার আলতো নজর বুলিয়ে নিয়ে দূর চক্রাবালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। তার পর কি মনে করে উপড়ানো তুলসীর পাতাগুলো কুচা করল কতক্ষণ। এবং এক সময় অনাথ আশ্রমের দিকে রওয়ানা দিল।

পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে, তার পর লঙ্গরখানা। তিন ক্রোশ পর রুকমিণীর বাসা পড়ে। রুকমিণী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,

'কই যাস, কামি?'

'লঙ্গরখানা।'

'কাগজ কই?'

'কিসের কাগজ?'

'সুশীল পঞ্চায়েতের কাগজ লাগবে, সুশীল পঞ্চায়েতের হুকুম না হলে লঙ্গরখানায় ঢুকতে দেবে না।'

'দেখি, বিনা কাগজেই যাওয়া যায় কিনা।'

কামিনী এক রাশ নিরাশা বুকে চেপে নিয়ে বলল,

'হাঁ, বাবু মানুষ ভালই, বিনা কাগজেও নিতে পারে তোকে।'

রুকমিণী কামিনীর গালে একটা টোকা দিয়ে বলল, 'চুলগুলো একটু বেঁধে-ছেদে নে ভাল করে।'

বলেই রুকমিণী একটা লাল কম্বলের ভেতর থেকে ক্রিমরোল বিস্কুটের প্যাকেট বের করল।

'খুব পরিশ্রম করেছিস, নে।'

'বিস্কুট পেলি কোথায় রুকি? আবার কম্বলও।'

'ধুৎ পাগলী, আকাল লেগেছে ভাতের। কম্বল আর বিস্কুটের তো আর আকাল হয়নি।' বলেই রুকমিণী ধুতির আঁচলটা তুলে বুকের ওপর ভারী করে দিল---'এই যে রাস্তা বানায়, কি নাম যেন---অ হ্যাঁ লুথার সাহেব---সাহেবের ক্যাম্প---কি আর কইমু তোরে---ছি ছি লজ্জা---হি হি হি হি---

রুকমিণী চোখে ঠার মেরে হাসতে লাগল। রুকমিণীর গা থেকে কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ আসতে লাগল। মুখে যেটুকু ক্রিম বিস্কুট পুরে দিয়েছিল, কোনমতে গলাধঃকরণ করে দু'গ্লাস পানি চাপিয়ে দিল তার ওপর। তার পর আর কোন কথা না বলে অনাথ আশ্রমের দিকে পা চালিয়ে দিল সে।

রুকি কম্বল বিস্কুট এবং লুথার সাহেবের তাম্বু---সব কিছু যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার। একটা অদৃশ্য মাকড়াসার বেড়াজাল আবারও তার চেতনাকে আবিষ্ট করে চলেছে। লঙ্গরখানার প্রবেশ পথে গেট-কিপার কামিনীর পথরোধ করে দাঁড়াল এবং ধমক দিয়ে বলল,

'আপনি কে, একেবারে গট গট করে রওয়ানা দিলেন যে?'

'আমি লঙ্গরখানায় থাকব, বাবু।'

'কাগজ আছে?'

'না।'

'তাহলে কাগজ নিয়ে আয়। মামার বাড়ীর আবদার আর কি। ইচ্ছা হল আর লঙ্গরখানায় চলে এলাম। ভাগ্।'

ছেড়েই দাও না, কি হবে? বাবু আছেন, কাগজের কথা তিনিই জিজ্ঞেস করবেন। ছেড়ে দাও দোস্ত।

গুলজার হোসেন সিকা কামিনীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললো।

'হাঁ, হাঁ, ছেড়েই দাও।' ভুপেন বাবুর্চিও পক্ষপাতিত্ব করে বলল, 'মাল মন্দনা।'

'হাঁ ভাই, একেবারে খাসা চিজ।'

শেখু মোক্তারও একবার ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল।

অনাথ আশ্রমের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কামিনীর আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে—সব দিকে ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে একটু মুচকি হেসে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'ও ডাক্তার, তুমিও টেস্ট করে দেখো।'

ডাক্তারও পরীক্ষা করে দেখলেন?

'ঠিক আছে, স্যার।'

তার পর দু'জনে মিলে একটু ঘনিষ্ঠ হাসি হাসলেন। কামিনী ইতিউতি করে লঙ্গরখানায় ঢুকে পড়ল। টেস্ট করার সময় ডাক্তার ডান দিকের কোমরে এমন একটা চাপ দিলেন, তখন অবধি টন টন করছিল তার পাঁজরটা। লঙ্গরখানায় ঢুকেই হঠাৎ তার ইচ্ছে হল, না, দরকার নেই তার লঙ্গরখানার। চলে যাবার মনস্থ করেছিল। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হতেই বীণার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। বীণার হাতে একটা ময়লা সানকি। কামিনীকে দেখে সে ধেয়ে এল।

'আরে কামিনী যে, কখন এলি?'

বীণার চোখেমুখে একরাশ খুশি ছড়ানো। বীণা এখানে এসেছে মাস চারেক হবে। সে অবশ্য পঞ্চায়েত ঠাকুরের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছিল।

'সুশীল ঠাকুরের কাছে যাসনি বুঝি। ঠাকুর বড় ভাল লোক, গেলেই কাগজ দিয়ে দেয়।'

কামিনী ভাবল, ভাল মানুষ না ছাই।

'আয় কামি, এদিকে আয়। চল্, এখানে বসি।'

কামিনীর বুকটা আবার দমে যেতে লাগল। কে যেন তাকে ঘাড় ধরে একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। চারদিকে ভয় বিভীষিকা সাই সাই করছে। মানুষের বিটকেলে প্রেতাত্মাগুলো ঘুরাফিরা করছে তার চারদিকে। লঙ্গরখানায় সাড়ে চারশো প্রেতাত্মার অবস্থান। এসব হাড়ক্লিষ্ট লিকলিকে আজব জন্তুদের দেখলে গা শিউরে উঠে রীতিমত। আর ক'দিন পর এদের পাঁজর থেকে হাড় খসে খসে পড়বে যেন। কুঁজো হয়ে বসে আছে গণ্ডা গণ্ডা বুড়ো মেয়েলোক। তৈলহীন মাথার কেশদাম শুকিয়ে শুকিয়ে এমন হয়েছে, যেন ক'দিন পর ঝরাপাতার মত ঝরে পড়বে।

এক দঙ্গল হাড়্ডিসার ছোট-বড় শিশু...দেহের মাত্রা ছাড়িয়ে সবারই পেট বেরিয়ে গেছে। তাদের দেহের অণুপরমাণুতে সব সময় এক অজানা ভয় এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। তাদের নিষ্পাপ চাউনিতে সব সময় এক নিষ্ঠুর নৃশংসতা ছায়াপাত করছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন রক্তপায়ী হায়েনার বিকট গ্রাসের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। বিশেষ এসব পিলেওয়ালা বাচ্চাদের দেখে কামিনীর বুকটা মায়ায় বিগলিত হয়ে এলো। বাচ্চাদের কাঁচা মুখগুলো টেনে এনে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছা করছিল তার।

অনাথাশ্রমের এক বিশেষ অংশে ক'জন জোয়ান সোমত্ত মেয়ে দেখতে পেল সে। তাদের কাপড়-চোপড় বেশ পরিপাটি। চেহারার মধ্যেও বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য। বিধ্বস্ত সমাধির কাছে সদ্য প্রস্ফুটিত বনফুলের মতো মনে হল তাদেরকে। বীণা, মালু, বাসন্তী রহিমন, ফরুজান, শ্যামলী-----এরা সবাই রয়েছে এ-দলে। এদের যৌবন-কুসুম ক্রমশ শুকিয়ে আসছে তিলে তিলে। ব্যর্থতার বাঁকে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে এই চার দেয়ালের গহ্বরে এসে আটকা পড়েছে এরা। নিষ্ঠুর নিয়তির তুলাদণ্ড তাদের জন্যে শ্রমের বিনিময়ে মাত্র চার ছটাক চাল বরাদ্দ করেছে। এই অনাথাশ্রম তাদের ভাগ্য মন্দিরের দ্বারকে খুলে দিয়েছে। সাদা ধুতি, সুগন্ধি সাবান, কাশতে কাশতে যে-সব হাড়্ক্লিষ্টদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়, তাদের ভাগ্য থেকে চুরি করা গ্লুকোজ ডি-র কৌটা, ভিটামিন বি-র শিশি, কড-লিভার অয়েল ইত্যাদি আর পেট বেরিয়ে যাওয়া শিশুদের মুখ থেকে ডাল দুধ ইত্যাদি কেড়ে এনে এ-সব ব্যর্থ যৌবনবতীদের দেয়া হয়। এমনকি সুপারিনটেনডেন্ট বাবুর চা-এর কৌটার চা এবং ডাক্তার বাবুর আলমারির পেছনের খণ্ড খণ্ড মিছরির চাকাও এসে জুটে তাদের কপালে। এভাবে অনাথাশ্রমের প্রকৃত পাওনাদারদের বঞ্চিত করে সব স্বাচ্ছন্দ্য তাদের জন্যে চুঁয়ে চুঁয়ে ঝরতে থাকে। শুধু কি তাই? অনাথাশ্রমের রাত্রিও তাদের জন্যে নিয়ে আসে এক অপূর্ব রোমাঞ্চ। এই অনধিকার রোমাঞ্চ অনেকটা কবরস্থানের পাশে বরযাত্রীদের কড়ানাড়ার আওয়াজের মত শোনায়। রাত প্রথম প্রহর গড়িয়ে যায় কাশতে কাশতে হাড়্ক্লিষ্ট বুড়োদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে চায়---রাতভর ধুকতে থাকে আর প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করে। ছোট ছোট শিশুরা স্বপ্নে মৃত মা-বাপদেরকে দেখে দেখে কেঁদে ওঠে।

ঠিক এমন সময়ই হয়ত সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের কামরায় নবাগতাদের ডাক পড়ে। কারণ রাত যতই হোক এখনই তাদেরকে ফরম পূরণ করতে হবে। এ-ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে তিনি বীণাকে ডেকে নেন। ওদিকে ডাক্তার বাবুও রাত দুপুরে আলমারিতে গ্লুকোজ এবং কুইনিনেরশিশি সাজাবার কাজে লেগে যান এবং এ-কাজে সাহায্য করার জন্যে ফরুজানকে ডেকে নেন। গোলজার হোসেনের গ্রায়ই একা ওটা ছিঁড়ে যায়। এ-সব সেলাই-এর ব্যাপারে বাসন্তি তাকে সাহায্য করে যখন তখন। ভুপেন বাবুর্চির বাসন-কোসন মাজার কাজে মালু হরহামেশা লেগে থাকে সেখানে। শেখু মোক্তার-এর জীর্ণ ঝাড়ুটা বার বার বেত দিয়ে কষে বেঁধে দিতে রহিমন ছাড়া আর কেউ পারে না। শ্যামলীর মনে হয় লঙ্গরখানাটা নিজের বাড়ী। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দিকে তার সজাগ দৃষ্টি। এমনকি রাতে গেটকিপার ঠিকমত পাহারা দেয় কিনা তা জানার জন্যে অর্ধেক রাত অবধি সে গেট কিপারকে দেখবার জন্যে যাতায়াত করে।

'কি ভাবছিস কামিনী ?' বীণা তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল 'বাবু, জিজ্ঞেস করছিল, খাতায় নাম দিয়েছিল ?' কামিনী সম্বিত ফিরে পেয়ে অনেকটা চমকে উঠল। পেছনে চশমা হাতে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব দাঁড়িয়ে।

'ঠিক আছে, নাম পরে রেজিস্ট্রি করা যাবে। বেচারীকে আগে খেতে দাও। যাও বীণা, ওকে নিয়ে লংগরখানায় যাও, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

গুলজার হোসেন একটু মুচকি হেসে একটা মেটে সানকি এবং পেয়ালা দিল তাকে। লঙ্গরখানায় ঢুকতেই কামিনীর মাথাটা ঘুরে গেল যেন। অনাথাশ্রমের সমুদয় বাসিন্দা তখন মাটির সানকির ওপর হুমড়ি খেয়ে কুকুরের মত চুকচুক করে খাবার খাচ্ছিল। পেটুক ছেলেপেলেগুলো মারামারি করছিল পরস্পরে। আর হাড়ক্লিষ্ট এক দঙ্গল বুড়ো, ক্ষুধার্ত কুকুরের মত ভুপেন বাবুর্চিকে নিয়ে পড়েছে। ভুপেন বাবুর্চি কোন মতে আত্মরক্ষা করে একটু সরে এসে কামিনীকে ইশারা করে বলল, এই দিকে এসো, হাঁ এদিকে।

বলেই নিজের কাঁধে রুমাল দিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গা ঝাড়তে লাগল সে।

চলতে চলতে কামিনীর পা শির শির করছিল। শরীরের বাঁকে বাঁকে ছোট ছোট সাপ কিলবিল করছিল যেন। চলতে চলতে দুই তিন বুড়োর সাথে তার ঢলাঢলি হয়ে গেল। ক'জন আবার ইচ্ছা করেও তার ওপর পড়ি-মরি করে নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ কামিনীর বেসামাল হাত লেগে এক বুড়োর হাতের পেয়ালা থেকে কি যেন গড়িয়ে পড়ল তার পায়। বুড়ো তার ভয়াল কুতকুতে চোখ দুটো পাকিয়ে বলল, 'এই মাগী তোর চোখে ছানি পড়েছে লো ? তোর বাবার ডালগুলো যে ফেলে দিলি এখন কি হবে ?'

কামিনী তাড়াতাড়ি ভুপেন বাবুচির কাছে যেয়ে হাঁফ ছাড়ল। বুড়োর জ্বল জ্বল চোখ দুটো তখনো লেহন করছিল তাকে। আস্ত গিলে ফেলবে যেন তাকে সে।

ভুপেন তাকে এক সানকি ভাত আর পেয়ালা ভর্তি ডাল দিল। উপোসী কামিনী তৃপ্তি ভরে খেল ভাতগুলো। খাওয়া শেষ হলে বাবুচি টুকরির নীচ থেকে এক পেয়ালা দুধ বের করে কামিনীর দিকে এগিয়ে দিল। 'নিয়ে যা, কেউ দেখে না যেন খাবার সময়।'

এরপর বাবুচি একটা গ্লুকোজের ডিব্বাও এগিয়ে দিল তার দিকে। বলল, 'বড় মিঠারে। কেউ দেখলে কিন্তু হৈ-চৈ পড়ে যাবে। একেবারে বিলেতি জিনিস।'

বলেই সে হাত মোছার ভান করে কামিনীর তলপেটে হাত ঘষতে লাগল। এমন সময় বীণা এসে উপস্থিত হল সেখানে। তার লুকানো জিনিসগুলোর দিকে ইশারা করে বলল,

'হুঁ, কেউ দেখে না যেন। দেখলে কাউ-মাউ করবে। এই যমপুরীতে কেউ কারো খাবার দেখতে পারে না।' বলেই সে লঙ্গরখানার দঙ্গলদের দিকে হাত দিয়ে দেখাল।

কিন্তু ছোট বাচ্চাগুলো কেমন করে টের পেয়ে গেল। কামিনী পা বাড়াতেই তাকে ঘিরে ধরল এবং 'দুধ দুধ' বলে চিৎকার করে উঠল। ছেলেদের পাল্লায় পড়ে কামিনী বেদিশা হয়ে পড়ল। এমন সময় এক ঘাগু বুড়ো এসে তার হাতের দুধের পেয়ালা কেড়ে নিল এবং কারো তোয়াক্কা না করে ঢক ঢক করে একটানে গিলে ফেলল দুধগুলো। আর যায় কোথায়, সব মক্কেলরা নিয়ে পড়লো তাকে। বুড়োর হাড়ের ওপর চলতে লাগল চড় চাপড় আর গালাগালি।

'এই হারামী।' ভুপেন চিৎকার করে উঠল। গুলজার হোসেন নিয়ে এল লাঠি, সেখু মোক্তার নিয়ে এল তার ঝাড়ু আর সুপারিন-টেনডেন্ট নিজে চড় চাপড় এবং লাথি দিতে লাগলেন।

'হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা, বেতমিজ------'

সুপারের মুখে গালির তুবড়ি ছুটতে লাগল। সুপার তার জিদ পানি করে একটু আড়ালে এসে কামিনীর কোমরে হাত দিয়ে সান্ত্-নার সুরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আবার দুধ দিতে বলে দোব। বীণা, ওকে নিয়ে একবার আমার কামরায় আয়। ওর ফরমও তো পূরণ করা হয়নি এখনো।'

বলেই সুপার একটু মুচকি হাসলেন। বীণাও হাসল। ওদের হাসি দেখে চারদিকের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কামিনীর মনে হল ওরা দু'জনই একটুও দ্বিধা না করে নেংটা হয়ে গেল কামিনির সামনে।

রাত গভীর হয়ে এল ডাক্তারের আলমারিতে শিশি সাজাবার কাজে ফরজানের দরকার হয়ে পড়ল, গুলজার হোসেনের জামায় বুতাম লাগিয়ে দেবার জন্য বাসন্তীর ডাক পড়ল আর নুতন ফরম পূরণ কর-বার জন্যে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এপাশ ওপাশ করছিলেন এমন সময় কামিনী অতি সন্তর্পণে অনাথাশ্রম-এর চারদেয়ালের বাঁধ অতি-ক্রম করে সোজা গাঁয়ের দিকে পা চালিয়ে দিল। লঙ্গরখানার দিকে একবার তাকিয়ে তার মনে হল একটা বিরাট ভুতের বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল সে। কতগুলো অশরীরীভূত তাদের লিকলিকে হাত তার কাঁধে বগলে সাপটে ধরে কাতুকুতু দিচ্ছে। ঘন ঘন পা চালায়ে মুক্ত প্রান্তরের মাঝে এসে গেল সে। এবার তার গা টা হালকা হলো অনেকটা। ছি----মানুষে যেখানে আশ্রয় নিতে যায়, সেখানে এই বিড়ম্বনা! যতোসব শয়তানের আড্ডা। এসব ভাবছিল আর মন্থর গতিতে চলছিল। হঠাৎ একটা কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ি-মরি করে দাঁড়িয়ে গেল সে।

'চোখের মাথা খেয়েছ, যত্তোসব...'একটা লোক গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

'কে তুমি?' লোকটি আবার গর্জন করে উঠল। কামিনী ভীত কণ্ঠে জবাব দিল 'আমি।'

কণ্ঠ শুনে লোকটি চমকে উঠল। আরে এ-যে মেয়ে মানুষ। তার সাথে অন্যান্যরাও সচকিত হয়ে উঠল। একটু কানাকানি করে বলল 'মাইয়া মানুষ।' প্রথমজন কামিনীর নাকে মুখে হাত বুলিয়ে নিয়ে বিশ্বাসটা আরো গাঢ় করে নিল।

'ঠিক আছে সায়েবের তাঁবুতে নিয়ে যাও। শালা সাহেবটা সেই সন্ধ্যা থেকে হা করে বসে আছে।' সাহেবকে একটা শক্ত গালি দিয়ে অন্য একজন বলল।

ভোরের আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে আবার স্বস্তির শ্বাস টানল কামিনী। ঊষার রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে গাছ-গাছালীর পাতায় পাতায়। কামিনী ঘন ঘন পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। জীবনের যাত্রাপথে পদে পদে পা পিছলে যাবার ভয়, বাঁকে বাঁকে সাদা কালো নেংটা ভগবানদের দর্শন মেলে। অসহায় পথিকদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবার জন্যে ভগবানদের হস্ত সর্বদা সচকিত। লজ্জায় ঘৃণায় কামিনীর সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। সমগ্র বিশ্বের একটা চরম বিতৃষ্ণায় কামিনীর মনটা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল।

প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে ভোরের তাজা সূর্যরশ্মিতে অবগাহন করে একটি ব্যথাতুর দেহপল্লব এগিয়ে চলেছে। কাঁধের লাল কম্বলটি চিতার অনলের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিল তার দেহ জুড়ে। বিস্কুটের প্যাকেটটা আরো ভালোভাবে বগলদাবা করে আলতোভাবে পেছনের দিকে, আর একবার দেখে নিয়ে আরো হনহন করে চলতে লাগল কামিনী।

পথে রুক্মিণী যখন তাকে ফিরে আসতে দেখল তখন একটু টিপ্পনী কেটে বলল,

'এলে তো আবার ফিরে। বলেছিলাম না কাগজ নিয়ে যাও ঠাকুরের কাছ থেকে।'

কিন্তু তার লাল কম্বল আর বগলদাবানো বিস্কুটের প্যাকেট দেখে রুক্মিনী একেবারে দমে গেল। সে মুখে হাত রেখে বলল, 'হায় কামী তুইও তো কম বজ্জাত না। আমার সাথে চালাকী---যাদের ইজ্জত আছে, লঙ্গরখানায় তাদের দম আটকে আসে জানিস। চারদিকে লঙ্গরখানার টি-টি-----আমি ভাই ওসবে নেই----আমি লুথার সাহেবের কাছে চললাম, যাবি?

দৈনিক পাকিস্তান, আগস্ট ১৯৪৮ ইং

খালি বোতল

সা'দত হাসান মাণ্টো

যে সব লোকদের স্ত্রী নেই, খালি বোতল এবং খালি কৌটার প্রতি তাদের এত আগ্রহ কেন ? বরাবর আমার মনে এ জিনিসটা বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। স্ত্রী নেই মানে, সাধারণত যেসব লোকের বিয়ে শাদীতে মোটেই আসক্তি নেই।

যদিও এ শ্রেণীর লোক প্রায়ই বিদঘুটে চরিত্রের হয়ে থাকে, কিন্তু একথা কিছুতেই আমি বুঝতে পারিনে, খালি বোতল এবং কৌটায় তাদের অনুরাগ থাকবে কেন ? পশু-পাখী পোষার অভ্যেস এদের থাকে সেকথা মানি। আর এটা বেশ বুঝতেও পারি যে, তা দিয়ে তাদের নিঃসঙ্গতা দূর হয়। কিন্তু খালি বোতল আর খালি কৌটা তাদের নিঃসঙ্গতার সাথী—একি কথা।

অবশ্য এসব বিদঘুটে স্বভাবের কারণ অনুসন্ধান করা তেমন কষ্টের কাজ নয়, কারণ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হবার দরুন এদের চরিত্রের বিকার ঘটে। তবে এশ্রেণীর লোকের মনের গভীর তলদেশে উপনীত হওয়া অবশ্য কষ্টকর।

আমার এক বন্ধু আছেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। তার কবুতর এবং কুকুর প্রোষার শখ। আর এতে আশ্চর্যেরও তেমন কিছু নেই। কিন্তু তাঁর একটা রোগ আছে। রোজ বাজার থেকে খাঁটি দুধ কিনে আনেন এবং উনোন জ্বালিয়ে দিয়ে ঘি তৈরি করে নিজের জন্যে বিশেষভাবে তরকারি পাক করেন। কারণ, তাঁর মতে একমাত্র এ পদ্ধতিতেই খাঁটি ঘি পাওয়া যেতে পারে।

আর তাঁর পানীয় জলের ঘড়াটিও বড় সযত্নে রাখেন। ঘড়ার মুখে মলমলের এক টুকরো কাপড় বাঁধা থাকে, যাতে করে কোন পোকা-মাকড় না পড়তে পারে, অথচ বাতাস সারাক্ষণ চলাচল করে। পায়খানায় যাবার সময় সব কাপড়-চোপড় খুলে শুধু একটা ছোট

তোয়ালে পরে এক জোড়া কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে রওনা হন। এখন বলুনতো, কে তাঁর খাঁটি ঘি, ঘড়ার মলমল, নগ্নতার তোয়ালে আর কাঠের খড়মের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে বসে?

আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁরও বিয়ে হয়নি। প্রকাশ্যে খুবই স্বাভাবিক লোক। হাইকোর্টের রিডার। তিনি সারাক্ষণ সব দিক থেকে দুর্গন্ধ পান। ফলে, সারাক্ষণ তাঁর নাকে রুমাল এঁটে রাখতে হয়। ভদ্রলোকের আবার খরগোশ পোষার শখ।

আরেকজন আছেন। তিনি যখনই অবসর পান নামাজ পড়া শুরু করে দেন। অথচ তাঁর মাথা বিলকুল সুস্থ। বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তোতা পাখীকে কথা শেখানোর কাজেও বিশেষ ওস্তাদী রাখেন তিনি।

মিলিটারীর এক মেজর আছেন। বয়স্ক এবং ধনী মানুষ। রাজ্যের হুঁকো জমা করার বড় শখ তাঁর। গড়গড়া পেচী---চামুড়া। মোটকথা, সব রকম হুঁকো তাঁর কাছে মওজুদ আছে। অনেক বাড়ীর মালিক তিনি। অথচ হোটেলে রুম ভাড়া করে থাকেন। বিড়ি তাঁর বড় প্রিয়।

আর আছেন এক কর্ণেল সাহেব। রিটায়ার্ড, মস্ত বড় বাড়ীতে দশ বারটা কুকুর নিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে সব ব্রাণ্ডের হুইস্কি পাওয়া যায়। প্রতি সন্ধ্যায় চার পেগ করে খান। এবং তাঁর সাথী কোন না কোন প্রিয় কুকুরকে তা খাওয়ান।

আমি যে ক'জনের কথা এযাবত বললাম---সবারই যথাসামর্থ্য খালী বোতল আর খালি কৌটা জমা করার শখ। যে বন্ধুটি দুধ জ্বাল দিয়ে খাঁটি ঘি তৈরি করেন, ঘরে খালি বোতল একটা দেখলেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন, হাইকোর্টের রিডার---যিনি সব সময় সব দিক থেকে দুর্গন্ধ পান, তিনি এমন সব খালি বোতল আর খালি কৌটা সংগ্রহ করেন, যেগুলো সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হন যে, আর এগুলো থেকে দুর্গন্ধ আসার সম্ভাবনা নেই। অবসর পেলেই যিনি নামাজ পড়েন, হাত মুখ ধোবার জন্যে খালি বোতল, আর অজু করার টিনের খালি কৌটা ডজন ডজন জমা করে রাখেন। তাঁর মতে পাত্র হিসেবে এ উভয় বস্তুই পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। হরেক রকম হুঁকো সংগ্রহকারী মেজর সাহেব খালি বোতল আর কৌটা জমা করে বিক্রি করতে ভালবাসেন। আর রিটায়ার্ড কর্ণেল সাবের শুধু হুইস্কির খালি বোতল আর কৌটা জমা করার শখ।

আপনি কর্ণেল সাহেবের কাছে গেলে দেখবেন সাজানো গোছানো কামরাটিতে তাঁর গোটা কয় কাঁচের আলমারিতে শুধু হুইস্কির খালি বোতল। বহু পুরনো ব্রাণ্ডের হুইস্কির খালি বোতলও তাঁর এই অনুপম সংগ্রহে খুঁজে পাবেন আপনি। কোন কোন লোকের ডাকটিকেট জমা করার শখ যেমন একেবারে মজ্জাগত---এটাও তেমনি। কর্ণেল সাহেবের কোন নিকটতম আত্মীয়-স্বজন নেই। আর থাকলেও আমার জানা নেই। পৃথিবীতে একান্তই একা। বাড়ীতে দশ বারটা কুকুর রয়েছে। এসবের দেখাশোনা তিনি স্নেহময় পিতার মতো করে থাকেন। সারাটা দিনই তাঁর এদের সাথে কাটে। অবশ্য অবসর পেলেই আলমারির প্রিয় বোতলগুলোকে পরিষ্কার করেন।

আপনি বলবেন, খালি বোতলতো হলো---তুমি খালি কৌটা কেন এর সাথে জুড়ে দিলে? আর কৌটা এবং বোতল খালিই বা কেন? ভরা নয় কেন?

আমি আপনার কাছে পয়লাতেই নিবেদন করেছি যে, আমি নিজেও এব্যাপারে বিস্মিত। শুধু তাই নয়। এমন আরো অনেক প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, খুব মাথা ঘামানো ছাড়া সে সবের উত্তর মেলেনা।

খালি বোতল এবং খালি কৌটা শূন্যতার প্রতীক। এবং শূন্যতার বিশ্লেষণ লজিক মাফিক এই শ্রেণীর লোকের বেলায় এই দাঁড়ায় যে, সাদা চোখে এদের জীবনটাই একটা বিরাট শূন্যতা। কিন্তু আবার প্রশ্ন দাঁড়ায় তা'লে তাঁরা এই শূন্যতাকে অন্য শূন্যতা দিয়ে কি পূরণ করেন? কুকুর, বেড়াল, খরগোশ এবং বাঁদর সম্পর্কে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, এরা নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকটা অভাব পূরণ করে। এরা মন ভুলোতে পারে, ন্যাকামী করতে পারে, নানা রকম আওয়াজ করতে পারে এবং আদরের স্বীকৃতি দিতে পারে। কিন্তু খালি বোতল এবং কৌটা কী ছাই করতে পারে?

নিম্নে প্রদত্ত কাহিনী থেকে আপনি যথাসম্ভব এসবের উত্তর হয়ত পেয়ে যাবেন।

দশ বছর আগে আমি যখন প্রথম বোম্বেতে আসি, এক বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানীর একটা ছবি প্রায় বিশ হপ্তা ধরে চলছিল। নায়িকা পুরনো। কিন্তু নায়কের মুখ নতুন। বিজ্ঞাপনের কাগজে তাঁর বিশেষ ভঙ্গি অভিনব হয়ে ফুটে উঠেছে। খবরের কাগজে এঁর অভিনয়ের প্রশংসা পড়ে আমি ছবিটা দেখলাম। আঙ্গিক বড় সুন্দর। কাহিনীও

চিত্তাকর্ষক কম নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই নতুন নায়ক এ-ই সর্বপ্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন।

পর্দায় কোন নায়ক-নায়িকার বয়স অনুমান করা প্রায়শই মুস্কিল। কারণ, মেক আপ যুবককে বুড়ো আর বুড়োকে যুবক বানিয়ে দেয়। কিন্তু এই নতুন নায়ক নিঃসন্দেহে তরুণ। কলেজের ছাত্রের মতো সজীব সতেজ এবং সচকিত। খুব সুন্দর নয়, কিন্তু তার সুগঠিত দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ খুবই মানানসই ভাবে সংস্থাপিত। চেহারার কিশোরসুলভ মসৃণতা সবেমাত্র বয়স এবং অভিজ্ঞতায় রূপান্তর লাভ করেছে। অবশ্য সে নায়কটির আজ শীর্ষ মহলে আনাগোনা।

ফিল্মজগতে স্ক্যাণ্ডেল চলে দেদার। রোজ শোনা যায় অমুক অভিনেতা অমুক অভিনেত্রীর সাথে ভাব করছে। অমুক অভিনেত্রী তমুক অভিনেতাকে ছেড়ে দিয়ে ডিরেক্টরের বাহুবন্ধনে চলে গেছে। প্রায়ই, সব অভিনেতা সব অভিনেত্রীর বিলম্বে বা অবিলম্বে মধু বন্ধনে আবিষ্ট হয়ে যায়ই। কিন্তু এই নতুন নায়ক, মানে আমি যার কথা বলছি---এই আবেষ্টনীর দূরে থাকতো। তাই পত্রিকাদিতেও তাকে নিয়ে বিশেষ চর্চা ছিল না। কেউ ভুলে একটু বিস্ময়ও প্রকাশ করেনি যে, ছবির জগতে বাস করেও রামস্বরূপের জীবন মানবিক আবেদনমুক্ত। সত্যি বলতে কি, আমিও এ বিষয় কখনো ভেবে দেখিনি। কারণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পূত-জীবন সম্পর্কে আমার তেমন ঔৎসুক্য ছিলনা। ছবি দেখি এবং সে সম্পর্কে ভাল-মন্দ মন্তব্য উপস্থাপন করি---তারপর ব্যস! কিন্তু রামস্বরূপের সাথে আমার যখন সাক্ষাৎ হয়, তার বিচিত্র স্বরূপ দেখা দিল আমার সামনে। এই সাক্ষাৎকার সম্ভবত তার সেই ছবি দেখার বছর আটেক পরে হয়।

গোড়ার দিকে বোম্বে ছেড়ে সে অনেক দূরে এক গাঁয়ে থাকতো। কিন্তু ছবির কর্মব্যস্ততার কারণে সে সমুদ্রের কিনারায় শিবাজী পার্কে মাঝারি ধরনের এক ফ্লাট নিলো। এবং সেই ফ্লাটেই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ। বাবুর্চিখানা সমেত সে ফ্লাটের চারটা কামরা।

এই ফ্লাটের আটজন বাসিন্দা। স্বয়ং রামস্বরূপ---তার চাকর, যে তার বাবুর্চিও বটে---তিনটা কুকুর, দুটা বানর এবং একটা বিড়াল।

এই আধ ডজন জন্তুর প্রতি রামস্বরূপের অগাধ ভালবাসা। চাকরের সাথেও তার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। অবশ্য তা একান্তই অনাবেগ-প্রসূত বাঁধা ধরা কাজ। সময় মতো যথানিয়মে যন্ত্রচালিতের মতো সব

কাজ চলে। মনে হয় রামস্বরূপ চাকরকে তার জীবনের সব কর্মসূচী এক কাগজে লিখে দিয়েছে একদিন। আর চাকরটা তা বেমালুম মুখস্থ করে নিয়েছে।

রামস্বরূপ যদি পোশাক ছেড়ে এক চিলতে ন্যাকড়া পরে নেয়, চাকর তক্ষুণি তিনচার বোতল সোডা এবং বরফ সামনে রেখে দেয়। এর মানে, সাহেব এখন 'রম' পান করে কুকুরদের সাথে খেলা করবেন। এবং এসময় কারো টেলিফোন এলে বলতে হবে সাহেব বাসায় নেই।

'রম'-এর বোতল এবং সিগারেটের কৌটা যখন খালি হবে তখন তা বিক্রি বা ফেলে দেয়া হবে না। বরং সযত্নে তুলে রাখা হবে---যেখানে খালি বোতল এবং কৌটার স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে।

কোন মেয়ে এলেই তাকে দরজা থেকেই একথা বলে ফিরিয়ে দেয়া হবে যে, সাব রাত জেগে সুটিং করেছেন এখন ঘুমিয়ে আছেন। সাক্ষাৎ-কারিণী রাত্রে অথবা সন্ধ্যায় এলে বলা হবে সাহেব সুটিং-এ আছেন।

রামস্বরূপের বাড়ী প্রায়ই তেমন, যেমন হয়ে থাকে অবিবাহিত লোকদের বাড়ী। তেমন ব্যবস্থা এবং উপকরণ ছিলনা যাতে মেয়েদের স্পর্শের প্রয়োজন হয়। সব কিছু পরিষ্কার। কিন্তু তারই মধ্যে কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে আগোছালো ভাব। প্রথম বারে আমি যখন তার ফ্লাটে যাই---তীব্র ভাবে অনুভব করেছিলাম যেন আমি চিড়িয়াখানার বাঘ এবং চিতা রাখার ঘরগুলোতে এসেছি। কারণ, সে রকমই গন্ধ আসছিল। এক ঘর শোবার---দ্বিতীয়টি বসবার। আর তৃতীয়টিতে রামস্বরূপ কর্তৃক নিঃশেষিত রামের খালি বোতল এবং সিগারেটের কৌটার স্তূপ। কোন রকম নিয়ম-শৃংখলা ছিল না। কৌটার উপর বোতল এবং বোতলের উপর কৌটা উল্টো সোজা পড়ে আছে। হয়ত এক কোণায় সাজানো কিন্তু অন্যদিকে এলোমেলো স্তূপ। আবর্জনাও সমান ভাবে জমা। বাসী তামাক এবং বাসী রমের সম্মিলিত তীব্র দুর্গন্ধ।

আমি সর্বপ্রথম এ কামরা দেখেতো রীতিমত হতবাক্। অসংখ্য বোতল আর কৌটা---সবি খালি। আমি রামস্বরূপকে জিজ্ঞেস করলাম,

'এসব কি করেছো ?'

'কী করেছি ?'

'এই খালি বোতল আর কৌটার আবর্জনা।'

'জমে গেছে আরকি।'

সে শুধু এই বলল।

শুনে বললাম, 'তাই বলে এত?' আর ভাবলাম, এত আবর্জনা জমা হতে কমপক্ষে সাত আট বছর তো লাগে।

কিন্তু পরে যখন জানলাম, এই সঞ্চয়, পুরা দশ বছরের, তখন বুঝলাম, আমার অনুমান ভুল। যখন সে শিবাজী পার্কে এসেছে, পুরনো বাড়ী থেকে তার সব খালি বোতল আর কৌটা নিয়ে এসেছে। আমি একবার বললাম, 'স্বরূপ, এসব কৌটা বোতল বিক্রি কেন কচ্ছ না তুমি? আমি বলি, পয়লা থেকেই বিক্রি করে আসা উচিত ছিল। আর এখনতো প্রচুর জমা হয়েছে। যুদ্ধের দরুন পয়সাও বেশ হতে পারে। আমার মতে তোমার এ আবর্জনা বিদায় করা উচিত।'

শুনে সে শুধু বলল,

'রাখ ইয়ার, এ নিয়ে আবার কে মাথা ঘামায়?'

এ জবাবে বোঝা যায় এ বিষয় সে নির্লিপ্ত। কিন্তু চাকরের কাছ থেকে জানলাম, এই কামরার কৌটা বা বোতল এ দিক ওদিক হলে রামস্বরূপ সেদিন কেয়ামত ঘটিয়ে দেয়।

মেয়েদের প্রতি তার কোন আসক্তি ছিলনা। আমাদের মধ্যে বেশ মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, তাই কথায় কথায় তাকে অনেক-বার বলেছি, 'কী ভাই, বিয়ে থা করবে না।'

'বিয়ে করে কি করবো?'

প্রত্যেক বারই এরকম জবাব পেতাম। আমি ভাবতাম, আসলে রামস্বরূপ বিয়ে করে কী করবে? বিয়ে করে স্ত্রীকে খালি বোতল আর খালি কৌটার কামরায় বন্ধ করে রাখবে, না সব কাপড় চোপড় খুলে ন্যাকড়া পরে রম পান করে তার সাথে খেলা করবে? আমি বিয়ে শাদীর কথা প্রায়ই পাড়তাম। অনেক ভেবে দেখিছি, কোন মেয়ের প্রতি তার সামান্যতম আসক্তিও আছে বলে মনে হয় নি।

রামস্বরূপের সাথে চলাফেরার পর কয়েক বছর গত হয়েছে। এরি মধ্যে হঠাৎ একদিন উড়ো খবর শুনতে পেলাম, এক অভিনেত্রীর সাথে তার প্রেম হয়ে গেছে---যার নাম শীলা। আমি এ গুজবটাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। প্রথমত, রামস্বরূপের দ্বারা একাজ হতেই পারে না। আর দ্বিতীয়ত, শীলার মতো মেয়ের সাথে কোন সুস্থ-মস্তিষ্কের লোক প্রেম করতে পারেনা। কারণ, ও এমন নিষ্প্রাণ যে,

যেনো আস্ত একটা যক্ষ্মা রোগী মনে হয়, প্রথম প্রথম যখন সে দু' একটা বইতে নামল তখন কিছুটা চটকদার ছিল বৈকি। কিন্তু তারপর একেবারে প্রাণহীন পাণ্ডুর হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সে তৃতীয় শ্রেণীর ছবির নায়িকা হিসেবে পরিগণিত।

আমি শুধু একবার শীলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় রামস্বরূপ বলল, 'আমার জন্যে কি অবশেষে এ-ই রয়ে গিয়েছিল ?'

এ সময় তার সবচেয়ে প্রিয় কুকুর স্টালিন নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। রামস্বরূপ প্রাণপণে চিকিৎসা করাল, কিন্তু কুকুরটি বাঁচলো না। কুকুরের মৃত্যুতে তার খুব শোক হলো। আনেকদিন পর্যন্ত তার চোখ লাল হয়ে ছিল। তারপর যখন শুনলাম, একদিন তার বাকী কুকুরগুলোও এক বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছে, আমি ভাবলাম, স্বরূপ স্ট্যালিনের মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারে নি। নইলে এদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া, এতো একটা সাধারণ কথা নয়। কিন্তু তার ক'দিন পর সে যখন বাদরগুলোকেও নিষ্কৃতি দিল, আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম। আমি ভাবলাম, ওর মন হয়ত এখন আর কারো মৃত্যুশোক সহ্য করতে চায় না। এখন সে ন্যাকড়া পরে রম পান করে শুধু। তার বেড়াল নার্গিসের সাথে খেলা করে আর বিড়ালটিও আদরের স্বীকৃতি দেয়। মোট কথা, এখন তার বেড়াল নিয়েই দিন কাটে।

তার ঘর থেকে এখন আর বাঘ চিতার গন্ধ আসেনা। পরিচ্ছন্নতা এবং অনেকটা চোখে পড়বার মতো উপাদান ঘরে রাখা হয়েছে। তার চেহারাতেও একটু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সব কিছু এত ধীরে ধীরে হয়েছে যে, টের পাওয়া যায়নি।

দিন চলে গেল। রামস্বরূপের নতুন ছবি রিলিজ হলো। আমি তার এবারের অভিনয়ের এক নতুন প্রাণ দেখতে পেলাম। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। সে মুচকি হেসে বলল, 'নাও, হুইস্কি খাও।'

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হুইস্কি ?'

কারণ ও শুধু রমই খেতো।

প্রথম মুচকি হাসিটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী করে বলল, 'রম খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।'

আমি আর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

অষ্টম দিনের সন্ধ্যায় আমি যখন তার সেখানে গেলাম তখন সে কামিজ পাজামা পরে রম নয় হুইস্কি খাচ্ছিল। অনেকক্ষণ আমরা

তাস পিটলাম এবং হুইস্কি খেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, গলাধঃ-করণ, স্বাদ এবং চোখমুখের চেহারায় যেন সামঞ্জস্য নেই।

তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম,

'কী, হুইস্কিতে মুড় আসেনা ?'

'আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।' মুচকি হেসে বলল,

রামস্বরূপের ফ্লাট ছিল দোতালায়। একদিন সে পথে যেতে যেতে দেখলাম নিচে গ্যারেজের কাছে খালি বোতল এবং কৌটার স্তূপ পড়ে আছে। সড়কে দুটো ছ্যাকরা গাড়ী দাঁড়িয়ে দু'তিনজন মিলে সেগুলো সেই গাড়ীতে উঠাচ্ছে। আমার বিস্ময়ের আর পরি-সীমা ছিলনা। কারণ, এ অসীম সঞ্চয় একমাত্র রামস্বরূপ ছাড়া আর কারো নয়। আপনি বিশ্বাস করুন, এগুলোকে এভাবে বিদেয় করে দেবার দৃশ্য দেখে আমি মনে খুব আঘাত পেলাম। দৌড়ে উপরে উঠলাম। বেল টিপলাম। দরজা খুলল। আমি ভেতরে ঢুকতে চাইলে চাকর স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে দরজা রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাব' রাতভর সুটিং করে এখন শুয়ে আছেন।'

আমি বিস্ময় এবং রাগে গরগর করে নিচে নেমে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় রামস্বরূপ আমার বাসায় এলো। তার সাথে শীলা। নতুন বেনারসী শাড়ী পরিহিতা, রামস্বরূপ তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বলল,

'আমার ধর্মপত্নীর সাথে হাত মেলাও।'

যদি আমাকে হুইস্কির নেশায় না ধরতো, তাহলে একথা শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়তাম।

রামস্বরূপ এবং শীলা কিছুক্ষণ বসে আলাপ করে চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম, বেনারসীতে শীলাকে কেমন দেখাচ্ছে ? হালকা পাতলা দেহে বাদামী রঙের কাগজের মতো শাড়ী---জায়গায় জায়গায় জরীর ফুল। হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা খালি বোতল এসে দাঁড়াল। পাতলা কাগজে মোড়ানো।

শীলা মেয়ে। বিলকুল খালি ছিল। হয়ত এক শূন্যতা অন্য শূন্যতাকে পূরণ করে দিয়েছে।

রবীন্দ্র সিংহ

ইউয়াং এই নিয়ে বাইশ বার পকেট থেকে চিঠিটা বের করল। এবং বড় মোলায়েম করে চিঠির শীর্ণ লাইনগুলোতে হাত বুলাতে লাগল। তার ভাই ইউসার চিঠি---যে ভাই শৈশবেই তার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তারপর আজ পনর বছর পর তার সাথে প্রথম দেখা করতে আসছে। ইউয়াং লেখা পড়া জানে না। চিঠিটা সে পিয়নকে দিয়ে পড়িয়েছে। সেই থেকে ভাইয়ের কোমল কান্তি ও তার চেহারা চোখে চোখে ভাসছে। ছোট নাক, উজ্জ্বল রং, সোনালী চুল— এখন তো সে জোয়ান হয়ে গেছে। কিন্তু ইউয়াং ভাইকে নিয়ে সেই শৈশব ছাড়া আর এগোতে পারে না। তার কাছে সে যেন এখনো সেই ছোটটি। ফুলের মতো কমনীয়। তাকে সে কত কোলে কাঁখে করে ফিরেছে।

ইউসা যেদিন বিদায় নেয়, কমবেশী তিন বছরের তখন সে। তাদের বাপ-মা এক দুর্ঘটনায় মারা পড়েছিলো। সে সময় চাচা ইউয়াংকে আশ্রয় দিয়েছিলো। সেই থেকে সেখানেই সে বাস করছে। বড় হয়ে এখন চাচার চাষবাস করছে। আর কোন উপায়ান্তর না দেখে ইউসাকে মামার সাথে সুদূর রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেখানে লেখাপড়া শিখে কোন অফিসে কাজ করছে এখন। আর এ-ই প্রথম বার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসছে।

ইউয়াং-এর মন খুশিতে উছলে পড়ছে। কাজে মন লাগছে না। সে বার বার ক্ষেতের কিনারের গাছের ছায়ায় এসে চিঠিটা খুলে বসে। কালও যে কালো অক্ষরগুলোকে মূর্দা মনে হয়েছিল, আজ যেন জীবন্ত ভাস্বর হয়ে উঠেছে সেই কালো অক্ষরগুলো। কথা বলছে যেন অক্ষরগুলো। আর সেই সাথে ইউসার উজ্জ্বল মুখচ্ছবি ফুটে উঠছে।

"---আর আমি আসছি। আমি ব্যক্ত করতে পারছি না ভাইয়া, কত গভীর আগ্রহ তোমার সাথে দেখা করবার আমার। আমি পুরা মাস তোমার সাথে কাটাব। আমি তোমাকে রেঙ্গুন নিয়ে আসবো।"

সে গাছের গুঁড়িটাকে হাত বুলোয় আর পিয়নের পঠিত কথা-গুলো কানে বাজতে থাকে তার।

চিঠিটাকে বুকে চেপে ধরল। স্নেহের একটা মধুর আমেজ তার মনকে ভরিয়ে দিল। চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। সে উঠে দাঁড়ালো, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ যে কৃষক সারাক্ষণ মুখ বুঁজে থাকে এবং ক্ষেতে ছয় জনের সমান কাজ একা করে, আজ আবেগবিহ্বল হয়ে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। সে চিৎকার করে জগৎকে জানিয়ে দিতে চায় তার অপূর্ব খুশির খবর। কাউকে বাহুর নীচে ধরে আলিঙ্গন করতে চায়।

ইউয়াং গাছের গুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরল।

পড়ন্ত বেলায় ইউয়াং-এর গাঁয়ে ফিরে আসবার সময়। গোধূলি রক্তরাগ মেলে ধরে। ছেলেদের হৈ হল্লোর আর কুকুরের ঘেঁউ ঘেঁউ শোনা যায়। ইউয়াং-এর এসব ভাল লাগে না। সে তাই অনেক রাতে গাঁয়ে ফেরে, যখন চারদিক নীরবতা ছেয়ে যায়। কিন্তু আজকে তার কাছে এ মুখরতা খারাপ লাগল না। যেন সেও চিৎকার করতে চায়।

সরাই-এর কাছে পেঁৗছে সে একটু দাঁড়াল। লী কে খবরটা বলে গেলে কেমন হয়? লীর সাথে কথা বলতে সে স্বতঃই সংকুচিত হয়ে পড়ে। তবু সে নিজেকে সামলাতে পারলো না।

লী শুনে শুধু একটু হাসল। কিন্তু আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না, সে তার ভালবাসা ইউয়াংকে দান করেছে---যে গাঁয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কর্মঠ যুবক। লী পরম ধৈর্য সহকারে মায়ের সন্তান প্রসবের দিন গুনছে। তারপর তার বাবা ইউয়াং-এর সাথে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলবে। তার বাবা ইউয়াং-এর মতো কর্মঠ জামাই হারাবার ভয়ে দ্বাদশ সন্তান প্রসব অবধি শর্তটি লটকে রাখবেন না।

---'তুমি তার সাথে দেখা করে বরং খুশিই হবে। নীল চোখ, বাদামী রং---কিন্তু এখন বড় হয়ে গেছে', বলে ইউয়াং বাচাল ছেলের মত হেসে উঠল।

মুহূর্তের জন্য লীর চোখ স্বপ্নালু হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইউয়াং-এর বাহুবেষ্টনে চলে এল এবং মায়াবী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ইউয়াং-এর উৎসাহ মিইয়ে এলো। তার আনন্দে কেউ অংশ নিল না। ---বাড়ীতে এসে সে চাচাকে চিঠিসহ খবরটা দিয়ে খাবার সানকি নিয়ে খেতে বসে গেল।

পরের দিন ইউসা এল। আমেরিকান কেতার পোশাক-আশাক আর কাল চশমা পরা বেশভূষা দেখে ইউয়াং-এর আমেরিকান সেপাইদের কথা মনে পড়ে গেল, যারা যুদ্ধের সময় বর্মায় এসে ঘাঁটি করেছিল। তার মনে সেই সুদূর স্মৃতি জেগে উঠল। ব্যথা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মন। সে ব্যথা আরো তীব্র হলো যখন সে ভাইয়ের ব্যবহারে চিঠির মতো আবেগ খুঁজে পেলনা। ইউসা মিষ্টি করে হাসল। কিন্তু সহজ এবং অকৃত্রিম হলো না। ইউসা হাত বাড়াল। ইউয়াং চায় তার সাথে মিশে যেতে, চায় তাকে গভীর আবেশে কোলে তুলে নিতে। কিন্তু কেন জানি ইউসা এবং তার মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান মনে হলো। সে ইউসার হাতে হাত মিলাল এবং বেশ অনেকক্ষণ স্নেহসিক্ত ছলছল দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ইউসার মসৃণ নরম হাত যেন নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইউয়াং হেসে উঠে হাত ছেড়ে দিলে।

এরপর ইউয়াং নিজের কাজে লেগে গেল। তার চাচা বুড়ো হয়ে গেছে। রোগে ধরেছে। তাই ইউয়াংকে একাই ক্ষেত খামার সামলাতে হয়। ওদিকে ইউসা সারাদিন গাঁয়ে ঘোরাফিরা করে। পথে ঘাটে হাঁটে, থেকে থেকে শিস দেয়। মেয়েদের টিপ্পনি কাটে। পড়শীদের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কফিখানায় জুয়া খেলে। খারাপ ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে। ইতিমধ্যে একদিন ঝগড়া এবং হাতাহাতিও হয়ে গেল। ইউয়াং-এর এ সব ভাল লাগে না। তবু সে চুপচাপ থাকে। ছোট ভাইকে শুধু বোঝায়, সামান্য একটু রাগও করে। কিন্তু যখন সে ক্ষেতে এসে একাকী হয় ভাইয়ের স্নেহমমতায় একেবারে গলে যায়। সে মনে মনে ইউসার মাথার চুলে আংগুল চালায়, দুধ-শুভ্র ললাটে চুমু খায় আর নীল চোখের জ্যোতিতে মুগ্ধ হয়। বাড়ী গিয়ে তার জন্য ভাল বিছানা বিছিয়ে দেয়। সাধ্যানুযায়ী ভাল খাবারের আয়োজন করে। তার আরাম আয়েশের পুরা খেয়াল

খবর রাখে। তবু যখন সে সামনে এসে দাঁড়ায় ইউয়াং-এর মন এক অজানা আশংকায় দুলে ওঠে। সে কয়েক বারই ইউসাকে লীর সাথে দেখা করিয়ে দিবার কথা ভেবেছে। কিন্তু কেন জানি সাহস হয় না। ভয় পায়।

একদিন বনের কাছে নারকেল ডালের বেড়ার আড়ালে সে লীকে ইউসার বক্ষ সংলগ্ন দেখল। তারা ফিস ফিস করে কথা বলছে। ইউয়াং মৃদু পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে ওৎ পেতে শুনতে লাগল।

---'তুমি পরশু নিজের মালপত্র নিয়ে এখানে এসে থাকবে। আমি এপথ দিয়েই যাব।'

ইউসার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। কিন্তু লী প্রতি উত্তরে ফিস ফিস করে কি বলল বুঝা গেল না।

ইউয়াং সন্তর্পণে পায় পায় পিছিয়ে গেল। তার মাথা ভন ভন করছে। অথবা রক্ত চড়ে মাথাটা ভারী হয়ে গেছে। স্বচ্ছ মনটা মেঘে ছেয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে অজান্তে সে নদীর পাড় পর্যন্ত এসে গেছে। সামনে মেডিয়ার ভয়ংকর অতল পরিখাটা। সে আবার সেদিকে পা বাড়াল। ইচ্ছে হলো লাফিয়ে পড়ে এই পরিখায় জীবনটা ইতি করে দিতে। জীবনে আর আছে কি তার?

সে ঘন ঘাসের উপর দিয়ে পরিখার দিকে এগোচ্ছে। এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ এল, 'ভাইয়া'।

ইউয়াং থমকে দাঁড়াল। বিদ্যুতের মতো চট করে একটা খেয়াল চেপে গেল তার মাথায়। সে একটু এগিয়ে পরিখার কাছের ঝোপের কাছে গিয়ে ফুল ছিঁড়তে লেগে গেল। লাল নীল সবুজ বনফুল। ইউসা ঘন ঘন পা ফেলে কাছে এল।

'কি করছ ভাইয়া?'

---'ফুল তুলছি।'

সে ভাইয়ের দিকে না তাকিয়েই বলল---যদি অটল ইচ্ছাটা শিথিল হয়ে পড়ে।

---'বড় সুন্দর ফুল ভাইয়া।'

---'হাঁ।'

---'ফুলের তোড়া বানাবে?'

---'হাঁ।'

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection
মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....
বইটি সাবধানতা এবং যত্নের সাথে ব্যবহার করুন।

---এবার সে ইউসার দিকে তাকাল।

---'ইউসা।'

ইউসা মাথা ঘুরিয়ে তাকাল।

---'ওই ঝাড় থেকে ফুল তুলে দাও না।'

পরিখার মাঝখানের একটা ভাসমান ঝোপের দিকে আংগুল দেখিয়ে বলল সে।

ইউসা সবুজ পানায় ঢাকা পরিখার দিকে পা বাড়াল। পরিখা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

---'আরে দাঁড়াও, মাফলার রেখে যাও।'

---'কেন?'

---'ঝোপে আটকে যেতে পারে।

ইউসার আশ্চর্য লাগছে। তবু মাফলার ভাইয়ের দিকে ছুড়ে দিল। তার পর নরম মাটিতে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল। কিন্তু তাকে বেশী দূর আর এগুতে হয়নি। মাত্র কয়েক কদম এগুতেই অতল পরিখায় ডুবতে আরম্ভ করল। তার মুখ থেকে প্রাণপণ চিৎকার বেরুল 'ভাইয়া'।

ইউয়াং চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল। মন শূন্য, কান বধির, মাথা ভনভন---কিছু ভাবলও না সে আর। একেবারে পাথরের মূতির মতো নিস্পন্দ, স্থির।

কিছুক্ষণ পর যখন সে চোখ খুলল ইউসার চিহ্নও আর নেই। পরিখা তাকে হজম করে ফেলেছে।

মা

কুদরতুল্লা শাহাব

মাঁজীর সঠিক জন্মকাল জানা যায় না।

যখন লায়ালপুর সবে আবাদ হচ্ছিল, আর পাঞ্জাবের সব অঞ্চল থেকে হাঘরে গরীব লোক জমি পাবার আশায় সেই কলোনীতে এসে দলে দলে জমছিল (লায়ালপুর, ঝং, সারগোদা প্রভৃতি 'বার' এলাকা নামে পরিচিত) মাঁজীর বয়স তখন দশ বার বছর। সে হিসেবে তার জন্মকাল গত শতাব্দীর শেষ দশ পনের বছরের কোন এক সময় হবে।

মাঁজীর পিতৃবাস ছিল আম্বালা জেলার রুপড় তহসিলের মেনিলা গাঁয়ে। সেখানে তাদের কিছু জমি-জমা ছিল। তখন রুপড়ে শতদ্রু নদী থেকে 'সের হিন্দ' পরিখা খনন করা হচ্ছিল। আর সে পরিখা এলাকায় নানাজীর জমি পড়ে গিয়েছিল। রুপড়ে ইংরেজ সরকারের দফতর থেকে এসব জমির খেসারতের টাকা দেয়া হতো। নানাজী দু'তিন বার টাকার খোঁজে শহরে গেলেন। তিনি ছিলেন বড় সরল মানুষ, তাই ঠিক করতে পারলেন না যে, সরকারের দফতর কোথায় আর খেসারত উসুল করার জন্যে কী করতে হবে। অবশেষে অকৃত-কার্য হয়ে ধৈর্য ধরার ব্রত নিলেন এবং সেই পরিখা খননের কাজেই মজুর হিসেবে লেগে পড়লেন।

এমন সময় খরব হলো 'বার'-এ কলোনী হচ্ছে এবং নূতন আবেদনকারীরা মোফত জমি পাবে। খবর শুনে নানাজী স্ত্রী, দুই ছেলে এবং এক মেয়ের কাফেলা সাথে নিয়ে লায়ালপুর রওনা হলেন। যানবাহন ভাড়া করার সামর্থ্য ছিল না, তাই পায়ে হেঁটেই সেই দূরদেশে চললেন।

পাথেয় তাঁদের কিছুই ছিল না। পথে যেতে যেতে নানাজী এখানে ওখানে কুলীর কাজ করতেন, কিংবা কারো কাঠ কেটে দিতেন আর নানী এবং মাঁজী কারো সুতা কেটে দিতেন অথবা বাড়ীর উঠান

ঘরের দেয়াল লেপে দিতেন। লায়ালপুরের সঠিক পথ কারোরই জানা ছিল না। তাই ঘুরে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করে দিনের পথ সপ্তাহে অতিক্রম করে চললেন তাঁরা।

অবশেষে দেড় দু'মাস চলার পর জিরানওয়ালায় পেঁছিলেন। পায়ে চলা ও খাটুনি-দিনমজুরি করে করে সবাই অবসন্ন। কারো কারো পা ফুলে উঠল। সেখানে ক'মাস থাকলেন তাঁরা। নানাজী দিনভর মাল টেনে টেনে রোজগার করতেন। নানী চরকা কেটে সুতা বেচতেন আর মাঁজী ঘর দোর দেখতেন। একটা ঝুপড়ি, সেটাই তাঁদের ঘর।

বকরা ঈদের উৎসব এলো। নানাজীর কাছে কিছু টাকা জমেছিল। তিনি মাঁজীকে তিন আনা পয়সা দিলেন। ঈদের উপহার। জীবনে এই প্রথম মাঁজীর হাতে এতো পয়সা এলো; তিনি অনেক ভাবলেন। কিন্তু এই পয়সা খরচ করার কোন উপায় তিনি ভেবে পেলেন না। দিনে এক আধটা রুটি নুন লঙ্কার চাটুনি দিয়ে খাবার ব্যবস্থা থাকলে অতিরিক্ত পয়সার আর দরকার কি? এই প্রশ্নের জবাব সারা জীবনেও মাঁজী খুঁজে পেলেন না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আশী বছরেরও বেশী হয়েছিল। কিন্তু তখনো এক শ'টাকা, দশ টাকা এবং পাঁচ টাকার নোট তিনি ঠিক চিনে উঠতে পারতেন না।

ঈদ উপলক্ষে পাওয়া তিন আনা পয়সা মাঁজী দিন কয়েক ওড়নার কোণায় বেঁধে রাখলেন। তারপর যেদিন জিরানওয়ালা থেকে বিদায় নেয়ার দিন এলো মাঁজী এগার পয়সার তেল কিনে মসজিদের কুপি-গুলোতে ঢেলে দিলেন। বাকী এক পয়সা নিজের কাছে রেখে দিলেন। এরপর থেকে যখনি তাঁর কাছে এগার পয়সা পুরে আসত, তক্ষুণি মসজিদে তেল কিনে দিতেন। সারা জীবন এমনি প্রতি জুমারাতে তিনি দান করে গেছেন। পরবর্তীকালে বহু মসজিদে বিজলী বাতি এলো কিন্তু লাহোর এবং করাচীর মতো শহরেও এমন সব মসজিদের খোঁজ তাঁর জানা ছিল যে-গুলোতে তখনো তেলের বাতি জ্বলে। মৃত্যুর সময়েও তাঁর সিথানে মলমলের রুমালে বাঁধা কয়েক আনা পয়সা ছিল। সম্ভবত এই পয়সাও মসজিদে তেলের জন্যে জমা করা হয়েছিল। কারণ, তাঁর সেই মৃত্যুর দিনটা ছিল জুমারাত।

এই কয়েক আনা ছাড়া মাঁজীর কাছে না ছিল কোন টাকা-পয়সা, না গহনাপত্র। পার্থিব উপাদান হিসেবে গুনে নেবার মতো কয়েকটি মাত্র জিনিস ছিল মার। তিন জোড়া সুতী কাপড়, একজোড়া দেশী

জুতো, এক জোড়া রবারের চপ্পল, চশমা, ছোট ছোট তিনটি ফিরোজী দানা বসানো একটি আংটি, একটি জায়নামাজ আর বাদবাকী আল্লা আল্লা।

কাপড়ের তিন জোড়াকে তিনি বিশেষ নিয়মে ব্যবহার করতেন। এক জোড়া পরনে থাকতো। দ্বিতীয় জোড়া ধুয়ে খাটের নিচে রেখে দিতেন---যাতে সহজে ইস্ত্রি হয়ে যায়---আর বাকী জোড়া ধোবার জন্যে প্রস্তুত। এ ছাড়া যদি চতুর্থ কোন কাপড় তাঁর হাতে আসতো চুপি চুপি কাউকে দিয়ে দিতেন। এ কারণেই সারা জীবনে তাঁর বাক্স পোটারার প্রয়োজন হয় নি। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সফরের জন্যে প্রস্তুত হতেও তাঁর মাত্র কয়েক মিনিট লাগতো। কাপড়ের একটা পুঁটলী বানিয়ে জায়নামাজটায় জড়িয়ে নিতেন। শীতে পশমের একটা গায়ের চাদর আর গরমে মলমলের দোপাট্টা, তারপর যেথায় বলুন যেতে প্রস্তুত। শেষ সফরও তিনি এমনি সাদাসিধে ভাবে সম্পন্ন করে-ছেন। ময়লা কাপড় নিজ হাতে ধুয়ে খাটের নীচে রাখলেন। নেয়ে উঠে চুল শুকালেন---এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জীবনের শেষ তথা দীর্ঘ সফরে রওনা হয়ে গেলেন। যে রকম নিরিবিলিতে পৃথিবীতে ছিলেন তেমনি নীরবে পরলোকে পাড়ি দিলেন। সম্ভবত এজন্যেই তিনি প্রায়ই প্রার্থনা করতেন যে, আল্লা, হাত-পা সচল থাকতে উঠিয়ে নিও। আল্লা, কখনো কারো মুখাপেক্ষী আমায় করো না।

খানা-পিনার ব্যাপারে তিনি কাপড়-চোপড় থেকেও দীনপনা করতেন। তাঁর সবচেয়ে লোভনীয় খাদ্য ছিল, ধনে-পুদিনার চাটনীর সাথে মাকাই রুটি। এ ছাড়া অন্য জিনিস খেতেন বৈকি। কিন্তু আগ্রহ করে নয়। প্রায় প্রত্যেক গ্রাসেই আল্লার নাম নিয়ে শোকর করতেন। ফল খাবার প্রতি বাধ্য করা হলে কালে-ভদ্রে শুধু কলার ফরমাশ করতেন। অবশ্য নাস্তার বেলায় দু পেয়ালা চা এবং বেলা তিন প্রহরে খালি চা এক পেয়ালা অবশ্যই চাই। তিনি এক বেলা খেতেন এবং দুপুরে। কদাচিৎ রাতে খেতেন। গরমের দিনে প্রায়ই মাখন নিষ্কাশিত পাতলা নোনা লস্সীর সাথে এক আধখানা সাদা চাপাতি তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। কাউকে কোন কিছু আগ্রহ করে খেতে দেখলে খুশি হতেন। অপরের মঙ্গল সব সময়েই কামনা করতেন। মোনাজাতের সময় প্রথমে অপরের তারপর নিজের বা তাঁর সন্তানদের

জন্যে তিনি কখনো দোয়া করতেন না। প্রথমে অপরের জন্যে দোয়া করতেন, তারপর খোদাসৃষ্ট জীবের সেবার জন্যে উৎস গীকৃত নিজের সন্তান বা স্বজনদের মঙ্গলের জন্যে দোয়া করতেন। নিজের ছেলেমেয়েদেরকে কখনো তিনি আমার ছেলে বা 'আমার মেয়ে' বলে উল্লেখ করেন নি। সর্বদা আল্লার মাল বলে উল্লেখ করতেন।

কারো কাছ থেকে কোন কাজ করিয়ে নেয়া মাঁজীর পক্ষে বড় অস্বস্তিকর ব্যাপার ছিল। নিজের সব কাজ নিজেই করতেন। যদি কোন চাকর জোর করে তা করে দিত, লজ্জায় মরে যেতেন তিনি। এবং সারাদিন কৃতজ্ঞতায় দোয়া করতে থাকতেন।

সরলতা এবং দরবেশীর এই বৈশিষ্ট্য কিছুটা প্রকৃতিগতই মাঁজীর চরিত্রে ছিল আর এসেছিল কিছুটা জীবনের ঘাতসংঘাত থেকে।

জিরানওয়ালায় কিছুকাল থাকার পর যখন তিনি মা-বাপ আর দুই ছোট ভাই সমভিব্যাহারে জমির তালাশে লায়ালপুর কলোনীর দিকে রওনা হন, তখন জানতেন না কোথায় যেতে হবে আর জমি পেতে হলে কি কি তদবির করতে হবে। মাঁজী বলতেন, সেকালে তাঁর মনে কলোনীর কল্পনা এক ফেরেশতা স্বভাবের মহাত্মার চিত্র হয়ে ভেসে উঠত, যিনি উঁচু বেদীর বসে জমি-জিরাত বন্টন করছেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ছোট্ট কাফেলা লায়ালপুরের আনাচে-কানাচে ঘুরতে লাগল। কিন্তু কোন পথচারীর চেহারায় কলোনীর মহাত্মাসুলভ চিত্র প্রতিভাত হলো না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ৩৯২ নং চকে যেখানে তখন নূতন আবাদ বসেছে, সেখানে ডেরা বানাবার মতলব তাঁরা করলেন। আরো লোক এসে সেখানে বসতি স্থাপন করতে লাগল। নানাজী তাঁর সরল মনে বুঝলেন যে, কলোনীতে আবাদ হবার হয়ত এ-ই এক পন্থা। তাই তিনি এক ফালি জায়গায় সীমা-রেখা টেনে ঘাস-পাতা দিয়ে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে নিলেন। এবং ভাল দেখে এক টুকরো জমি খুঁজে চাষ করারও চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু একদিন সরকারী আমলা এলো, নানাজীর কাছে এলটমেন্টের কাগজপত্র ছিল না। ফলে তাঁকে চক থেকে বের করে দেয়া হলো। এবং সরকারী ভূমিতে অবৈধভাবে ডেরা বানানোর দায়ে তাঁর বাসন-কোসন এবং বিছানাপত্র ক্রোক করে নেয়া হলো। আমলাদের একজন মাঁজীর কান থেকে দুটো বালীও খসিয়ে নিল। একটা বালী খুলতে

একটু দেরী হলে সে জোরে টান মারল, ফলে মাঁজীর বাম কান বড়ো বিশ্রী রকম ছিঁড়ে গেল।

চক নং ৩৯২ থেকে নির্বাসিত হয়ে সামনে যে রাস্তা পেলেন, তাতেই তাঁরা পা চালিয়ে দিলেন। গরমের দিন ছিল তখন। দিন ভর লু হাওয়া চলছে। কুয়ো থেকে পানি তোলার একটা মাটির পাত্রও ছিল না তাঁদের কাছে। পথে যেখানেই কুয়া দেখতেন, মাঁজী তাঁর দোপাট্টা ভিজিয়ে নিতেন, যাতে তেষ্টা পেলে ভাইদের চুষতে দিতে পারেন। এমনি ভাবে চলতে চলতে তাঁরা চক নং ৫০৭-এ পৌঁছলে এক জানাশোনা আবাদকারী নানাজীকে কামলা হিসেবে রাখলেন। নানাজী হাল চালাতেন। নানাজী গরু চরাতেন। আর মাঁজী ক্ষেত থেকে গরু এবং মেষের জন্যে ঘাস কেটে আনতেন। তখন তাদের দিনে এক বেলা পেটপুরে খাবারও সঙ্গতি ছিল না। কখনো বুনো ফল খেয়ে থাকতেন। কখনো তরমুজের খোসা কুড়িয়ে খেতেন। কখনো কোন ক্ষেতে কাঁচা ঝরানো ফল পেলে তার চাটনী বানিয়ে নিতেন। একদিন কোত্থেকে যেন কলতার শাক মিলে গেল। নানী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাঁজী শাক চুলোয় চড়িয়ে দিলেন। যখন প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে হাতা দিয়ে নাড়তে গিয়ে এত জোরে হাড়িতে ঘা লাগল যে, হাড়ির তলা ভেঙ্গে গেল। আর সব শাক চুলোর ভেতর পড়ে গেল। নানী মাঁজীকে খুব বকলেন এবং মারলেনও। সে রাতে গোটা পরিবার চুলোর পোড়া কাঠে লেগে থাকা শাক কোনমতে আঙ্গুল দিয়ে চেটে চেটে খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলো।

চক নং ৫০৭-এ নানাজীর ভাগ্য ফিরে গেল। কয়েক মাস কামলার কাজ করার পর পুনর্বাসনের সূত্রে সহজ কিস্তিতে এক খণ্ড জমি পেয়ে গেলেন তিনি। আস্তে আস্তে তাঁর অবস্থা ফিরতে লাগল। এবং দু'তিন বছরের মধ্যেই গাঁয়ের খানেপিনেওয়ালাদের পর্যায়ে পরিগণিত হতে চললেন। এমনি দিন দিন যখন স্বচ্ছলতা বেড়ে চলল পিতৃভূমির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। সুখশান্তিতে চার পাঁচ বছর থাকার পর অবশেষে একদিন গোটা পরিবার রেলে চড়ে মেনিলা রওয়ানা হলো। রেলের সফর মাঁজী বড় পছন্দ করলেন। তিনি সারাক্ষণ খিড়কির বাইরে মুখ বের করে দেখছিলেন। সুতরাং অনেক কয়লার কনা তাঁর চোখে এসে পড়ল। তাই দিন

কয়েক তাঁর চোখ ফুলে লাল হয়ে ছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন তিনি সারাজীবন তাঁর সন্তানদেরকে রেলের খিড়কি দিয়ে বাইরে তাকাবার অনুমতি দেন নি।

মাঁজী থার্ড ক্লাস ডাব্বায় বড় আরাম বোধ করলেন। সহ-যাত্রী মেয়ে বা শিশুদের সাথে ভাব জমে উঠতো সহজেই। সফরের গ্লানি এবং পথের ধুলোবালি তাঁর কোন অসুবিধা করতো না। উপরের ক্লাসে উঠলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। দু' একবার যখন তাঁকে বাধ্য হয়ে এয়ার কণ্ডিশনড কম্পার্টমেন্টে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, অস্বস্তি এবং অসুবিধায় রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। সারাক্ষণ কারাগার এবং বন্দীদশায় যেন কাটিয়েছিলেন তিনি।

মেনিলায় পৌঁছে নানাজী পরিত্যক্ত পৈতৃক বাড়ী মেরামত করলেন। আত্মীয়-স্বজনকে এটা ওটা উপহার দিলেন। তারপর মাঁজীর জন্যে পাত্র খোঁজার কাজ শুরু হয়ে গেল।

সেকালে জমিওয়ালাদের প্রভূত সম্মান ছিল। ভাগ্যবান এবং সম্মানিত বলে পরিগণিত হতেন তাঁরা। সুতরাং চারদিকে থেকে মাঁজীর জন্যে পরপর পয়গাম আসতে লাগল। মাঁজীরও তখন বড় ঠাট ছিল। বরপক্ষের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে নানীজি তাঁকে রোজ রোজ নয়া নয়া পোশাক পরাতেন। এবং সারাক্ষণ বৌ-মানুষের মতো সাজিয়ে রাখতেন।

মাঝে মাঝে স্মৃতিকে জাগ্রত করে মাঁজী বলতেন, 'সেকালে গ্রামে বেরুনোও আমার পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। যেদিকেই যেতাম লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো এবং বলতো, 'ওইরে খেয়াল বক্স জমিদারের বেটি যাচ্ছে। দেখা যাক, কোন্ ভাগ্যবান ওকে বিয়ে করে নিয়ে যায়।'

মাঁজী, 'আপনার চোখে সে রকম ভাগ্যবান কেউ কি ছিল?'

আমরা কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতাম। 'তওবা তওবা পুত্।' মাঁজী কানে হাত দিতেন 'আমার চোখে কেউ কি করে হবে! তবে হ্যাঁ, এটুকু আশা অবিশ্য ছিল যে, যদি আমার ভাগ্যে এমন লোক মেলে যে দু'কলম লেখা পড়া জানে, তা'লে খোদার মেহেরবানী হবে।'

সারা জীবনে এই একটি মাত্র আশা মাঁজীর মনে উদয় হয়েছিল —যা একান্তই নিজের জন্যে। তাঁর সে আশা খোদা পূরণও করেছিলেন। সে বছরই মাঁজীর বিয়ে আবদুল্লা সাহেবের সঙ্গে হয়ে গেলো।

আবদুল্লা সাহেবের বড় নাম ডাক চলছে তখন। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের চোখের মণি। কিন্তু পাঁচ ছ' বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন। আর পিতা যখন মারা যান তখন এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁদের সমুদয় সম্পত্তি বন্ধকে পড়ে আছে, ফলে আবদুল্লা সাহেব তাঁর মার সাথে এক ঝুপড়িতে উঠে এলেন। বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে তাঁদের মনে দৃঢ়-সংকল্প জাগল যে, আবার সেই ঐশ্বর্য ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই, আবদুল্লা সাহেব জোরশোরে লেখাপড়ায় লেগে গেলেন। বৃত্তির পর বৃত্তি পেয়ে এবং দু' দু'বছরের পরীক্ষা এক এক বছরে পাস করে তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হলেন। সেকালে সম্ভবত সেই প্রথম একজন মুসলমান ছাত্র এই রেকর্ড স্থাপন করল।

উড়তে উড়তে এই খবর স্যার সৈয়দের কানে গিয়ে পেঁছিল। তিনি তখন আলীগড় কলেজ পত্তন করেছেন। তিনি তাঁর খাস মুন্সীকে তাড়াতাড়ি করে গ্রামে পাঠালেন এবং আবদুল্লা সাহেবকে বৃত্তি দিয়ে আলীগড়ে ডেকে আনলেন। সেখানে আবদুল্লা সাহেব মন দিয়ে পড়া শুনা করলেন। এবং বি, এ পাস করার পর উনিশ বছর বয়সে সেখানেই ইংরেজী, আরবী, দর্শন এবং অংক শাস্ত্রের লেকচাচার নিযুক্ত হলেন।

স্যার সৈয়দের কামনা ছিল মুসলমান যুবকরা অধিকতর সংখ্যায় উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হোক। তাই তিনি আবদুল্লা সাহেবের জন্য সরকার থেকে বৃত্তি আদায় করে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত যাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

বিগত শতকের বৃদ্ধরা সাতসাগর পাড়ি দেয়াকে নিজ হাতে গড়া বিপদ মনে করতো। আর তাই আবদুল্লা সাহেবের মাতা ছেলেকে বিলেতে যেতে নিষেধ করলেন। ফলে, আবদুল্লা সাহেবের ভাগ্য হলো অপ্রসন্ন। তিনি বৃত্তি দিলেন ফিরিয়ে।

এ গোঁড়ামির জন্যে স্যার সৈয়দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং খুব দুঃখও পেলেন। তিনি অনেক করে বুঝালেন, ভয় দেখালেন, ধমকালেন---কিন্তু আবদুল্লা সাহেব 'না' থেকে 'হাঁ'তে আসলেন না।

'তুমি কি জাতীয় স্বার্থের চেয়ে তোমার বুড়ী মার কথাকে বড় মনে কর ?'

স্যার সৈয়দ গর্জে উঠলেন।

'জী হাঁ।' আবদুল্লা সাব জবাব দিলেন।

জবাব শুনে স্যার সৈয়দ রাগে নিজকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। কামরার দরজা বন্ধ করে প্রথমে তাঁকে চড় থাপ্পড় মারলেন। তারপর কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়ে বললেন, 'এখন তুমি এমন জায়গায় গিয়ে মর, যেখান থেকে আমি আর তোমার নামও যেন শুনতে না পাই।'

আবদুল্লা সাহেব যেমন সুবোধ ছেলে ছিলেন তেমনি ছিলেন ধীমান তেজী শিষ্যও। মানচিত্র খুলে তিনি সবচে' দূর এবং দুর্গম জায়গা গিলগিটকে পছন্দ করে সেখানে যাবার মনস্থ করেন। এবং সোজা রওনা দিয়ে গিলিগিটে পেঁছিলেন। আর দেখতে দেখতে ওখানকার প্রশাসকের পদে উন্নীত হলেন।

যখন মাঁজীর বিয়ের আলোচনা চলছে, আবদুল্লা সাব তখন ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছেন। ভাগ্য দু'জনার জুড়ি লিখেছিল। বাগদান হলো এবং এক মাস পর বিয়েও হয়ে গেল যাতে আবদুল্লা সাব নববধূকে নিয়ে গিলগিট যেতে পারেন।

বাগদানের পর একদিন মাঁজী সইদের সাথে পাশের গাঁয়ে মেলা দেখতে যান। ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে আবদুল্লা সাহেবও সেখানে যান।

মাঁজীর সইরা তাঁকে ঘিরে ধরে প্রত্যেকে পাঁচ টাকা করে উসুল করে। আবদুল্লা সাহেব মাঁজীকেও টাকা দিতে চেয়েছিলেন। মাঁজী নিতে রাজী হন নি। কিন্তু পীড়াপীড়ি চলল বাধ্য হয়ে মাঁজী মাত্র এগার পয়সার ফরমান করেন।

'এত বড় মেলায় এগার পয়সা দিয়ে কি করবে?'

আবদুল্লা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'সামনের জুমেরাতে আপনার নামে মসজিদে তেল কিনে দেব।' মাঁজী বললেন।

জীবনের মেলায়ও আবদুল্লা সাহেবের সাথে মাঁজীর লেনদেন শুধু জুমেরাতের এগার পয়সাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর বেশী পয়সা কখনো তিনি চেয়েছেন, না নিজের কাছে রেখেছেন।

গিলগিটে আবদুল্লা সাহেবের বড় শান শওকত ছিল। সুদৃশ্য বাংলো, সুন্দর বাগান, চাকর-বাকর, দরজায় দারওয়ান পাহারা ইত্যাদি। যখন আবদুল্লা সাহেব দূরে কোথাও যেতেন বা আসতেন

সাত বার তোপধ্বনি করে অভিনন্দন জানানো হতো। তাছাড়াও গিলগিটের প্রশাসক রাজনৈতিক শৃংখলার এবং সমাজে শক্তির একজন দিকপাল ছিলেন। কিন্তু এ সব আভিজাত্য ও রাজকীয়তার সামান্য প্রভাবও মাঁজীর উপর পড়তো না। কোন রকম ছোট-বড় উঁচু-নিচু পারিপার্শ্বিকতার কোন কিছুই তাঁর মনে রেখাপাত করতো না। বরং মাঁজী চিরন্তন সাদাসিধে ভাব এবং আত্মনির্ভরশীলতা সব পরিবেশে সমান নির্বিকারে কাজ করে যেতো।

সে সময় স্যার মেলকম হ্যালী ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে গিলগিটে (রুশ এবং চীন সীমান্তে) পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে নিয়োজিত হন। একদিন লেডি হ্যালি এবং তাঁর মেয়ে মাঁজীর সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁরা গাউন পরে এসেছিলেন। এই নগ্নতা মাঁজীর পছন্দ হলো না। তিনি লেডি হ্যালিকে বললেন,

'তোমার জীবন তো যেভাবে কাটবার কেটে গেছে। কিন্তু মেয়েটার পরিণামটা খারাপ করো না।'

একথা বলে তিনি মিস হ্যালিকে নিজের কাছে রাখলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে তাকে রান্না করা, কাপড় পরা, সেলাই করা, বাসন মাজা এবং কাপড় কাচা শিখিয়ে তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

যখন রুশ বিপ্লব হলো, লর্ড কিসেজ সীমান্ত ভ্রমণ করতে গিলগিট আসেন। তাঁর সম্মানার্থে প্রশাসকের পক্ষ থেকে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। মাঁজী নিজের হাতে দশ-বার রকমের সুস্বাদু খাবার তৈরি করেন। খাবার শেষে লর্ড কিসেজ আবদুল্লা সাহেবকে বলেছিলেন, 'মিস্টার গভর্নর, যে খানসামা এই খাবার রান্না করেছে---দয়া করে আমার পক্ষ থেকে আপনি তার হাত চুম্বন করলে আমি সুখী হবো।"

ভোজ সভার পর আবদুল্লা সাহেব যখন বাড়ী ফিরলেন, দেখলেন, মাঁজী বাবুর্চিখানার এক কোণায় এক চাটাইয়ে বসে নুন-লঙ্কার চাটনি দিয়ে মাকাই রুটি খাচ্ছেন।

একজন যোগ্য গভর্নরের মতো আবদুল্লা সাহেব মাঁজীর হাত চুম্বন করে বললেন,

'যদি লর্ড কিসেজ একথা বলে বসতেন যে, তিনি নিজেই খানসামার হাতে চুমো দেবেন, তখন তুমি কি করতে?'

'আমি ?' মাঁজী রেগে উঠে বললেন, 'আমি তাঁর গোঁফ পাকড়ে গোঁড়াশুদ্ধ তুলে দিতাম। তখন আপনি কি করতেন ?'

'আমি ?' আবদুল্লা সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'আমি সেই গোঁফ তুলো দিয়ে বেঁধে ভাইসরয়-এর কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তারপর তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতাম। যেমন করে পালিয়ে এসেছি স্যার সৈয়দের কাছ থেকে।'

এ সব কথার রসে মাঁজীর মন সিক্ত হত না।

একবার---শুধুমাত্র একবার মাঁজী প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে কাবাব হয়ে গিয়েছিলেন, যে আগুন মেয়েদের সহজাত।

গিলগিটে সব সরকারী নোটিশ প্রশাসক তথা গভর্নরের নামে জারী করা হতো। অবশেষে যখন এ রেওয়াজটা মাঁজী অবধি গড়ালো তিনি আবদুল্লা সাহেবের কাছে অভিযোগ করে বললেন,

'রাজত্ব তো কচ্ছেন আপনি কিন্তু আমি বেচারীর নাম নিয়ে শুধু শুধু কেন এত টানা হেচঁড়া ?'

আবদুল্লা সাহেব আলীগড়ের ছাত্র। রসিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বললেন,

'হায় আল্লাহ্ তোমার নাম এটা থোড়াই। হার এক্সেলেন্সী গভর্নর পত্নী তো আসলে তোমার সপত্নী। অহর্নিশি যে আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।'

রসিকতার চূড়ান্ত। আবদুল্লা সাহেব মনে করেছিলেন কথাটা যথাযথ গৃহীত হয়েছে কিন্তু মাঁজী বিষাদাক্রান্ত হলেন এবং কথাটা নিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

কিছুদিন পর কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং মহারানীকে নিয়ে গিলগিটে সফরে এলেন। মাঁজী মহারানীর কাছে মনের দুঃখ জানালেন। মহারানী সরলমনা ছিলেন। আবেগ উথলে উঠল। 'হায়, হায়, আমার রাজত্বে এই অনাচার ? আমি আজই মহারাজাকে বলব, যেন আবদুল্লা সাহেবের খোঁজ নেয়।'

এ মামলা মহারাজ প্রতাপ সিং পর্যন্ত পৌঁছাল। আবদুল্লা সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তিনি তো হতবাক। হাতে ধরে একি বিপদ ডেকে আনা হলো ? কিন্তু ব্যাপার যখন আরও গড়াল মহারাজা এ হুকুমনামা জারী করলেন, অতঃপর

গিলগিটের গভর্নর-পত্নীকে ওজারত এবং 'গভর্নর'কে উজির বলে সম্বোধন করা হবে। এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম অবধি গিলগিটে এই সরকারী নামকরণ প্রচলিত ছিল।

এ হুকুমনামা শুনে মহারানী মাঁজীকে খোশ খবর দিলেন যে, মহারাজ গভর্নর-পত্নীকে নাকচ করে দিয়েছেন।

'এখন তুমি দিব্যি মনের সুখে ঘর-সংসার করো আর আমাদের জন্যে দোয়া করো।'

মহারানীর কোন সন্তান ছিল না। এজন্যে প্রায়ই তিনি মাঁজীকে দোয়া করতে বলতেন।

মাঁজী নিজে অবশ্য বলতেন তাঁর মতো সৌভাগ্যশালী মা পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু ধৈর্য, তুষ্টি এবং সব কিছু মেনে নেয়ার, সব কিছু সহ্য করার চশমাজোড়া খুলে ফেলে যদি দেখা যেতো তা হলে সেই সৌভাগ্য-পর্দার অন্তরালে কত দুঃখ, কত বিষাদ এবং কত আঘাত যে লুকানো ছিল তা প্রকট হয়ে উঠতো।

আল্লামিয়া মাঁজীকে তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে দান করেছিলেন। দুই মেয়ে বিয়ের পর একের পর এক মারা গেছে। আর বড় ছেলেটি পূর্ণ যৌবনকালে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে মারা গেছে।

বলার সময় তো মাঁজী বলতেন, আল্লার মাল আল্লা নিয়ে গেছে। কিন্তু একলা চুপি চুপি তিনি কি সারাটা জীবন রক্তাশ্রু বিসর্জন দেননি?

যখন আবদুল্লা সাহেবের ইন্তেকাল হলো, তাঁর বয়স বাষট্টি আর মাঁজীর বয়স পঞ্চান্ন বছর। তৃতীয় প্রহরের সময় তখন আবদুল্লা সাহেব চারপায়ে প্রাত্যহিক নিয়মে হেলান দিয়ে আধা শোয়া-বস্থায় ছিলেন। আর মাঁজী বসে ছুরি দিয়ে 'গোনা'র খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে তাকে দিচ্ছিলেন। তিনি মজা করে গোনা চুষতে চুষতে রসিকতা করছিলেন। হঠাৎ খাপ ছাড়া ভাবে বলে উঠলেন।

'হায় আল্লা, বিয়ের আগে মেলায় আমি তোমাকে যে এগারটা পয়সা দিয়েছিলাম, সে পয়সা ফেরত দেবার সময় কি এখনো হয় নি?'

মাঁজী শুনে নতুন বৌ-এর মতো ব্রীড়াবনত হয়ে গোনা'র খোসা ছড়ানোতে যেন আরও মগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর বুকে একই সাথে অনেক কথা গুমরে উঠল।

'সময় এখনো হলো কোথায় প্রিয়? বিয়ের আগের এগার পয়সার ঋণ তো বয়েছিই। কিন্তু বিয়ের পরে যেমন করে তুমি আমাকে আদর যত্ন করেছ সেজন্য তোমার পা ধুয়ে পানি খেতে হয়। আমার গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে তোমাকে পরানো উচিত আমার। এখনো সময় এলো কোথায় প্রিয়?'

কিন্তু ভাগ্যলিপির খাতায় সময় এসে গেছে। মাঁজী যখন মাথা তুললেন আবদুল্লা সাহেব 'গোনার দানা মুখে নিয়ে তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

মাঁজী ডাকলেন। সাড়া নেই। গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন। চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু আবদুল্লা সাহেব এমন ঘুমেই ঢলে পড়েছেন যে, তা থেকে কেয়ামতের আগে আর জাগবার সম্ভাবনা নেই।

মাঁজী দুই ছেলে এবং মেয়েকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'বাপরা কেঁদোনা। তোমাদের বাবা যে আরামে দুনিয়ায় ছিলেন সেই আরামে চলে গেছেন। কেঁদোনা কাঁদলে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে।'

মাঁজী বললেন, বাবার জন্যে কেঁদোনা। কাঁদলে তিনি কষ্ট পাবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং চুরি করে তাঁর স্বামীর স্মরণে কি বাকি জীবনটা কাঁদেন নি?

মাঁজী এ দুনিয়া থেকে নিজে যখন চলে গেলেন তাঁর সন্তানদের জন্যে এক মহা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে গেলেন। যে চিহ্ন তাদেরকে কেয়ামত অবধি ভক্তি-প্রান্তরে ভবঘুরে করে রাখবে।

যদি মাঁজীর নামে দান করা হয় তো এগার পয়সার বেশী দান করা চলবে না। অথচ মসজিদের মোল্লা পেরেশান। কারণ, বিজলীর রেট বেড়ে গেছে। তেলের দামও বেড়ে গেছে।

মাঁজীর নামে যদি ফাতেহা করা হয় তো মাকাই রুটি এবং নুন-লঙ্কার চাটনি সামনে এসে যায়। কিন্তু খানেয়ালা দরবেশ বলে, 'ফাতেহা দরুদের বেলায় পোলাও জর্দা অবশ্য দেয়।'

মাঁজীর কথা উঠলে অজ্ঞাতসারে মন কাঁদতে চায়। কিন্তু কাঁদলে না জানি তার রুহ্ কত কষ্ট পাবে। তবে কাঁদা থামাতে চাইলে খোদার কছম মোটেই থামান যায় না।

---

* নক্শ্ (করাচী) মার্চ '৬৩ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত উর্দু গল্পের অনুবাদ। স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৬৪ পূর্বদেশ।

কুররাতুল আইন হায়দার

রাত এগারটায় শহরের নীরব সড়কগুলো পেরিয়ে এক সেকেলে ফটকের সামনে গিয়ে টেক্সি দাঁড়াল। ড্রাইভার দরজা খুলে একটুও ইতস্তত না করে আমার সুটকেস তুলে ফুটপাথে রাখল, তারপর পয়সার জন্যে হাত বাড়াতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'এই জায়গা?' আমি সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'জ্বী, হাঁ।'

আমি নিচে নামলাম, আর ট্যাক্সি গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি নিঃসাড় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, ফটক খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা ভেতর থেকে বন্ধ। ফটকে একটা ছোট মত খিড়কী লাগানো। সেটা খট খট করে নাড়লাম। কিছুক্ষণ পর খিড়কী খুলে গেল। আমি চোরের মতো ভেতরে মাথা গলিয়ে ইতিউতি করলাম। দেখলাম আবছা অন্ধকারে নৈশ পোশাক পরা দুটো মেয়ে এক কোণে বসে ফিসফাস করে কথা বলছে। আঙ্গিনার ওপারে এক ভাঙ্গা পুরনো প্রাসাদ। এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে পড়ল লক্ষ্ণৌর ঘিসিয়ারী মিণ্ডি স্কুলের কথা। সেখানে আমি পরীক্ষা দিয়ে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেছিলাম। আমি আবার গলির নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে তাকালাম। যদি এমন হয়---আমি ভয়ে ভয়ে ভাবলাম, এটা যদি একটা গুণ্ডাপাণ্ডাদের আড্ডা হয়, তা'হলে এক ভিন দেশের ভিন শহরের রাত এগারটায় এক অচেনা বাড়ীর ফটকে আঘাত করছি---এবং মিণ্ডি স্কুলের সাথে যার সামঞ্জস্য রয়েছে।

একটা মেয়ে জানালার দিকে এগুলো।

'গুড্ ইভিনিং। এটা ওয়াই, ডব্লু, সি, এ, না?'

আমি একটু বিনীত হেসে বললাম। 'আমি তার করে দিয়েছিলাম একটা কামরা রিজার্ভ করে রাখার জন্যে।' অথচ কী আশ্চর্য ওয়াই

ডব্লুর এই শ্রী? এটুকু অবশ্য আমি মনে মনে বললাম।

'আমরা আপনার কোন তার পাইনি। আর সত্যি দুঃখিত যে কামরাও খালি নেই।'

এবারে দ্বিতীয় মেয়েটি এগুলো। 'এটা ওয়াকিং গার্লসদের হোস্টেল। সাধারণত এখানে আগন্তুকদের থাকতে দেয়া হয় না।'

আমি একেবারে ঘাবড়ে গেলাম। এসময় আমি এখান থেকে কোথা যাব? অন্য মেয়েটি আমার অসহায় অবস্থা দেখে একটু সহানুভূতির সুরে হাসল।

'কোন চিন্তা নেই। ভেতরে চলে এসো। নাও এটা ডিঙ্গিয়ে এসো।'

আমি সংকোচ করে বললাম, 'আমার জন্যে কোথায় জায়গা হবে?'

'হাঁ হাঁ কোন চিন্তা নেই। আমি জায়গা বানিয়ে দোব। এখন এই মাঝ রাতে আর কোথা যাবে তুমি?'

আমি স্যুটকেস হাতে আঙ্গিনায় লাফিয়ে পড়লাম। মেয়েটি আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে নিল। চলতে চলতে আমি দ্রুত বললাম, 'ব্যস, মাত্র এই রাতটা আমাকে এখানে থাকতে দাও। কাল সকালে আমি বন্ধুদের ফোন করে দোব। আমি এখানে তিন চার জনকে জানি। তোমার আর কষ্ট হবে না।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'---সে বলল।

আর প্রথম মেয়েটি শুভরাত জানিয়ে বিদায় নিল।

আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় পেঁীছলাম। বারান্দার এক কোণে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা কামরার মতো। মেয়েটি লাল ফুল তোলা মোটা পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেল। আমিও তার পিছু পিছু গেলাম।

'আমি এখানে থাকি, তুমিও এখানে শোবে।'

স্যুটকেসটি এক চেয়ারে রেখে সে আলমারী খুলে সাফ তোয়ালে আর সাবান বের করতে লাগল। এক কোণে ছোট একটা পালঙ্ক-এ মশারী খাটানো। বরাবর সামনে প্রসাধন টেবিল আর বই-র আলমারী; সারা পৃথিবীর মেয়ে-হোস্টেল যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমনি। মেয়েটি হঠাৎ অন্য একটি আলমারী খুলে চাদর আর কম্বল বের করে ধূসর বিবর্ণ চত্বরে বিছাল। তারপর পালঙ্ক-এ নতুন চাদর বিছিয়ে মশারী নাবিয়ে দিল। নাও, তোমার বিছানা তৈরি।'

আমি খুব লজ্জিত হলাম। বললাম, 'শোনো, আমি মেঝেয় শোব।'

'তাই কি হয়? মশা কামড়ে একদম সারা করে দেবে যে। আমরা না হয় এতে অভ্যস্ত। নাও, কাপড় ছাড়।' বলেই সে নিশ্চিন্তে চত্বরে বসে পড়ল।

'আমার নাম কারমিন, এক অফিসে চাকরি করি। আর সন্ধ্যায় ভার্সিটির ল্যাবরেটরীতে কেমিস্ট্রী বিষয়ে রিসার্চ করি। ওয়াই ডব্লুর সোশাল সেক্রেটারী আমি। এখন তোমার সম্পর্কে কিছু বলো ?'

আমি আমার পরিচয় বিবৃত করলাম।

'এখন শুয়ে পড়ো তাহলে।' আমাকে ঝিমুতে দেখে সে বলল। আর দু'জানু একত্র করে কি যেন প্রার্থনা করল, তারপর হঠাৎ শুয়ে পড়ল।

সকালে বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠল। হাউস-কোট পরা মেয়েরা মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে গোসলখানা থেকে বেরুচ্ছে। বারান্দায় গরম কপির গন্ধ ছড়ানো। দু'তিনটা মেয়ে আঙ্গিনায় পায়চারী করে দাঁত ব্রাস করছে।

'চলো, তোমাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিচ্ছি।' কারমিন বলল।

আর হল থেকে বেরিয়ে কড়িডোর পেরিয়ে এক প্রান্তে এক ভাঙ্গাচোরা কুঠুরির মতো। তাতে শুধু একটা মাত্র নল লাগানো। আর দেয়ালে এক হুক লাগানো। চত্বর স্যাঁতসেঁতে আর আস্তর খসা দেয়াল। কোথা থেকে যেন একটি মেয়ের গানের সুর ভেসে আসছিল। গোসলখানায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম---কী আশ্চর্য, কতকাল থেকে এই গোসলখানা এই শহরের বাড়ীতে রয়েছে। যেখানকার কথা আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি সেখানেই আজ এসে দাঁড়িয়েছি। বোকার মতো কি সব ভাবছি আমি।

গোসল সেরে আমি বেরিয়ে এলাম। আধো অন্ধকার হল ঘরে এক ছোট টেবিলে আমার নাস্তা সাজানো হচ্ছে। ক'টি মেয়েই জমা হয়েছে। কারমিন তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পুরনো বন্ধুদের মতো হাসি-ঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠলাম।

'আমি এবার পরিচিতদের ফোন করব।' চা শেষ করতে করতে আমি বললাম। কারমিন দুষ্টুমি হাসল।

'হাঁ, এখন তোমার বড় বড় এবং নামকরা বন্ধুদের ফোন করো। আর তাদের সেখানে চলে যাও, বলি কে তোমার পরোয়া করে ?--- কেমন রোজা, আমরা ওর পরোয়া থোড়াই করি ?'

'আলবত।' সমবেতকণ্ঠে সবাই বলে উঠল।

মেয়েটি টেবিল থেকে উঠল। আমরা এখন কাজে যাচ্ছি। সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে।'

---ম্যাগডোলিনা বলল।

'সন্ধ্যায় ? ও মা, সন্ধ্যায় তো সে কোন কান্ট্রি ক্লাবে আড্ডা দেবে।'

কারমিন অফিসে চলে গেলে আমি বারান্দায় গিয়ে ফোন করতে শুরু করলাম। সৈন্য বিভাগের মেডিকেল চীফ মেজর জেনারেল কিমলু গোল্ডাস, যুদ্ধের সময় তিনি আমার মামার বন্ধু ছিলেন। মিসেস এন্তোনিয়া কুস্তেলো, এক কোটিপতি কারবারীর পত্নী, আর এখানকার সামাজিক লিডার। এক আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্সে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আলফান্সো বেলিরা এদেশের নামকরা ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক, তিনি একবার করাচী এসেছিলেন।

'হ্যালো, হ্যালো। আরে, তুমি কবে এলে ? আমাদের একটু জানালেও না ? ও হো ওখানে ? গুড গড---ওটাও কি একটা থাকার জায়গা। শীগ্‌গিরই তোমায় নিতে আসছি।'

সবাই একবার করে ফোনে একথা বলল। সবশেষে আমি ডন গাসিয়া ডিল প্রেডুসকে ফোন করলাম। তিনি পশ্চিম ইউরোপের এক দেশে স্বদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ছিলেন। এবং সেখানেই তার এবং তার পত্নীর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তার সেক্রেটারী জানাল, তারা আজকাল হিলে থাকছে। সেই হিলাবাসে আমার কল যোগ করে দিল সে।

কিছুক্ষণ পর কুস্তেলু আমাকে নিতে এলেন। কারমিনের রুমে এসে চারদিকে দেখলেন। তারপর আমার স্যুটকেস তুলে নিলেন। আমি যেন ধাক্কা খেলাম। আমি এ লোকদের ছেড়ে যাব না। আমি কারমিন, বার্ণার্ডা, রোজা এবং মেগডোলিনার সাথে থাকতে চাই।

'এগুলো রেখে দিন, সন্ধ্যা অবধি দেখা যাক।'

আমি একটু সংযত হয়ে মিসেস কুস্তেলুকে বললাম।

'কিন্তু তোমার যে এই বাজে জায়গায় খুব কষ্ট হবে।'

তিনি বারবার এ উক্তি করতে লাগলেন।

রাত্রে আমি যখন ফিরে এলাম কারমিন আর এমিলিয়া আমার প্রতীক্ষায় ফটকের খিড়কিতে তাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমরা তোমার জন্যে কামরা ঠিক করে রেখেছি। কারমিন বলল। আমি খুশী হয়ে ভাবলাম আজ আর ওকে চত্বরে শুতে হবে না।

হলের অন্য এক প্রান্তে আরো এক কৃত্রিম কামরা বানিয়ে তাতে দুটো সিট পাতা হয়েছে। একটায় আমার বিছনা আর অপরটিতে মিসেস সুরিল সিগ্রেট ফুঁকছেন। বয়স তার আটচল্লিশ উনপঞ্চাশের

কোঠায়। চোখেমুখে আশ্চর্য উদাসীনতা। ইউলিজিন বংশের কোন এক শাখায় তাঁর জন্ম। অবশ্য চেহারা দেখে তা ঠাহর করা মুস্কিল। বিছানায় টান হয়ে হঠাৎ তিনি আমাকে তাঁর জীবনের কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন।

'আমি গাম থেকে এসেছি।'

'গাম কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'গাম হল প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপ। ইংরেজ-শাসিত এক ছোট মতো দ্বীপ এবং এত ছোট যে, পৃথিবীর মানচিত্রে তার নামের নিচে একটা বিন্দু দেওয়া আছে। আমি আমরিকান শহুরে।'

একটু গর্বোদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন। 'গাম'---আমি মনে মনে পুনরুক্তি করলাম। কী আশ্চর্য! পৃথিবীতে কত জায়গা। আর তাতে আমাদের মতোই লোক থাকে।

'আমার মেয়ে এক ভায়োলিন বাদকের সাথে পালিয়ে এসেছে। আমি তাকে পাকড়াও করতে এসেছি। ওর বয়স মাত্র সতের বছর। এ-ই আজকালকার মেয়েরা।' তারপর একটু দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'আমার ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিল।'

'উহ্' আমার মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরুল।

'আমার বুকের ক্যান্সার। নইলে,' বড় দরদ দিয়ে বলতে লাগলেন। 'নইলে তিন বছর আগে আমিও, সবাইর মতো নর্মাল ছিলাম।' তাঁর স্বরে গভীর আকুতি। 'দেখো।' তিনি নাইট গাউনের কলার সরিয়ে দিলেন। আমিও হঠাৎ চক্ষু বন্ধ করে ফেললাম। একজন নারীর দেহ-সৌন্দর্য হারিয়ে যাওয়া কত বড় মর্মন্তুদ।

একটু পর মিসেস সুরিল সিগ্রেট নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। জানালার গরাদ গলিয়ে চাঁদের আলো উঁকি মারছিল। কাছেরই কোন কামরা থেকে মেগডোলিনার গানের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।'

হঠাৎই আমার ইচ্ছে হলো যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

পরের সপ্তাহে ফ্যাশনেবল পত্রিকাদির ভাষায় বলতে গেলে 'সোসাল এবং সাংস্কৃতিক ব্যস্ততার ধুম'-এর মতো 'আর্ট কালচারের' কাজে কাটল। মিসেস কুস্তেলু আর তাঁর বন্ধুদের সুন্দর, মুক্ত বাড়ী আর আলোয় ঝলমল ভ্রমণ আড্ডাগুলোতে চমৎকার দিন কাটল। সব-রকমের লোক---ইন্টেলেকচুয়েল---সাংবাদিক, লেখক, রাজনৈতিক নেতা মিসেস কুস্তেলুর বাড়ী আসতো। আর নানা রকম আলাপ আলোচনা চলতো। আমি তখন ইংরেজী বাক্‌চাতুর্যে তাদেরকে

বাচাল করে তুলতাম। তারপর রাত্রে ওয়াই ডব্লুতে ফিরে এলে টেবিলের চারদিকে পাঁচটি মেয়েই জাঁকিয়ে বসে আমার কাছে সারা দিনের কাহিনী শুনতো।

'আশ্চর্য' রোজা বললো। 'আমরা এ শহরের অথচ আমরা জানিনে এখানে এমন আলেফ লায়লা কাহিনীর পটভূমি পড়ে রয়েছে।'

'এই যারা বড়লোক হয় তারা এতো টাকা দিয়ে কি করে?' এমিলিয়া জিজ্ঞেস করে।

এমিলিয়া স্কুলে পড়ায়। রোজা এক সরকারী অফিসে স্টেনো-গ্রাফার। ম্যাগডালিনা আর বার্ণার্ডা এক মিউজিক কলেজে পিয়ানো আর ভায়োলিনের উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছে। এরা সবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

রোববার সকালে কারমিন বাইরে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। কি যেন বের করবার জন্যে আমি আলমারীর কবাট খুলতেই হঠাৎ উপর থেকে একটি উলের খরগোস নিচে পড়ল। আমি সেটা উপরে তুলতে গিয়ে দেখি আলমারীর ছাদে অনেক খেলনা রয়েছে।

'এসব আমার ছেলের খেলনা।' কারমিন প্রসাধন-টেবিলে চুল ঠিক করতে করতে বলল।

'তোমার ছেলে?' আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আর আমি বড় করুণ চোখে ওর দিকে তাকালাম। কারমিন বিয়ে না করেই মা হয়েছে? আয়নায় আমার অভিব্যক্তি দেখে সে আমার দিকে তাকাল। মুখ আরক্ত হয়ে উঠল তার।

'তুমি ভুল বুঝেছ।' বলে সে খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর সে আলমারীর নিচের দেরাজ থেকে হালকা নীল রঙের জমকালো বেবী বুক বের করল। দেখো আমার শিশুর জন্মদিনের বই। যখন সে এক বছরের হবে তখন সে এমন করবে। যখন দু'বছরের হবে এসব বলবে। এতে ওর ছবি ছাপাব।'

সে আলতো ভাবে পালঙ্কে বসে পড়ল। এবং সেই বই থেকে বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর আমেরিকান শিশুদের ছবি মেলে ধরল।

'দেখো, আমার নাক কেমন সরু। আর নিকের নাক তো আরো সুন্দর। এমতাবস্থায় আমাদের কী অপরূপ শিশু হবে কল্পনা করতে পার? আমি ওর জন্মের এক মাস আগে থাকতে এসব ছবি দেখব যাতে ওর প্রভাব পড়ে চেহারাটা আরো সুন্দর হয়।'

'তুমি তো বদ্ধ পাগল দেখছি। আর এই নিক মহোদয় হলেন কে?'

ওর রঙ একেবারে সাদা হয়ে গেল।

'দোহাই ওর কথা বলো না। ওর নাম নিলে মনে হয় আমার কলজেটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

অথচ তারপর থেকে বরাবর সে নিকের আলোচনা করতো। 'আমি এত অসুন্দর অথচ নিক বলে, কারমিন---কারমিন, তোমার প্রাণের সাথে,---তোমার মস্তিষ্কের সাথে, এমন কি তোমার আত্মার সাথে আমার প্রেম। নিক জগতে কতকিছু দেখেছে। কত মেয়ের সাথে ওর বন্ধুত্ব। কিন্তু ওর চোখে আমার সৌন্দর্যহীনতা ধরা পড়ে না।'

গির্জা থেকে ফেরবার পথে, সমুদ্রের বেলাভূমিতে চলতে চলতে, ওয়াই ডব্লুর আস্তর খসা হলে কাপড় ইস্তিরি করতে করতে সে আমাকে তার এবং নিকের কাহিনী শুনিয়েছে। নিক ডাক্তার---হার্ট সার্জারির উচ্চশিক্ষার্থ বিদেশে গেছে। আর সে ওর জন্যে খুব পাগল।

রাত্রে মিসেস সুরিলের কামরা থেকে কারমিনের কাছে চলে এসেছি। কারণ, মিসেস সুরিল তাঁর মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। শোবার আগে আমি মশারি ঠিক করছিলাম। কারমিন ফের মেঝেয় এসে আসর জমিয়ে বসে পড়ল।

'নিক।' সে আরম্ভ করল।

'এখন কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

'জানিনে।'

তাকে চিঠি লেখ না?'

'না।'

'কেন?' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'তুমি খোদা বিশ্বাস করো?'

'এ ত বড় কঠিন প্রশ্ন।' আমি হাই তুলে বললাম। 'কিন্তু কেন তাকে চিঠি লিখছ না সে কথা তো বললে না?'

'আমার প্রশ্নের জবাব আগে দাও। তুমি খোদা বিশ্বাস কর কিনা।'

'হ্যাঁ।' আমি সহজেই একটা ফয়সালা করার জন্যে বললাম।

'আচ্ছা তাহলে তুমি খোদাকে চিঠি লেখ?'

সারা বাড়ীর আলো তখন নিভে গেছে। রাতের বাতাস আঙ্গিনা ভরে তুলেছে। কামরার দ্বারে লালফুলের পর্দা আন্দোলিত হচ্ছিল, আমি উঠে সেটাকে একপাশে সরিয়ে দিলাম।

'বড় সুন্দর পর্দা।' আমি পালঙ্কে যেতে যেতে মন্তব্য করলাম। কারমিন ওপাশ হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। আমার স্বর শুনেই উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল।

'আমি আর নিক একবার পাহাড়ী এলাকায় কয়েক শ' মাইল ড্রাইভ করে গিয়েছিলাম। শুনছ তো?'

'হাঁ, হাঁ, বলো।'

'পথিমধ্যে নিক বলল, চলো ডন রিমুঁর সাথে দেখা করে যাই। ডন রিমুঁ নিকের বাবার বন্ধু। আর পরিষদের মন্ত্রী। সবেই তিনি নিজের জেলার পাহাড়ী এলাকায় বাড়ী বানিয়েছেন। আমরা যখন তার কুঠির কাছে পেঁাছিলাম, সামনে দিয়ে সাদা ফ্রক পরা ছোট ছোট শিশুরা একটা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছিল। সেই দৃশ্য সারা জীবনে আমার কাছে স্বপ্নের মতো এক স্মৃতি। আমরা ভেতরে গিয়ে মিসেস রিমুঁর প্রতীক্ষায় এক সুসজ্জিত ড্রইং রুমে বসলাম। কেবিনেট মিনিস্টার বাড়ী ছিলেন না। ড্রইং রুম আর স্টাডি রুমের মাঝখানে যে দেওয়াল রয়েছে তাতে এক চৌকো কাচের কৌটাতে প্লাস্টিকের অনেক বড় একটি পুতুল সাজানো। কামরার পরিপাটির কাছে যা একেবারে বেমানান। আমরা এই রুচিহীনতায় মুচকি হাসলাম। এমন সময় মিসেস রিমুঁ বারান্দায় এলেন। তিনি আমাদের ঠাণ্ডা চা পান করালেন। এবং সারা ঘর দেখালেন। তাঁদের গোসলখানা কালো রং-এর আর অভ্যাগত রুমে সাধারণ বেড এবং লাল ফুলদান. টেপেস্ট্রি ঝালর দিয়ে ঢাকা। এসব দেখেশুনে নিক চুপি চুপি আমাকে বলল, 'অরুচির হদ্দ'। আর আমি মনে মনে বললাম, কোথায় অরুচি। আমি তো আমার ঘরের জন্যে এমন পালঙ্কই কিনে এর বিপরীত রং লাগাব। এরপর থেকে যখনি আমি আসবাবপত্রের দোকানের কাছ দিয়ে যাই সে কাপড় দেখলে আমার পা থমকে যায়। তাই চাকরি থেকে পয়সা বাঁচিয়ে এই দামী পর্দা কিনেছি।

'যখন আমি এক বিশেষ রেস্তোরাঁর কাছ দিয়ে যাই কাঁচের দেয়ালের পাশে টেবিল এবং তাতে সবুজ বাতি দেখি---তখন আমি একেবারে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। ওটায় আমি এক সন্ধ্যায় নিকের সাথে খেয়েছিলাম।'

আমার ঘুম আসছিল। আর নিকের কাহিনী শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমি মশারি নামাতে নামাতে বললাম, 'আচ্ছা এত

গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও নিকের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে না কেন ? এখনো কেন ধুঁকছো।'

দশ বছর ধরে এক দূরের দ্বীপে আমাকে বাবার সাথে থাকতে হয়েছিল। প্রথমত আমরা এ শহরে থাকতাম। যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে আমাদের ছোট্ট বাড়ীটি জ্বলে ছাই হয়ে যায়, আমার মা ও দুই ভাইও তাতে মারা পড়ে। শুধু আমি আর আমার বাবা বেঁচে-ছিলাম। বাবা এক স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। হঠাৎ তাঁর টি, বি হলো, তাই আমি তাঁকে সেই দুরান্তরের দ্বীপের সেনিটোরিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিলাম। সেনিটোরিয়ামে দেদার পয়সা লাগতো। তাই আমি কলেজ ছেড়েই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি নিলাম এবং আশপাশের জমিদারদের বাড়ীতে ট্যুশানি করতে লাগলাম। তবু ওখানে আরো অর্থের দরকার। তখন আমি আমাদের গ্রামে গিয়ে আমাদের বাগান বন্ধক রেখে এলাম। তবু বাবা ভাল হলেন না। আমি এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নৌকোয় চড়ে যেতাম এবং জমিদারদের বোকা ছেলেদের পড়াতে পড়াতে চুর হয়ে যেতাম। তবু বাবা ভাল হলেন না। নিকের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ আজ থেকে দশ বছর আগে ফিস্টোতে হয়েছিল, সে সময় যখনি আমি রাজধানীতে আসতাম আমাদের সাক্ষাৎ হতো। তিন বছর ধরে সে বিয়ের জন্যে তাগাদা করছে কিন্তু বাবার অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে আমি তাতে সায় দিতে পারলাম না, অথবা বাবাকে রেখে আমি এখানে আসতে পারতাম না। এ সময়েই নিক বাইরে গেল। তারপর বাবা যখন মারা গেলেন আমি এখানে চলে এলাম। এখন আমি এখানে চাকরি করছি। আগামী বছর ইউনিভার্সিটিতে থিসিসও দাখিল করে দোব। আমি বাবার সম্পত্তিটা বন্ধক থেকে ছাড়িয়ে নোব। নিক আমায় সাহায্য করতে চায়। কিন্তু আমি বিয়ের আগে এক পয়সাও নোব না। তাদের পরিবারের লোক বদমেজাজী এবং মতিচ্ছন্ন। একটা মেয়ের জন্যে আত্মসম্মানের প্রশ্নটাই বড়। আত্মমর্যাদা, স্বাবলম্বন এবং আত্ম-নির্ভরতা। যদি আমি কোন দিন বুঝি নিক আমাকে হেয় ভাবে—অথবা আমাকে—তুমি কি ঘুমিয়ে গেছ ?—আচ্ছা—গুড নাইট।

পরদিন সকালে কারমিন সবার আগে নাস্তার টেবিল সাজাতে গেছে। মিসেস সুরিল গ্রামে ফিরে যাচ্ছিল। তার ভাবী জামাতার সাথে সন্ধি হয়ে গেছে। জামাতাটি লাজুক যুবক। বারান্দায় ভিজা

বিড়ালের মতো বসেছিল। মেয়েদের অট্টহাসিতে পরিবেশ বড় উত্তরোল, আমিও বড় হাসি-ঠাট্টায় মেতেছি। বড় হালকা লাগছিল নিজেকে। এই হালকা সজীব সুন্দর অনুভূতির মুহূর্ত জীবনে কমই আসে। এবং এসে মাত্র অল্পক্ষণ থাকে। কিন্তু মুহূর্তগুলো বড় অমূল্য।

কারমিন তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে অফিস চলে গেল।

'আজকেও তুমি বিরাট বন্ধুদের দর্শনে গেলে তোমাকে জেপনিতে বসিয়ে শহরের অলিগলি ঘুরাবে।' মেগডোলিনা বলল।

'তোমার জন্যে এক ক্যাডিল্যাক এসেছে ভাই।' রোজা বলল। 'ক্যাডিল্যাক---উফ্‌ফো।' আবার সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি।

'তোমার জন্যে এমন সব দামী গাড়ী আসে যে উৎকণ্ঠায় আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।'

বার্ণার্ডা যোগ করল।

আমি মেয়েদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভ্রমণের ব্যাগ কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম, আমি সাবেক এম্বেসেডর ডন গার্সিয়া ডেল প্রিডিউসের ওখানে দু'দিনের জন্যে যাচ্ছি। উর্দি পরা শোফার কালো ক্যাডিল্যাকের দরজা বড় মোলায়েম করে বন্ধ করল। আর গাড়ী শহর পেরিয়ে সবুজ পাহাড়ের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে চলল।

পাহাড়ের এক লতাপাতায় ছাওয়া স্পেনীয় কায়দায় তৈরি ডন গার্সিয়ার বাড়ী। গাড়ী ফটকে থেমে যেতেই উপজাতি কাঠখোট্টা চাকরানী বেরিয়ে এলো। বাটলার এসে দরজা খুলল। হল ঘরের বারান্দায় ডন গার্সিয়া আর তার স্ত্রী ভোনা মারিয়া আমার প্রতীক্ষায় ছিল। সারা ঘর সাদা পাথরে মোজায়েক করা। সোনালী ফার্নিচার আর বেশী দামী আসবাবপত্রে সাজানো। এবং এমনতরো কামরা যে সবের ছবি লাইফ ম্যাগাজিনের রঙ্গিন পৃষ্ঠায় প্রেড ফার্নিচার বা ইন্টার ডেকোরেশন হিসেবে ছাপানো হয়।

কিছুক্ষণ পর ভোনা মারিয়ার সাথে উপরে গেলাম। সেখানে কাঁচের বারান্দার এক কোণে একটা ছোট দোলনায় মাস ছয়েকের একটা গোলাবী শিশু কাঁদছিল। বাচ্চাটিকে এত ভাল লাগছিল যে, আমি ভোনা মারিয়ার আধা কথা রেখে দোলনার কাছে চলে গেলাম। বড় সুন্দর, স্বাস্থ্যবান সজীব সতেজ কমবয়সী এক আমেরিকান মেয়ে সোফা থেকে উঠে আমার দিকে এলো। এবং মুচকি হেসে হাত এগিয়ে দিল।

'এ আমার বউ মা।'

ভোনা মারিয়া বলল।

আমরা তিনজন দোলনার চারদিকে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে আদর করতে লাগলাম।

দুপুরের লাঞ্চের টেবিলে আমেরিকান মেয়েটির স্বামীও এসে গেল।

'এ আমার ছেলে হুজে।'

ডন গার্সিয়া পরিচয় করিয়ে দিল।

হুজের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হবে। হালকা রঙের জামা আর সাদা পাতলুনে তাকে বেশ মানিয়েছে। অল্প বয়সী স্ত্রীর প্রতি সে খুব আকৃষ্ট। আর সন্তানটিকেও অত্যধিক স্নেহ করে। তাই সে বেশীর ভাগ তাদের কথাই বলছিল।

রাতে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে গেলাম। আসবাবপত্রে হাত রাখতে পর্যন্ত আমার দ্বিধা করতে লাগল। হঠাৎ আমার ওয়াই ডব্লুর আস্তরখসা দেয়াল, খাট, মশারি, মিসেস সুরিল আর হলের বদ রং চেয়ারের কথা মনে পড়তে লাগল।

দু'দিন পর প্রিডুস পরিবার আমার সাথেই রাজধানীতে ফিরে এলো। মা বাবাকে টাউন হাউসে পৌঁছে দিয়ে হুজে আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আবার ক্যাডিল্যাক স্টার্ট দিল। হুজে এবং তার স্ত্রী মাত্র দু' সপ্তাহ আগে আমেরিকা থেকে ফিরেছে। তাদের অনেক মালপত্র এখনো হাউসে পড়ে আছে। সেগুলো আনবার জন্য হুজে যাবে। হুজে শহরের সবচে বনেদী হোটেলের সামনে গাড়ী থামিয়ে দিল।

'এখানে কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি এখানে ছিলে না।'

'না। ডিয়ার হুজে। আমি ওয়াই ডব্লুতে থাকছি।'

'ওয়াই ডব্লু? গুড গড---আশ্চর্য! আচ্ছা, ওখানে চল। কিন্তু তোমার কি এখানে জায়গা মেলেনি? তোমার উচিত ছিল এসেই ডেডিকে খবর দেয়া।'

এসময় হঠাৎ আমার মনে হলো আমি সবশ্রেণীর এবং সব রকম লোকদের এক বিশেষ মানসিকতার নিরিখে একই সমতলে এনে উপস্থাপিত করছি। কিন্তু হুজে এবং তার পরিবার এ দেশের আর দশজন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। এসব লোকদের একথা বুঝানো একেবারেই অবান্তর যে, ওয়াই ডব্লু আমার কেন এত ভাল লাগল।

হুজে গলির মোড়ে এসে গাড়ি থামাল। আমি যখন ওয়াই ডব্লুর ভেতরে পৌঁছলাম সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি চুপি চুপি

যেয়ে মশারিতে ঢুকলাম। কারমিন আর দিনের মতো চত্বরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর সিথানে গলির মিটমিটে বাল্বের আলো ঝলমল করছে।

সকাল চারটেয় উঠে আমি নিঃশব্দ পায়ে ভাঙ্গাচোরা গোছল-খানায় গিয়ে আস্তে করে নল খুললাম। কিন্তু পানি এত জোরসে পড়তে লাগল যে, আমি চমকে উঠলাম। হাতমুখ ধুয়ে চুপি চুপি কামরায় এসে আসবাবপত্র বাঁধলাম যাতে করে কারমিনের ঘুম নষ্ট না হয়। অথচ এরি মধ্যে চেয়ে দেখি সে আর চত্বরে নেই। কিছুক্ষণ পর এসে বলল, 'নাস্তা প্রস্তুত।' সে ট্যাক্সির জন্যেও ফোন করে দিয়েছে।

'কেমন হলো সফর।'

সে চা ঢালতে ঢালতে বলল।

'বড় ভালো।'

'তোমার এসব বন্ধুরা কারা যাদের কাছে তুমি গিয়েছিলে? একটুও তো বললে না।'

আমি কথা শুরু করছিলাম। এমন সময় একটা কিছু মনে হতেই দৌড়ে গিয়ে স্যুটকেস খুললাম। বেনারসী শাড়ীটি বের করে কাগজে লিখলাম 'তোমার বিয়েতে আগাম উপহার।' তারপর শাড়ী ও কাগজ কারমিনের বালিশের নিচে রেখে দিলাম।

'ট্যাক্সি এসে গেছে।'

কারমিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল।

আমি ট্যাক্সিতে বসলাম। এমন সময় কারমিন ফটকের খিড়কী দিয়ে মাথা গলিয়ে চিৎকার করে বলল ঃ

'আরে তুমি তো ঠিকানা দিয়ে গেলে না।'

আমি হঠাৎ টুকরা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলাম। আবার আমার হঠাৎ এক বিশেষ দরকারী কাজ মনে পড়ে গেল।

'একেবারে হদ্দ করে দিয়েছি। কারমিন, তোমার ওয়াই ডব্লু তো বিল দিল না।'

'অযথা বকো না।'

'আরে, এ তো তোমার বাড়ী না।'

'তুমি তো আমাদের মেহমান ছিলে?'

'বাজে বকো না।'

'তুমি নিজেই বাজে বকছ। এখন ভাগো---নয়তো প্লেন হারাবে। আর শোনো, আমি যখন বিয়ের কার্ড পাঠাব তোমাকে আসতেই হবে। কোন ওজর আপত্তি শুনব না। ভেবে দেখো, নিক তোমাকে দেখলে কত খুশী হবে।'

অথচ আমরা দু'জনেই জানতাম এত দূরে এসে আর আমাদের দেখা হবে না।

ট্যাক্সি শেষ রাতের আবছা আলোতে এয়ার পোর্ট রওনা হয়ে গেল। প্লেন তৈরি হয়ে আছে। আমি কাস্টম কাউন্টার থেকে ফিরে এলে পেছন থেকে ডন গাসিয়ার আওয়াজ এলো।'

'নিক, আমি কিছু সিগ্রেট নিয়ে নি।'

'আচ্ছা ডেডি।'

এটুকু হুজের আওয়াজ। আমি চমকে পেছনে তাকালাম। হুজে মুচকি হেসে আমার দিকে এগোল।

'দেখলে কেমন ঠিক সময় এসে গেছি।'

'নিক', আমি মনের গভীরে ডুবে গিয়ে বললাম। 'তোমার অন্য নাম কি?'

'নিক'। ডেডি যখন আদর করে ডাকেন তখন নিক বলেন। নইলে সবাই 'হুজেই ডাকে কেন বল ত?'

'না। কিছু না।' আমি তার সঙ্গে লাউঞ্জে চললাম। 'তুমি আমেরিকা কী করতে গিয়েছিলে?'

'হার্ট সার্জারিতে স্পেশালিস্টে হওয়ার জন্যে। তুমিতো জানই। কেন বলত?'

'তুমি---কখনো তুমি-----তুমি।'

'কী বলছ? কি হয়েছে? কি?'

'না। কিছু না।' আমার স্বর ডুবে গেল।

লাউড স্পীকার বার বার ঘোষণা করতে লাগল, 'প্যান আমেরিকার ভ্রমণকারিগণ, প্যান আমেরিকার ভ্রমণকারিগণ.....।'

'আরে, সময় যে আর নেই।'

হুজে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল। ডন গাসিয়া সিগ্রেট কিনে হাসতে হাসতে আমার দিকে এলেন। আমি উভয়কে খোদা হাফেজ জানিয়ে আরোহীদের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চলন্ত প্লেনের খিড়কী দিয়ে আমি তাকালাম, ডন গাসিয়া আর নিক রেলিং-এ দাঁড়িয়ে রুমাল দোলাচ্ছে। আর প্লেন ক্রমে উপরে উঠছে।

এখান থেকে অনেক দূর ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা পরিবেষ্টিত পূর্ব সমুদ্রের এক দ্বীপ---যার নাম ফিলিফাইন। এবং তার সদাজাগ্রত রাজধানী ম্যানিলার এক জৌলুষহীন মহলের এক ভগ্ন বাড়ীর ভেতর এক সরু নাকের এক ফিলিপাইনী ফেরেশতা মেয়ে থাকে। সে তার সন্তানের জন্যে খেলনা জমাচ্ছে। আর তার প্রেমিকের প্রত্যাবর্তনের দিকে চেয়ে আছে। যার আগমন সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

মাসিক পূবালী ১৯৬৪ ইং। উর্দু নক্‌শ্ থেকে অনূদিত

আনোয়ার খাজা

ডোঙ্গা এবং নাথিয়া গলির মধ্যবর্তী নালার উপরের পুলটা আবার ভেঙ্গে গেল।

ক'দিন থেকে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি। সে জন্য পাহাড়ী নালাগুলো বড় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। মনে হয় সড়ক, পুল এবং সারাটা প্রান্তর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

জনকল্যাণ সমিতির তরফ থেকে সড়ক তদারক এবং মেরামতের জন্যে আহ্‌মদ খানের সাথে দু'জন সহকারী মুন্সী এবং জনা বিশেক মজুর ডোঙ্গাগুলিতে মোতায়েন করা হলো।

আহমদ খান পুল ভাঙ্গার সংবাদ পেয়ে মজুর-মুন্সীসহ পরদিন ভোরে পুলের কাছে পেঁছিল। সে অনুমান করল পুল সারতে এক সপ্তাহ লাগবে। তাই সড়ক ছেড়ে একটা উঁচু জায়গায় ডেরা বানিয়ে নিল। সেখানে আগে থাকতেই বন-বিভাগের ফরেস্টারের জন্যে গোটা দুই কুটির তৈয়ার করা হয়েছে। তাছাড়া অঞ্চলটাকে প্রাচীন দেবদারু এবং চিল বৃক্ষরাজী মাথা তুলে ঘেরাও করে রেখেছে।

পুল মেরামতের কাজ দ্রুত চলছিল। আর সবাই আশঙ্কাও করছিল আবার নাকি বর্ষা নামবে। বর্ষা ছাড়া বরফপাতও হয় এখানে। যদিও নভেম্বর মাস, কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় ঋতু বদলের কোন নিয়ম নেই। নানা দুর্যোগের চিন্তা করে আহমদ খান মজুরদের জন্যে এক সপ্তার আগাম খানা-পিনা এনে তুলেছে ডেরায়।

পরদিন সবাই সাত-সকালে জেগে উঠল। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে সাদা মেঘখণ্ডের আনাগোনা। যেন সাদা কাফন-ঢাকা শব আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। চতুর্দিকে এক মৃত্যু-শীতল নীরবতা। পাখীরা পর্যন্ত নীড়ে নীড়ে নিশ্চুপ। চিলের লম্বা লম্বা সবুজ পাতাগুলোও নড়ে না। মনে হয় একটু বাতাসও নেই।

আবহাওয়ার এই অবস্থা দেখে সবার চক্ষু স্থির। মজুররা দিনভর নুয়ে নুয়ে কাজ করছে। মাঝে মাঝে তাদেরকে সেই অজানা আশঙ্কা দোলা দিয়ে যায়। আসন্ন বাদল যেন তাদের ঘাড়ে তলোয়ার নিয়ে জল্লাদের মত দাঁড়িয়ে আছে। এমনি ভয় শঙ্কায় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। এবং সন্ধ্যা হতে না হতেই কালো মেঘের ঘনঘটা চারদিক থেকে ঘিরে আসতে লাগল। এবং মুহূর্তের মধ্যে সারাটা আকাশ ছেয়ে গেল। তারপর সারাটা বিশ্বচরাচর নিরন্ধ্র অন্ধকার। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ চিল দেবদারু পাতার সাথে মাথা কুটতে লাগল। আহমদ খান ও তার মজুরদের সব কিছু যেন হিম হয়ে আসতে লাগল। একটানা একটা ভয়াল ধ্বনি পৃথিবীকে মুখর করে তুলল। তারপর বাতাসের তোড়জোড় যখন কমে এলো তখন শুরু হলো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। আবার আরম্ভ হলো শিলাবৃষ্টি। এমনি আধ রাতের পর বরফ জমে জমে যেন তূলার স্তূপ হলো। আর সকাল হতে হতে আকাশ-মাটি আর দূর-দূরান্তের বস্তি-টিলা এবং চিল-দেবদারু সবি একাকার শুভ্র।

সকালে যখন রৌদ্র উঠল সবাই একটু পুলকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপর চার পাঁচ দিন তেমনি বর্ষণমুখর ভাবে গত হলো। বরফ জমে জমে সব দিকের রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। আর ওদিকে তাদের কাছে মাত্র তিন চার দিনের খাবার উপকরণ আছে। এজন্যে আহমদ খান মজুরদের নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল খাদ্যের ব্যাপারে খুব নিয়ন্ত্রণ এবং মিতব্যয়িতা মেনে চলতে হবে। আহমদ খান আরো পরামর্শ দিল, এই খাবার বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে হলে বুনো খরগোস ইত্যাদি শিকার করতে হবে। আহমদ খান এবং মুন্সীদের কাছে তিনটে বন্দুক এবং শতাধিক কার্তূজ---তাই নিয়ে চতুর্থ দিন তারা খরগোসের তালাশে বিপজ্জনক পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে অনেক দূরে চলল। রাত্রে যখন তারা ফিরে এলো, থলেতে প্রায় ত্রিশটা খরগোস। সে রাতে তারা চিলের শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বেলে তাতে খরগোস ভুনে বড় মজা করে খেল। এবং আগুনের মিষ্টি তাপে বসে বসে একে অপরকে প্রেম, বীরত্ব এবং যতসব আজগুবি গল্প শোনাল।

পরদিন আহমদ খানের খুব সর্দি দেখা দিল। সূর্য যখন পাহাড় অতিক্রম করে সমতলে উঁকি দিল, আহমদ খান দেখল মুন্সী এবং

মজুরেরা খরগোসের স্বাদে ভুলে গেছে আর আজও বড় ঘটা করে শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আহমদ খান নিজের অক্ষমতা জানাল। মুন্সী দু'জন চেয়েছিল তারাও আহমদ খানের কাছে থেকে তার দেখাশোনা করবে। কিন্তু আহমদ খান তা মানল না। তাদের দু'জনকেও মজুরদের সাথে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একেবারে একা রয়ে গেল। বিদায় কালে মজুরদের আনন্দ-উল্লাস দেখে আহমদ খান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে র'ল কতক্ষণ। আর মনে মনে ভাবল, গরীবদের ভাগ্যে এই আনন্দ আর অবসর জীবনে কবার আর আসে ?

তাদের চলে যাবার পর রোদ আরো প্রখর হয়ে উঠলো। আহমদ খান পায় পায় কিছুদূর এগিয়ে এসে পড়ে থাকা পাতাওয়ালা চিলের একটা ডাল দেখে বসে পড়ল। রোদ বড় মিষ্টি লাগছিল। সারাটা দৃশ্য পরম রমণীয়। প্রিয়ার সান্নিধ্যের কথা মনে পড়ে যায় আহমদ খানের। কিছুক্ষণ বসে ডেরায় ফিরে এলো সে। গরম চা বানিয়ে পান করল। মাফলার দিয়ে গলা এবং কান বন্ধ করে নিল। বাড়ন্ত রোদের তীব্রতা রোধ করার জন্যে কালো চশমাও লাগাল চোখে। তারপর ছড়ি দোলাতে দোলাতে আবার সেই চিলের পাতায় এসে বসল। সামনে বিরাট পাহাড়। সূর্যের সোনালী কিরণ পাহাড়ের গা বেয়ে কেমন তির্যক হয়ে পড়ছে সমতলে। নালাগুলো দিয়ে যেন সোনা গলে গলে বয়ে যাচ্ছে। আর যেখানে রোদ পড়ে না সেই ঝর্ণা দেখে মনে হয় রূপা গলে গলে ঝরছে। এ রকম মনোরম দৃশ্য দেখে আহমদ খানের বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। পায় পায় এগিয়ে চলল। ক'টা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে একটা পড়ো পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াল সে। একটু শ্রান্ত হবার জন্যে সেটার উপর বসেও পড়ল। তারপর চারদিকে তাকাল। দু'টা পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ নেমেছে। আর তার প্রান্তসীমায় সোনালী কিরণ ঝালর মেলে ধরেছে। আধ ঘন্টা বসে থাকার পর সামনের টিলার দিকে তাকাল সে। তা' উঁচু, প্রশস্ত এবং নিরাপদ। কিন্তু কি ভেবে আর এগোতে ইচ্ছে করলো না তার। ফিরে এসে ডেরার কাছে সেই চিলডালে বসে পড়ল আবার। তারপর অনেক সময় গেলে হঠাৎ খেয়াল হলো তার পকেট থেকে কি কাগজ নিয়ে পড়তে যেয়ে তন্ময় হয়ে আছে সে। এমনি করে আরো কিছুক্ষণ কাটলো। হঠাৎ তার কাঁধে কার যেন স্পর্শ লাগল। সে ভাবল, মুন্সী মুরাদ হবে হয়ত। কোন রকম

আড়াল নেই তাদের মধ্যে। হলোই বা, কিন্তু এত সকাল কি করে এলো তারা ?

---'আরে মুরাদ, তোমরা এত জলদি কি করে এলে ?

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দেবার বদলে লোমশ হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরতে লাগল। আর থেকে থেকে বিটকেলে শ্বাস-ধ্বনি করতে লাগল। সে কাগজ থেকে তবু মাথা উঠাল না।

---'এ কি ইয়ার্কী হচ্ছে শুনি ?'

কিন্তু মুরাদের পক্ষ থেকে এবারেও যখন কোন জবাব এলো না, ফিরে দেখলো আহমদ খান। হঠাৎ এক ভয়াল বিভীষিকায় তার রক্ত জমে গেল। কিছু না ভাবতেই তার পেটেও লোমশ থাবা এসে পড়ল। সে ফিরে ভাল করে দেখতেও পারলো না। শুধু বুঝল, এ মুরাদের হাত নয়, মানুষখেকো হিংস্র জন্তুর থাবা। কিন্তু ভয়ে সে তখন একেবারে নীল হয়ে গেছে। সব অনুভূতি লোপ পেয়ে গেছে যেন তার।

তবু একটা চিৎকার দিয়ে এক লাফে দু'গজ দূরে যেয়ে সিটকে পড়লো সে। ভালুক। কালো লোমশ জন্তু। রক্তচোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আহমদ খান ডেরার দিকে তাকাল। দরজাটা আধ-খোলা। হাতের ছড়িটাও কোথায় সিটকে পড়েছে কে জানে ? আহমদ খান ভালুকের দিকে তাকাল। ভাবল, এখন এই ভালুক থেকে বাঁচবার জন্যে একটি মাত্র উপায় রয়েছে। দৌড়ে গিয়ে ডেরায় পৌঁছে দরজা লাগিয়ে দেওয়া। ভালুক কিন্তু তার মতলব বুঝে ফেলেছে। আর অমনি এসে সাপটে ধরল তাকে। ভালুক আস্তে আস্তে বন্ধন সংকুচিত করতে লাগল। আহমদ খানের মনে হলো সে যেন পিষে যাচ্ছে। পাঁজরটাও চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তার শ্বাসও বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু ভালুক তার বন্ধন শিথিল করে দিল এবার। তারপর ধাক্কা দিয়ে বরফের উপর ফেলে দিল। ঠাণ্ডা বরফের স্পর্শে---সব কিছু জমে যাচ্ছিল তার। এরি মধ্যে আহমদ খান বুঝতে পারলো ভালুক তাকে প্রাণে মারতে চায় না, বরং তাকে নিয়ে খেলা করতে চায়। এবং এতেই হবে তার কষ্টকর মৃত্যু। কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে শাণিত নখ দিয়ে ভালুক তাকে ক্ষত করতে

শুরু করল এবার। তারপর দ্বিতীয় বার তাকে বাহু বেষ্টন করে নিল। বন্ধন যখন কাঁধে ওঠে আহমদ ভাবে এই বুঝি শেষ হয়ে গেল সে।---কিন্তু যখন শিথিল করে দেয়, ছাড়া পাবার চেষ্টা করে না আর। ভালুক দেখল তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত পড়ছে। দেখেই আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা খোশ ধ্বনি করল। তার এ খেলা ভারী পছন্দ হয়েছে। তাই আহমদ খানের চেহারাকে আরো রক্তাক্ত করতে লাগল সে। কিন্তু রক্ত যখন ধারা নিয়ে ছুটল এ খেলা আর ভাল লাগলো না তার। কিন্তু আহমদ খান ততক্ষণ বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এলো। চোরা চোখে একবার চারদিকে তাকাল সে। ভালুকের উপস্থিতি অনুমান করার জন্যে শ্বাস টানল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আশ্চর্য, ভালুক কোথায় গেল? সে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখল। গজ বিশেক দূরে ভালুক বরফের উপর আঁটসে বসে দুষ্ট চোখে খুব অনুসন্ধিৎসার সাথে আহমদ খানের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আর মাঝে মাঝে এমন করে ডেরার দিকেও তাকাচ্ছে যেন কেউ প্রতীক্ষা করছে ওদিকে। আহমদ খান ভাবল, যদি সামান্যও নড়ি তো এই যমদূত ভালুক হাম হাম করে এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে থাকল। কিন্তু তার মনে হলো পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। আবার ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে সে সজ্ঞান হলো, অনুভব করলো ক্ষতগুলোর ব্যথা প্রতি পরতে পরতে বড় তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ডেরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হতভাগা মুন্সী-মজুরদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে সে অভিসম্পাৎ দিতে লাগল তাদেরকে।

এবার সে ডেরার দিকে একটা দৌড় দেবার উপক্রম করল। কিন্তু বজ্জাত ভালুকটা পথের মাঝখানে। আর যেই তার মতলব বুঝে ফেলল অমনি আবার এসে লাফিয়ে পড়ল। আবার চলল হিংস্রখেলা। তারপর যখন সে আবার অচেতন হলো, ভালুক বুঝলো মরে গেছে সে। তাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল ভালুক। আহমদ খান আবার চোখ খুললু। এবারে ভালুক তার প্রতি অমনো-যোগী। শুধু ডেরার দিকে তাকাচ্ছে। বাঁচবার এই একটা শুভ

যোগ। সে মরিয়া হয়ে ডেরার দিকে এগোল। কাছে গিয়ে দেখলো দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে আহমদ খান বড় কৌশলে স্প্রিং লাগিয়েছিল। এবং বাইরে থেকে খুব কষ্টে দরজা খুলতে হবে। কিন্তু যেই সে খুলতে যায় ভালুক অমনি তাকে পাকড়াও করে বাধা দেয়। কাণ্ড দেখে আহমদ খান রীতিমত পাগল কুকুর হয়ে ডেরার চারদিকে দৌড়াতে লাগল আর ভালুকও খত্ খত্ করে তার পিছু ধাওয়া করতে লাগল।

এমন সময় আহমদ খান অনেক দূরে তার লোকজনকে দেখল। অমনি সে খুশীতে একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে হাত-মুখ মুচড়ে পড়ে গেল। তারপর একটা ধ্বনি এবং সম্মিলিত একটা কোলাহলে শুধু শোনা গেল, 'নিয়ে চল, ভেতরে নিয়ে চলো।'

তারপর একবার দ্রীম করে আরেকটা আওয়াজ হলো। তারপরই এক অখণ্ড নীরবতা। মুন্সী দু'জন চিলের পাতা পিষে ক্ষতস্থানে লাগাল। আরো নানা সেবা-যত্নের পর বিকেলের দিকে আহমদ খান যখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হলো, মুন্সী মুরাদ বলল,

—'আমরা যখন ভালুকটি মেরে আপনাকে ভেতরে নিয়ে এলাম, হঠাৎ আটা এবং খাবার মাল-মশলার কাছে একটা বিদঘুঁটে আওয়াজ শুনলাম। মুন্সী ফজল বন্দুক নিয়ে গেলে আরেকটা ভালুক তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু হাত চালিয়ে সে ভালুকটাকে গুলি মেরে সাবাড় করে দিল। তারপর আমরা চরম বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম, মেয়ে ভালুকটা আধভর্তি আটার থলেটায় চাল ঘি এবং ডাল ভর্তি করে একটা লতা দিয়ে মুখটাও সিলাই করে নিয়েছে।'

সব শুনে আহমদ খান হেসে বলল,

—'ঠিকই, বাইরে পুরুষ ভালুকটা পাহারায় ছিল, আর ভেতরে মেয়ে ভালুকটা খাবার মাল-মশলা সরাচ্ছিল। হয়ত আমাদের মতো তাদেরও চরম খাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়েছিল।'

মাহে নও, ফালগুন ১৩৭০ বাং

রীতা গুজরাল

রামলাল

সাহেব নতুন স্টেনোর কথা ভাবছিলেন। অবিশ্যি সে আজ বাস পায়নি। যে বাসে সে রোজ আসে, লোকের বড্ড ঠাসাঠাসি হয় তাতে। অনেক সময় দু'তিন স্টপেজ ছেড়েই বাস চলে যায়। চল্লিশ বছরের এই সুদর্শনা মহিলাকে তিনি প্রায়ই রিজ রোডের স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। ববকাটা ঘন কালো চুল আর কালো গগল্‌স্‌-এ সত্যি তাকে অপরূপ দেখায়। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা যাদু রয়েছে যে কেউ তাকে সমীহ না করে পারে না। অফিসে আসার সময় তিনি কতবার ভেবেছেন ওকে এক আধ-বার লিফ্‌ট্‌ দেবার কথা। কিন্তু প্রত্যেকবার ওই ভাবনা পর্যন্তই।

রীতা প্রথমদিকে তার সামনে আসতে তেমন সংকোচ বোধ করতো না। কিন্তু যখন সে টের পেলো যে, বড় সাহেব তার দিকে আজকাল বড় মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছেন, তখন না এসে পারলে আসতো না। ছুটিছাটা বা প্রমোশনের দরখাস্ত চাপরাসী বা পিয়নদের মারফতে পাঠিয়ে দিত। ভাবত এতেই যা হয় হবে। বড় সাহেব যথার্থ একজন দয়ালু অফিসার। রীতার কোন দরখাস্তেরই অমর্যাদা করেননি। ছুটিছাটা থেকে পদোন্নতি পর্যন্ত সব কিছুতেই তিনি ছিলেন উদারমনা। অবশ্য তা ছাড়াও রীতার প্রতি যে তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

রীতাকে দু'চারবার দেখার পরই তাঁর মনে একটা নূতন বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। না, আর নিঃসঙ্গ থাকা যায় না। অনেক বছরই তো হল স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেটি বিলেতে পড়াশুনা করছে। মেয়ের তো কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। বছর দু'বছর পর বাবাকে যা একটু দেখতে আসে। ছেলে-মেয়ে দুজনই দূরে দূরে। ধারে কাছে তার আর কে আছে? না, আর কতকাল নিঃসঙ্গ থাকা

যায় ? অনেকে অবৈধভাবে সম্পর্কাদি রেখে ইচ্ছা চরিতার্থ করে। নিঃসঙ্গতা দূর করে। কিন্তু তিনি ত আর তা পারেন না। সবাই জানে সারাটা জীবন তার এক উন্নত চরিত্রবল নিয়ে কেটেছে। রীতা গুজরাল সম্পর্কে তাঁর যে ইচ্ছাটা মনের সংগোপনে উঁকিঝুঁকি মারছে সেটা বৈধ খেয়াল। সামাজিক আইন এবং রীতা গুজরাল তাকে টুকু দেবে সে ততটুকুই চায়।

তিনি গভীর প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন যে, রীতা গুজরাল তাঁর প্রতি তেমন অপ্রসন্ন নয়। তাই হঠাৎ একদিন এক বিশেষ হুকুম জারী করে রীতাকে তাঁর পার্সনাল স্টেনো হিসেবে নিয়োগ করলেন। এরপর সে নীচে না বসে উপরের তলাতেই কাছাকাছি থাকবে এবং যখন ইচ্ছে তখন ডিক্‌টেশন দেয়া যাবে। এটা ভালোই হবে। রীতার স্বামী মারা গেছে দশ বছর হবে। কোন সন্তান নেই ওদের। স্বামী তার এ অফিসেই কাজ করত। তার মৃত্যুর পর তখনকার বড় সাহেব রীতার উপর দয়াপরবশ হয়ে স্বামীর স্থলে তাকে নিয়োগ করেন।

রীতা গুজরালের রদবদলের হুকুমটা একদিন আগেভাগেই করা হয়েছিল। তিনি জানেন এই হুকুমনামায় অন্যান্য অফিসারও সই করবেন। রীতা হুকুমনামাটিতে যে সই করেছে, সাহেব তা ঝুঁকে পরখ করে দেখছিলেন। একটা নীরব অধৈর্যে তার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল। কখন রীতা এসে 'গুড মর্নিং' বলে দাঁড়াবে তাঁর কাছে, সে প্রতীক্ষাই করেছিলেন তিনি।

রীতার রদবদলের খবরটা সারা অফিসে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। বয়সের দিক দিয়ে যদিও রীতা কোন কম বয়েসী ক্লার্কের বান্ধবী হতে পারে না, কিন্তু তার সাজগোজ এবং চলাবলা সকলকে আকর্ষণ করতো। এমতাবস্থায় অফিসের বড় বাবু যখন তাকে তাঁর পার্সনাল স্টেনো হিসেবে নিয়োগ করেছেন, এটা স্বভাবতই একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। সারাটা দ্বিতল রীতা গুজরালের আগমন প্রতীক্ষা করছিল।

ঘটনাক্রমে রীতা সেদিন অসুস্থা হয়ে পড়েছিল। অফিসে আসা আর হল না তার। পাশের বাড়ীর এক ক্লার্ক এক দরখাস্ত এনে বড় সাহেবকে দিল। সবাইর উৎকণ্ঠায় যেন পানি পড়ল। বড় সাহেবও সেদিন উদাস হয়ে রইলেন। অনেক ফাইল সই না করেই

ফিরিয়ে দিলেন। লাঞ্চের সময় রিক্রিয়েশন ক্লাবে গিয়ে গালগল্প করতেন তাও করলেন না। মোটকথা, অফিসময় একটা উদাসীনতা ছেয়ে গেল সেদিন।

দ্বিতীয়দিনের কাহিনী আর তেমন চমকপ্রদ নয়। বরং তার পরের দিনেরও না। কারণ, রীতা গুজরাল তার নতুন চেয়ারে আসন নিয়েছে এবং স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে রোজ সবার সামনে দিয়ে অফিসে আসে। হঠাৎ এ রদবদলের কোন প্রতিক্রিয়াই হল না তার মনে। দু' তিন বছর আগে যেসব কাপড় পরে অফিসে আসতো এখনও সে সব মামুলী কাপড় তার পরনে। অফিসের লোকেরা যখন দেখল বড় সাহেবের ছলাকলা কিছুই তাকে বাগাতে পারল না, তখন তারা ভাবলো, আসলে রীতাকে রদবদল করার পেছনে তাদের ধারণাটা ভুল। বড় সাহেব মোটেই সে ধরনের লোক নন। আজ এত বছর তিনি এ অফিসে কাজ করছেন, কই কোন খারাপ কথাতো শুনা যায়নি তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু এদিকে রীতাকে তার মনের কথা জানাবার জন্যে অনেক বাহানা করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই সফলকাম হতে পারলেন না। রীতা গুজরাল চিরদিনের মতই নীরব-নির্বিকার। বড় সাহেবের সাথে একটা ফালতু কথাও বলতো না সে। সাহেব কোন দোষ বের করে দেখালে অমনি সে মাথা নত করে মেনে নিত। একটু মুচকি হাসিও হাসতো না কোন সময়, যেমন করে কাজ বাগিয়ে নেবার জন্যে অনেক ধূর্ত মেয়েরা এ মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করে থাকে।

রীতার সাথে খোলাখুলি কথা বলার জন্যে তিনি তাকে অনেক সময় গাড়ীতে লিফ্‌ট্ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারেই রীতা 'ধন্যবাদ' বলে কেটে পড়েছে।

অবশেষে তিনি এক অদ্ভুত চাল চাললেন। পত্রিকায় বিয়ের বিজ্ঞাপন দিলেন, সরকারী অফিসে কর্মরত একজন অর্ধবয়েসী ভদ্রলোকের জন্যে মানানসই শিক্ষিতা মেয়ে চাই। বিধবাদের আবেদন অগ্রগণ্য হবে।

বিজ্ঞাপনে নিজের নাম-ঠিকানা সব কিছু গোপন রাখলেন। যে দিন বিজ্ঞাপন বের হল চারদিকে, লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে টেবিলে ফেলে রাখলেন। ভাবলেন, লাঞ্চের সময় রীতা অবশ্য এটা দেখে নেবে।

এবারে তার পরীক্ষার পালা। রোজ পত্রিকা অফিসে যেয়ে খোঁজ নেন। অনেক শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মেয়ের চিঠি আসে। কিন্তু যার প্রতীক্ষায় তিনি অধৈর্য হয়ে আছেন তার কোন সাড়া নেই। ফলে রীতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরো বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর মনে হল রীতাকেই তিনি গভীর করে ভালবাসেন এবং তাকে নিয়েই তাঁর সুখ রচনা হতে পারে। অথচ রীতার পক্ষ থেকে অসহ্য নীরবতা।

রীতার এই নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার থাকার দোষে হঠাৎ বড় সাহেব তাকে বদল করে অন্য লোককে তাঁর নিজের কাজে নিয়োগ করলেন। রীতাকে বদলানোর জন্যে তার পুরনো কাগজপত্র থেকে অনেক দোষত্রুটি খুঁজে বের করলেন। রীতাকে তাঁর কাছ থেকে বিদায় দিয়ে একপাল কেরানীর মাঝখানে বসতে দিয়ে তিনি যেন জেদ মেটালেন। তিনি ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যান, একটা মেয়ে পুরুষ ছাড়া এতদিন কি করে থাকতে পারে ?

একদিন একজন জুনিয়ার অফিসারের কেবিনে রীতার হাসির আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। রীতার দুর্লভ হাসি শেষ পর্যন্ত এ অফিসারটির ভাগ্যে জুটল কি করে! আশ্চর্য!

এরপর থেকে বড় সাহেব এদের দু'জনের প্রতি একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। অনেক অনুসন্ধান করেও যখন তাদের কোন কিছু দোষ বের করা গেল না, তখন সাহেবের জেদ আরো বেড়ে গেল। তিনি জেদ চরিতার্থ করার জন্যে সে অফিসারটিকে অন্য শহরে বদলী করে দিলেন।

এরপর উত্তরোত্তর তাঁর ক্রোধ বেড়েই চলল। আজকাল আর অফিসের কোন লোকের প্রতিই তিনি প্রসন্ন নন। অফিসের আইন-কানুনের লাগামকে তিনি আরো কষে টেনে ধরলেন। পিয়ন-চাপরাসী-দেরকে কথায় কথায় সাজা দিতে লাগলেন। আজকাল রীতার প্রতি তাঁর বড় একটা খেয়াল নেই। তবে রীতার সাথে যে সব লোকের একটু বেশী ওঠাবসা ছিল, তাদেরকে তিনি বিভিন্ন অফিসে বদলি করে দিলেন। অবশ্য রীতাকে কোথাও বদলি করলেন না। এভাবে রীতাকে তার জেদ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সব রকম কঠোরতাই মহিলাটি বেমালুম হজম করে চলল। দিন এমনি চলতে লাগল।

রীতার দাঁতে দেখা দিল পাইওরিয়া। তা নিয়ে অনেকবার দুর্ভো-গের পর সব দাঁতগুলো ফেলে দিল সে। দাঁত ফেলে দেওয়াতে তার

চেহারাটাই পাল্টে গেল। গাল চোয়াল ভেঙ্গে গেল। নকল দাঁত লাগানোতে গলার স্বরও অন্য রকম শোনাতে লাগল। মাথার চুলও মাঝে মাঝে পাক ধরেছে।

বড় সাহেব রীতা গুজরালের এ বেশ দেখে বিস্মিত হয়ে যান। কোথায় গেল তার সে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য? তার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি এক সময় প্রেম-বোকামিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবং তাতে সফলকাম না হতেপেরে অযথা অনেক লোককে সাজা দিয়েছেন। আজ এসব ভেবে তাঁর অনুতাপ হয়। জীবনের অনেকদিন চলে গেছে। বুড়িয়ে গেছেন রীতিমত। কোন সুন্দরীকে দেখে শিহরণ জাগার মত আজ রক্তে সে রকম উষ্ণতাও আর নেই। আজকাল অফিসের লোকদের প্রতি আর তেমন রোষ নেই তাঁর। ছুটিছাটা এবং প্রমোশনের ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করেন না, রাগের বশে যাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন পুনরায় তাদেরকে এনে পোস্ট ক্রিয়েট করে চাকরি দিলেন। এই বুড়ো বয়সে তাঁর উপর কারো মনে যেন খারাপ ধারণা না থাকে, সেজন্য তিনি যারপর নাই চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

এতো করলেন কিন্তু রীতা গুজরালকে প্রমোশন দিতে পারলেন না। কারণ, রীতা নিজেই এত অলস এবং নিষ্কর্মা হয়ে পড়েছে, তার পক্ষে আর যে কোন প্রমোশন পাওয়া তো দূরের কথা নিজের পজিশন ঠিক রাখাই দায়।

মোটেই সে বেশী পরিশ্রম করতে পারে না আজকাল। দিনভর দু'চার পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারে বড় জোর। অথচ নূতন টাইপিস্টরা স্বচ্ছন্দে বিশ বাইশ পৃষ্ঠা টাইপ করে ফেলে।

তারপর একদিন বড় সাহেবের রিটায়ার্ড হবার দিন এলো। সাহেবকে বিদায় জানানোর জন্যে জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো।

ছুটির দু'ঘন্টা আগেই অফিস শেষ করে দেয়া হল। সব লোক সামিয়ানার নীচে এসে বসল। ফুলের মালা দিয়ে বড় সাহেবকে একেবারে ডুবিয়ে ফেলা হল। বহু রকম ইনিয়ে বিনিয়ে তাঁর গুণপনা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে বড় আবেগময় বক্তৃতা দেয়া হল। এসব শুনে শুনে বিদায়ী মেহমানের বুকও অশ্রুজলে ভেসে যেতে লাগল।

কান্নাকাটির শেষ পর্যায়ে একজন তরুণ অফিসার দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিদায়ী শোকের করুণ রস অনেক হলো। কান্নাকাটি মোটেই ভাল নয়। কাঁদতে অনেকেই পারে, হাসতে ক'জন পারে? আমরা না কেঁদে বরং হাসি-খুশির মাধ্যমে বড় সাহেবকে বিদায় দিতে চাই। এ কান্নার পরিবেশটা পাল্টে দিতে পারেন এমন কেউ আছেন? কে পারেন বড় সাহেবকে হাসাতে?'

একথা শুনে সব লোক একে অপরের মুখ দেখতে লাগল। কে পারে বড় সাহেবের সাথে হাসি-মজা করতে। অবশেষে বাধ্য হয়ে তরুণ অফিসারটি আবার বললেন ঃ 'একাজের জন্যে অফিসের সবচেয়ে প্রবীণাকে আমি অনুরোধ করব। আমি নিশ্চিত জানি, তাঁর রসিকতা কারোরই কোন মর্যাদায় বাধবে না।'

সবারই দৃষ্টি এক সঙ্গে রীতা গুজরালের দিকে যেয়ে নিবদ্ধ হলো। যুবক ক্লার্করা 'মাম্মী মাম্মী' বলে হল্লা করে উঠল। রীতা দাঁড়িয়ে গেল। কি বলে সে ক্রন্দমান বড় সাহেবকে হাসাবে, সে চিন্তায় তার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। স্টেজে দাঁড়িয়ে সে চারদিকে ইতিউতি করল। তারপর কি মনে করে এমনি চেয়ে অফিসের দিকে গেল। অফিস থেকে যখন সে ফিরে এলো হাতে একটা খাম। হাতে খাম দেখে সবাইর চোখ চড়ক গাছ। আসলে সে কি জাতীয় কৌতুক করবে কে জানে?

রীতা গুজরাল খামটা খুলে একটা কাগজ বের করল তা থেকে। কাগজটাতে টাইপ দিয়ে তৈরী বড় সাহেবেরই একটা কার্টুন জাতীয় ছবি। ছবির নীচে লাল পেন্সিলে দাগানো একটা খবরের কাগজের কাটিং। রীতা গুজরাল একটু হাসবার চেষ্টা করে মাইকের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আসলে এ হচ্ছে আমার বোকামি, অপরপক্ষে বিদায়ী মেহমানের জন্যে রসিকতা যা এককালে আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছিল। হয়ত আজ তিনি সে সব ভুলে গেছেন। তাই তা মনে করিয়ে দেবার জন্যে এ উপঢৌকন তাঁর খেদমতে পেশ করছি। যদিও কালের ব্যবধান সে সব স্মৃতিকে আজ বোকা বানিয়ে দিয়েছে। যা নিয়ে এখন শুধু হাসিঠাট্টাই চলে।

সাপ্তাহিক ললনা, ১৯৬৮ ইং

আবু সাইদ কোরায়শী

'খো ভাই'

একটা অতীত স্মৃতির সৌরভমাখা ডাক। একটা বেপরোয়া কাঠখোট্টা ধ্বনি। 'কে, শেরগুল নাতো আবার ?'

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমি কোথায় আছি। আমি কোথায় আর শেরগুল কোথায় ? আমাদের মধ্যে তো দুর্লংঘনীয় এক যুগের ব্যবধান। দীর্ঘ বার বছর আগের একটা দুর্ঘটনা চিরতরে আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর আমাদের আজাদী সংগ্রামের নানা চড়াই-উৎরাই আর বিপর্যয়ক্লিষ্ট এই মানুষ সমাজ---দিব্যি তেমনি নকল বাড়ী-ঘর, জিঘাংসা আর প্রতিশোধের আগুন আর শোণিতধারা বয়ে চলেছে অবিরাম। সে ধারায় কি শেরগুল বয়ে যায়নি ? আজ এত দিন পর, মনে হয় শেরগুল আদৌ কোনকালে ছিল কিনা তাইবা কে জানে।

শেরগুল বলত, পাহাড় যত দুর্গমই হোক না কেন, তার ভেতর দিয়ে একটা না একটা পথ বের হয়ে যায়ই।

আজ যদি শেরগুল বেঁচেও থাকে, পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি ভাবে আছে কে জানে। এখানে এতদিন পর শেরগুল আসবে কোত্থেকে ? এসব আমার মতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর না হয় কোথায় এক যুগ আগের বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া শেরগুল, আর এই যুদ্ধক্ষেত্র।

কিন্তু আবার সেই সুস্পষ্ট ডাক। আমি পেছন ফিরে তাকালাম।

'খো ভাই, তুমি আমারে চেন না ?'

'আরে তুমি ? তুমি কোত্থেকে ?'

'খো ভাইরে-----

তারপর আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে জড়াজড়ি করতে লাগলাম।

'কিন্তু তুমি দেখছি বুড়িয়ে গেছ শেরগুল লালু।'

হঠাৎ একটা নতুন খবর শোনার মত চমকে উঠল সে। চোখ ছানাবড়া করে বার বছর আগেকার মত করে দেখতে লাগল। মরা নদীতে বান ডাকার মত তার কুঁচকে যাওয়া চোখ মুহূর্তের জন্যে চিকচিক করে উঠল। 'সত্যি তোমাকে দেখে আজ মনে হয়, কতকাল পেরিয়ে এসেছি। মানুষই মানুষের আসল দর্পণ। কাঁচের তৈরি আয়না তো কোন দিন একথা বলেনি আমায়।

বলেই সে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা আয়না বের করে চারদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে। তারপর খবরটা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়ে বলল,

'সত্যি তো, এ হারামখোর তো বড় নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক। রোজ ওর দিকে তাকাই—কিন্তু কোন দিনই তো ও আমাকে একথা ঘুণাক্ষরে বলল না যে, তুই বুড়িয়ে গেছিস। এমন আয়নার গায় ঝাঁটা মারি, ওয়াক থু।'

মনের মেঘ কেটে গেল যেন তার। তারপর অনেক দূর থেকে কথা বলতে থাকল কিছুক্ষণ ধরে। বলতে বলতে এক সময় কাছে ঘনিয়ে এল। এবং উদ্দীপ্ত উজ্জীবিত হয়ে আমাকে বার বছর আগের মতই বাণী শুনাতে লাগল।

'পাহাড়কে দেখলেই বুঝা যায় সামান্য অণু-পরমাণুর কি ক্ষমতা! আর আকাশটা দেখে পাহাড়ের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

পাথর আর বন্ধুরতা দিয়ে পাহাড় পরিব্যাপ্ত।

নূরের এক ঝলকে পাহাড় জ্বলে সুরমা হয়ে গিয়েছিল, আর, আজ সে সুরমা সুনয়নার প্রসাধন সামগ্রী।

বীরত্ব এবং সাহস তখ্‌তে তাউসের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ।

জাতীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিনই কেউ শাসন দণ্ড পরিচালনা করতে পারে না।

আমার মনে পড়ে গেল বার বছর আগেও সে এসব অমৃতবাণী শুনাত আমাদেরকে। সেই সবুজ পাহাড় আর ঘন জঙ্গল তেমনি রয়েছে। সে এখানে এসে চারদিক থেকে অনেক খোঁজাখুজি করে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আসত এবং সেটা সিথানে রেখে শুয়ে পড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাহিনী বলে যেত।

এ এলাকার প্রতি তাঁর অভিযোগ ছিল, এখানে পাথর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সবুজ পাহাড় দেখার জন্যে লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে একখানা পাথর মাথার নিচে দিয়ে যে আকাশ, তারকা এবং দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্ত হবে তার জো ছিল না।

'খো, সত্যি এমন জায়গায় শু'লে আপনি চোখ মুদে আসে। এদিকে উঁচু উঁচু গাছগুলো বাতাসকে আগলে রাখে, ওদিকে সুউচ্চ পাহাড়, পাথরে তৈরি পাষাণ পাহাড়---এ পাহাড়ের মতই ওখানকার লোকেরা অটল। আর এদিকে দেখ সজীব সতেজ সবুজ সমতল। ফুলের গায়ে প্রজাপতি উড়ছে, ছেব, আনার, নাসপাতি, খোবানী---কত মিষ্টি আর সুস্বাদু---লোকরা শীতকে পর্যন্ত ভয় করে এখানে।'

এভাবে তুলনামূলক দু'দিকের আলোচনা করে শেরগুল একেবারে চুপসে গেল। একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। এরপর হঠাৎ ভূমিকম্পে সব কিছু যেমন কেঁপে উঠে তেমনি আবেগ চাঞ্চল্যে তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠল এবং যেসব মজুররা তার মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনছিল, তাদের দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে উঠে বসে পড়ল। এবং একজন পাকা সন্ধানীর মত এক এক করে সবাইর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। এরপর হঠাৎ বিস্ফোরণের মত তার বুক বিদীর্ণ করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল 'আহ্ খো'। এবং তারপরই সে আবার সটান শুয়ে পড়ল।

আজ বার বছর পরও সে এমনি আগের মতই ভাবসমৃদ্ধ বাণী আর ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলছে। তার বার বছর আগের সেই কথাটি মনে পড়ে গেল আমার, যে কথা শুনে প্রায়শ আমার গা শিউরে উঠত, আমার মনে হয় কথাটি এখনো সে সমর্থন করে। 'শেরগুল, তুমি কি এখনো দুনিয়াটাকে বিশাল মনে কর?'

'কি যে বলো খো ভাই, দুনিয়া বড় নয়ত কি? এই আকাশ-পাতাল, নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য মিলিয়ে এই যে জগত, একে খুবই ছোট মনে হয় নাকি তোমার কাছে? এই যে বাতাস কোত্থেকে আসে? এই যে সুরুজ কোথায় যায়? খো, সত্যি দুনিয়াটা খুবই বড়।'

হঠাৎ আমার অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'তুমি না রেগে চলে গিয়েছিলে। বলেছিলে, আর কোন দিন ফিরে আসবে না।'

'সাহায্যের জন্যে ডাকলে কে না এসে পারে। তাছাড়া ওরা ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ করছে। নিজেদের স্বাধিকারের জন্যে লড়ছে। আর এখন তো ওরা নিজেরাই বন্দুক চালাতে পারে। আমার তো মনে হয় কোন জাতিই এদের উপর প্রভুত্ব করতে পারবে না আর।'

তার কথার যাদু ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল আমাকে। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আমরা কোথায় আছি। সচকিত হয়ে শেরগুলের দিকে তাকাতেই সেও হঠাৎ থলেটা কাঁধে তুলে হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খো ভাই, রাইফেলটা আর এগুলো তোমার কাছে থাক। আবার ফিরে এলে নিয়ে নোব। আর না এলে----।'

কথা শেষ না করতেই আমি বললাম, 'সামনে যে বিরাট পাহাড়। যাবে কোন্ পথ দিয়ে তুমি?'

একথা শুনে সে হাসল। আমার মনে পড়ে গেল তার কথা, 'পাহাড় যত দুর্গমই হোক না কেন, একটা না একটা পথ বের করে নেয়া যায়ই।'

'কিন্তু তুমি বন্দুক এটা ওটা সবই রেখে যাচ্ছে যে।'

'পাহাড়ে চড়বার জন্যে একটা হ্যাণ্ড গ্র্যানেডই যথেষ্ট।'

একথা বলেই অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সে।

আমরা তিন দিন সেখানটায় কাটালাম। তিন দিনই অনবরত আমাদের দিকে ফায়ারিং হচ্ছিল। আমরা প্রতি উত্তরে কিছুই করতে পারছিলাম না।

তৃতীয় দিনে পাহাড়ের ওদিক থেকে একটা বিস্ফোরণ হল। এবং উপর্যুপরি কয়েকবার বিস্ফোরণ হয়ে যাবার পর সারা আকাশটা রক্তাক্ত হয়ে গেল। এরপর ফায়ারিং বন্ধ হয়ে গেল।

'কে জানে শেরগুল পৌঁছতে পেরেছে কিনা।'

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। আমি জানি, শেরগুল আর কোন দিন ফিরে আসবেনা। সে ঠিকই বলেছিল, পৃথিবী বিশাল। একদিন না একদিন তার সাথে আমার দেখা হবেই। তবে কোথায় হবে কে জানে।

পাকিস্তানী খবর, এপ্রিল, ১৯৬৮ ইং

বি ডি ইসরানী

কৃষণ চন্দর

তার আজব চোখ দুটো দেখে মনে হত চেহারাটা তার নিজের আর চোখ দুটো ধার করা। ধারাল চিবুক আর শাণিত ঠোঁট দুটোর পাশে গভীর কালো চোখ জোড়া দেখে মনে হত কোন নিপুণ শিল্পী হঠাৎ ভুল করে বেশী কালির ছোপ দিয়ে ফেলেছেন চোখ জোড়ায়।

পুরোটা চেহারায় একটা অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের ছাপ---পঁয়ত্রিশোত্তীর্ণ অভিজ্ঞতাপুষ্ট সাধারণ তীক্ষ্ণ স্বার্থবুদ্ধি মানুষের যেমন হয়ে থাকে। এই প্রখর চেহারার মাঝখানে গভীর কাঁদো-কাঁদো একজোড়া কালো চোখ আমাকে প্রবল বেগে টানতে লাগল। হতভাগা এ চোখজোড়া কোত্থেকে চুরি করে এনেছে সেইটেই জানতে ইচ্ছা করছিল আমার। কলোনে তার কাপড়ের দোকানটা বেশ বড়-সড়। বাইরের সাইন বোর্ডে লেখা ছিল ঃ এখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে স্যুট বানানো হয়। আমার একটা বুশ শার্ট-এর দরকার ছিল। সাইন বোর্ডের নিচে লেখা ছিল ঃ প্রোঃ বি, ডি, ইসরানী।

বি, ডি, ইসরানী দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম। কারণ, আমার নাম জি, ডি, ইসরানী। শুধু বি, ডি, আর জি, ডি-র পার্থক্য। বাধ্য হয়ে আমি দোকানে ঢুকে পড়লাম।

লোকটির পরনে চমৎকার সাটিনের স্যুট। মুখে মোটা চুরুট দাবানো। হাতে একজোড়া হিরার আংটি। দীর্ঘ লয় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল আর দোকানের মধ্যে পায়চারী করছিল। প্রথম দিকে আমার প্রতি তার কোন মনোযোগই হল না। কিন্তু অর্ডার নেবার সময় আমার নাম দেখে সে চমকে উঠল, দেখা গেল আমরা দু'জনই সিন্ধী। এমন কি এক বংশসম্ভূত। এই সুদূর হংকং-এ আমরা দু'জন পাক-ভারতীয়—একটা মধুর আমেজ ছড়িয়ে পড়ল আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীতে। অল্পক্ষণের মধ্যে বহুদিনের পুরনো বন্ধুর মত আমরা

আপন হয়ে উঠলাম। রাতে সে আমাকে তার বাড়ীতে খাবার দাওয়াত দিল। আমি দ্বিরুক্তি না করে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিলাম। প্রসঙ্গ-ক্রমে আমি তাকে আমার একটা অসুবিধার কথা জানালাম। বোম্বে অবজার্ভার-এর প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। এখানকার 'কেনেথ' হোটেলে উঠেছি। একদিন রাত দু'টার সময় এক নাইট ক্লাবের 'কেবারে' থেকে ফিরে এসে দেখি আমার কামরাসহ 'কেনেথ' হোটেলের আট দশটা কামরা চুরি হয়ে গেছে। আমার দুটো স্যুটকেস ও একটি টাইপ-রাইটার নিয়ে গেছে। জোর পুলিশী তদন্ত শুরু হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহতও থাকবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই আমাকে বোম্বে ফিরে যাবার জন্যে ক্যাবল করা হয়েছে। এখানকার কাজ আমার প্রায় শেষ। বোম্বেতে ফিরে গিয়ে এডিটর সাহেবের কাছে হাজিরা দিয়ে আবার নাইরোবী রওনা হয়ে যেতে হবে।

'আসলে আমার কিছু টাকার দরকার।' আমি বি, ডি, ইসরানীকে বললাম। 'অবশ্য এর বিনিময়ে আমি আপনাকে হিন্দুস্থানী চেক দিতে পারি।'

'কত টাকার দরকার?' সে জিজ্ঞেস করল।

'শ পাঁচেক।'

'হয়ে যাবে।' বি, ডি, ইসরানী একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'এক্ষুণি আমার গ্যারান্টি দিয়ে আপনার চেকটাই ক্যাশ করিয়ে দিচ্ছি। জানেন বোধ হয়, এখানে আমাদের (সিন্ধী) নিজস্ব একটা ব্যাঙ্ক আছে।' পাঁচতলা-বিশিষ্ট এক বিরাট বাড়ীতে 'দি সিন্ধি মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে'র সদর দফতর। বি, ডি, জানাল, বাড়ীটা তার নিজের। মাসে এগার হাজার টাকা ভাড়া পাচ্ছে। তাছাড়া সে ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরও।

পাঁচশো টাকার বন্দোবস্ত করে দিয়ে বলল, 'সন্ধ্যা নাগাদ আমার দোকানে চলে এসো। বাড়ী ফেরার আগে একটু এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করা যাবে।'

আমি সন্ধ্যা ছ'টায় তার দোকানে যেয়ে পৌঁছলাম। সে আগে থাকতেই আমার প্রতীক্ষায় বসেছিল। কর্মচারীদেরকে জরুরী উপদেশ দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দোকানের সামনে বাদামী রং-এর মার্সিডিজবেঞ্জ দাঁড়িয়ে।

দুর্বার গতিতে গাড়ী চালাচ্ছিল সে। গাড়ীর ব্রেক বেশ চমৎকার! তার মুখখানা দেখতে ছিমছাম, কিন্তু হাত দুটো বেশ মজবুত। লোমশ

হাত দুটো দেখে মনে হল এই সুন্দর স্যুটের মধ্যে আস্ত একটা বন-মানুষ বা গরিলার দেহ রয়েছে।

অবলীলাক্রমে শিষ দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল সে। হঠাৎই কোন চীনা মেয়ের পাশে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে যেত এবং চীনা ভাষায় কি সব বলাবলি করে এক গাল হাসি ছড়িয়ে আবার রওনা দিল। ভাবসাব দেখে মনে হত লোকটা দারুণ অশ্লীল।

'এখনো কোন মেয়ে তোমাকে জুতা-পেটা করেনি?'

'কার বাবার সাধ্য আমাকে জুতা-পেটা করে? পুরোটা গলি যে আমার নিজের।'

'তোমার নিজের নামে?'

'এখানকার সব ষণ্ডা-গুণ্ডা আমার হাতের লাঠি। দু'দুটো জুয়া-খানা আছে আমার এখানে। দেখবে নাকি?'

'দেখবো চলো।'

সামনে ক্রোকারীর দোকান, পেছনের অংশ জুয়াখানা। মাঝখানে লম্বমান একটা টয়লেট রুম। দু'জন অর্ধবয়েসী লোক তোয়ালে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা ইসরানীকে চেনে বলে আমার প্রতি কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করল না। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় জুয়াখানায় ঢুকতে একটু অসুবিধে আছে। এখানে কতগুলো সাংকেতিক শব্দের প্রচলন আছে। সে সব যাদের জানা নেই, টয়লেটে ঢুকে শুধু প্রস্রাব করেই ফিরে যেতে হয় তাদেরকে। জুয়াখানা দেখতে গিয়ে সে আমাকে বলল, 'আমার সব কাজেই একটা স্টাইল আছে। দশ-দশটা কামরা একেবারে আলা-তরিকায় সাজানো। মেঝেয় পুরো কার্পেট। ভদ্র এবং বিনীত বেয়ারা আর মোহময়ী চীনা মদিরাক্ষীদের হাতে হাতে রংবেরং-এর পান পাত্র---একেবারে জমজমাট পরিবেশ। বড় বড় শেঠরা এসে রাতকে রাত কাটিয়ে যায়।'

এখানে এসে ইসরানী একটু থামল। তারপর অন্য এক কামরায় ঢুকতে ঢুকতে বলল,

'এখানে বেশ হাই ক্লাস জুয়া চলে। বাঁধাধরা কিছু গ্রাহক আছে। ফি-রাতে আড়াই তিন হাজারের মত নেট ইনকাম। বাইরের ক্রোকারীও বেশ চলে।'

'বেশ চমৎকার জায়গা তো! আমার তো খলিফা হারুন-অর-রশিদের মতো হাতে তালি দিতে ইচ্ছা করছে।'

'কিসের খলিফা হারুন-অর-রশিদ?'

এমন করে বলল, যেন তাবত বিশ্ব সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। আমি কথা কাটিয়ে নিয়ে বললাম,

'না, বোম্বের আমার এক বন্ধুর কথা বলছিলাম। চমৎকার একটা কিছু দেখলেই তার হাতে তালি দেবার অভ্যেস।'

'রাখো ওসব বাচলামি।' বলেই সিগারেটে লম্বা টান দিল সে।

'খেলবে নাকি?'

সে আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে বলল।

'না।'

দ্বিতীয় জুয়াখানাটি দেখবার জন্যে সে আমাকে এবার টি. হক স্ট্রীটে নিয়ে এল। এখানেও সবাই তাকে চেনে, সমীহ করে।

'এখানে আমার একটা চান্দুখানাও আছে।'

'চান্দুখানা? বল কি, এসব আছে নাকি এখনো এখানে?'

'হংকং-এ তো আছে এখনো। শোনা যাচ্ছে ওদিকে নাকি তুলে দেয়া হয়েছে।'

বলেই সে হাত দিয়ে চীনের অন্য প্রান্তের দিকে দেখাল।

চান্দুখানার পরিবেশ অত্যন্ত মার্জিত মনে হল আমার। উন্নত-মানের বন্দোবস্ত। চারদিকে চীনা শামাদানের নিষ্প্রভ আলো। রেশমী শামিয়ানার রংবেরং-এর ঝালর ফরফর করে দুলছে। ছোট ছোট চীনা আদলের পান পাত্র ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে। তির্যক-নয়নাদের মোহজালে হলঘর ম' ম' করছে। খদ্দেরকে নেশাগ্রস্ত করার ব্রত নিয়েছে তারা, কিন্তু নিজেরা কস্মিনকালেও নেশা করতে পারে না, নিষিদ্ধ। চান্দুখানায়ও গণ্ডা গণ্ডা কামরা। প্রত্যেক কামরার আবেষ্টনী এবং বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ আলাদা। টুংটাং সঙ্গীতের গুঞ্জন চলছে কামরায়। সেই সঙ্গীতের মূর্ছনার পরশে এক অনিন্দ্য ললনা প্রজাপতির মত নেচে চলেছে সারা দেহ উজাড় করে দিয়ে। হাতে দু'খানা রঙ্গিন পাখা। নৃত্যের তালে তাল দিয়ে আলতোভাবে লজ্জাস্থান ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। হাতের পাখা ছাড়া তা ঢাকবার আর কিছু অবলম্বন নেই সারা দেহে।

'মেকাও থেকে আনিয়েছি এটাকে।'

'রোজ দু'শ ডলার দিতে হয়। কেমন মনে হয়?'

'খাসা।' আমি বললাম।

'বলে দোব তোমার জন্যে?'

'না।'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

'তোমার মর্জি।'

বাইরে এসে একটা ঠাণ্ডা শ্বাস টেনে নিয়ে মার্সিডেজে বসে পড়লাম। পুরো কলোনে টি. হক এর এই চান্দুখানাই নাকি সেরা। রাতভর পাঁচ সাত হাজার ডলার আসে। দিনের ভাগেও দুই আড়াই হাজার ডলার। ওয়াণ্ডারফুল বিজনেস।

'কিন্তু ওই কাপড়ের দোকানটা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেটা তো একটা সাইনবোর্ড। ওখানে কোন বিজনেস হয় না। আজকাল সোজা ধান্ধা করে কেউ বেঁচে থাকতে পারে? ইউ আর এ ডেম ফুল।' এরপর আমাকে নিয়ে একটা কাফেখানায় ঢুকল। এবার আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আসলে সে তার পুরো রাজত্বটা ঘুরিয়ে দেখাতে চায় আমাকে।

এক গরীব সিন্ধি পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেমন করে মাত্র দু'শ ডলার নিয়ে এই সুদূর হংকং-এ ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে এসে এই বিশাল প্রতিপত্তির মালিক হয়ে বসল, সেইটেই বুঝাতে চাচ্ছে সে। আজ বি, ডি, ইসরানী হংকং-এর একজন ওপরের তলার লোক।

'এ ধরনের আরো গোটা কয়েক ব্রথেল আছে আমার।' কাফে-খানার চারদিকে একবার দেখে নিয়ে সে আমাকে বলল,

'কোন মেয়ে পছন্দ হলো?'

'না---দরকার নেই।'

'কেন, মেয়েদের পছন্দ হয় না তোমার?'

'মেয়েদের কে না পছন্দ করে। তবে আমার পছন্দ পুরনারীদের।'

'পুরনারী? পুরনারী আবার কি?'

বলতে গিয়ে আবারও তার চোখ দু'টো গভীর অতলান্তে ডুবে গেল, হারিয়ে গেল এক অনভিজ্ঞ জগতে। আমি তাকে আর সেকথা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম না। প্রসঙ্গ বদল করে বললাম, 'কোলকাতা, বোম্বে এবং হংকং-এর কাফেখানার মধ্যে বড় বেশী পার্থক্য কিছু নেই। বাহ্যিক সাজগোজ ছাড়া সব কাফেখানাতেই এক ধারার আয়োজন। এখানকার কাফেখানাতে চীনা মাল আর আমাদের গুলোতে ভারতীয় মাল, এই যা একটু পার্থক্য।'

আমার মন্তব্য শুনে সে বলল, 'ও বুঝেছি, ফরেন মাল চাই তোমার। তা এম্বাসি রোডের ব্রাথেলে ফরেন মালও আছে আমার। ফার্স্ট ক্লাস মাল। চলো, সেখানটা দেখে এসো, একটা নূতন ছুকরি আনিয়েছি সবে, দেখ পছন্দ হয় কিনা।'

ইসরানী কাফেখানায় ম্যানেজারকে ডেকে চীনা ভাষায় কি যেন বলল। সাথে সাথে ওরা আমাকে একটা প্রায়ান্ধকার কামরায় নিয়ে এল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি মেয়ে সোফার উপর বসে গোঙাচ্ছিল। ইসরানীর ইঙ্গিতে তার হাত-পা খুলে দেয়া হল। মেয়েটির বয়েস পনের-ষোল বছরের বেশী হবে না। ইসরানী অনেক-ক্ষণ ধরে চীনা ভাষায় তাকে শাসাল। কিন্তু মেয়েটি বরাবর মাথা দোলাচ্ছিল এবং শেষে রীতিমত চিৎকার শুরু করে দিল। মেয়েটি উঠে রওয়ানা দিচ্ছিল, এমন সময় ইসরানী তাকে এক প্রচণ্ড ঘুষি দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলল। মেয়েটির নাক-মুখ থেকে রক্ত বের হল। একটা চরম ভয়—বিভীষিকা তার মুখাবয়ব আচ্ছন্ন করে ফেলল। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল আর অতি করুণ চোখে আমার দিকে দেখছিল। ইসরানী আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আমাকে বলল, 'গতকাল তাইওয়ান থেকে ছ'টি মেয়ের এক ব্যাচ আনিয়েছি। প্রতি দু' তিন মাস অন্তর কাফেখানায় নতুন মেয়ের আমদানী করতে হয়, নইলে বিজনেস ডাল পড়ে যায়---স্মাগলিং করে আনা হয়েছে। একেবারে আনকোরা---কিছুই জানে না হারামজাদীরা।'

ইসরানী অন্য কামরায় এসে চুন্নু নামের একজন ভারতীয় কর্ম-চারীকে ডাকল। পোশাক-আশাক দেখে কাফেখানার পদস্থ কর্মচারী বলে মনে হল তাকে। চুন্নু এসে বিনীত হয়ে দাঁড়াল তার সামনে।

'ওর কামরায় গোটা দশেক মানুষ লাগিয়ে দাও।'

হুকুম শুনে চারদিকে হাততালি দিয়ে সাত-আটজন লোক যোগাড় করে ফেলল সে। তারা সবাই বন্ধ দরজার সামনে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ইসরানী তাদেরকে কিছু জরুরী উপদেশ দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটি করুণ আর্ত চিৎকারে দূর চক্রবালের ইথার প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এক সময় আমি অসহিষ্ণু হয়ে বলে বসলাম, 'এসব কি অনাসৃষ্টি করছ তুমি?'

'এসব না করলে লজ্জা কাটে না। একেবারে বেহায়া না হলে কোন মেয়েকে দিয়েই বিজনেস করা সম্ভব নয়।' সে অবিকৃত কণ্ঠে বলল।

তার বাড়ীটা বেশ চমৎকার। এক সুদৃশ্য পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত। তার বাড়ীতে বসে পুরো হংকং শহর দেখা যায়।

ইসরানীর বউ নেহাতই ঘরোয়া ধরনের সাদাসিধে মহিলা। ফুটফুটে দু'টি মেয়ে। একটি বছর দশেকের অপরটি বার-তের বছরের। ইসরানী জানাল, 'সবচেয়ে বড় মেয়ের বিয়ে করিয়ে দিয়েছি। স্বামী দক্ষিণ আমেরিকাতে বিজনেস করছে। সেও সিন্ধি কিন্তু আমেরিকাতে তার বেশ জমকালো বিজনেস। বড় মেয়ের ছেলেমেয়ে দুটো। বেশ আছে তারা।'

'কিন্তু সব মেয়েই, কোন ছেলে নেই?'

'ছেলে থাকবে না কেন?' বলেই সে অট্টহাসি করে উঠল। 'ছেলে না হলে মুক্তি আছে? দুই ছেলে, দু'জনই সেয়ানা। একজনকে ফিলিফাইনে অপর জনকে জাপানে বিজনেস করিয়ে দিয়েছি।'

হুইস্কির গ্লাসটা এক টানে নিঃশেষ করে একটা স্নিগ্ধ শ্বাস টেনে বলল, 'ভগবান আমাকে সব কিছু দিয়েছে।'

বউ তার কাছ ঘেঁষে চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিল আর সবুজ রং-এর একটি উলের কার্ডিগান বুনছিল।

'আমার এই সদা প্রফুল্ল স্ত্রী (সারদা নিষ্পাপ শিশুর মতো স্মিত হেসে চুড়ি পরা হাত দুটো স্বামীর হাতের মধ্যে ন্যস্ত করে দিয়ে আমেজ নিতে লাগল) আমার মুন্নু এবং গিন্নু (সম্ভবত ছোট মেয়ে দুটোর নাম) আর আমার সাবিত্রী (বড় মেয়ের নাম, সারদা তার ফটো এনে দেখাল আমাকে, এক অনুপম সুন্দরী মেয়ে, পাশে তার ব্যবসায়ী ভুড়িওয়ালা স্বামী, দু'জনের চোখে মুখে তৃপ্তিমাখা হাসি। সম্ভবত বিয়ের সময়কার ছবি) আর আমার সুযোগ্য বড় পুত্র সুখদাস (ফিলিপাইনে ব্যবসারত) এবং হরিদাস (জাপান) আমার চির জীবনের সম্পদ। (সারদা ছেলে দুটোর ফটোও দেখাল আমাকে। দু'জনই বাবার পকেট সংস্করণ।) পঁয়ত্রিশ বছর আগে মাত্র দু'শ ডলার নিয়ে এই হংকং-এ দেশান্তর হয়েছিলাম, আজ ভগবানের ইচ্ছায় আমি দু'কোটি টাকার মালিক।'

'আগ্নেয়গিরির কাছেই তুমি বাড়ীটা বানিয়েছ দেখছি। দেড় দু'ঘন্টার মধ্যেই হংকং জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যেতে পারে।' আমি বললাম।

'তা ঠিক। কিন্তু আমাকে অত বোকা মনে করো না। এজন্যে আমার ফার্মের হেডঅফিস ফিলিপাইন এবং ম্যানিলাতে খুলে দিয়েছি। সুখলালকে তার ইনচার্জ বানিয়ে দিয়েছি। এবং অন্য সব বন্দোবস্ত এমন ভাবে করে নিয়েছি যে একটা কিছু বিপদ আপদ ঘটলে দেড় দু'ঘন্টার মধ্যে আমিও হংকং ত্যাগ করতে পারি।' বলেই সে একটা তৃপ্তিমাখা

হাসিতে নিমজ্জিত হল। কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে ভুড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আমার কোন কিছুর অভাব নেই দোস্ত, আমি বেশ সুখী----।'

খাবার শেষে আমি বসে কফি পান করছিলাম। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল আর হঠাৎই ইসরানীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, 'আহ্'। হাত থেকে কফির পেয়ালা পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঢেকে ফেলল সে। সারদা হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে কতকগুলো রুমাল নিয়ে এসে হাজির হল এবং তা ইসরানীর হাঁটুর নিচে রেখে দিল। আমি চেয়ে দেখলাম, ইসরানীর আজব চোখ দুটো থেকে অঝোর ধারায় অশ্রুর ঢল নেমেছে। আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখছিলাম। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তোমার সাথে কথায় কথায় আমি ভুলে বসেছিলাম।'

'কি ভুলে বসেছিলে?'

'রাত দশটার কথা।'

'কিসের রাত দশটা?'

কিছুক্ষণের জন্যে সে চুপসে গেল। রুমাল দিয়ে আর একবার চোখ সাফ করে বলল, 'জান, পৃথিবীতে আমার কোন দুঃখ নাই। একমাত্র এই একটি কষ্ট ছাড়া আমার মত সুখী পৃথিবীতে আর হয় না। যখনই রাত দশটা বাজে অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ হতে থাকে আমার চোখ থেকে। দু'তিন ঘন্টা ধরে এই অশ্রু বিসর্জন চলতে থাকে।'

'কেন এমন হয়?'

'জানি না। এর চিকিৎসার জন্যে সারা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছি, কোন ডাক্তারই এর রোগ নির্ণয় করতে পারেন নি।'

বলতে বলতে আবারও চোখ দুটো তার ভরে এল এবং কপোল বেয়ে ঝরতে লাগল সে অবিরাম ধারা। হঠাৎই ইসরানীকে সলিলে নিমজ্জিত এক মরণোন্মুখ মানুষের মত মনে হল, তারই কাছাকাছি কোন এক গভীর কূপে এক নিষ্পাপ ষোড়শী মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে আর ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর কালো জলে তলিয়ে যাচ্ছে।

আমি একরাশ অনুভূতির হলাহলে বিদগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং মাথায় টুপি চেপে ইসরানী দম্পতিকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাফেখানার সেই মেয়েটি এবার খিল খিল করে হাসছিল।

সচিত্র সন্ধানী, ১৯৬৭ ইং

প্রেমচান্দ

দশ বারো দিন। অচলগড়ে উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। আম-দরবারে সরকারী উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়া একদল গায়িকাও সমাসীন। ধর্মশালা এবং সরাইগুলোতে ঘোড়া হ্রেষারব করছে। সরকারী চাকুরে কি বড়, কি ছোট রসদ পৌঁছাবার বাহানায় দরবারে আমে গিয়ে ভীড় জমায়। ঠেললেও ঠেলা যায় না। খাস দরবারে পণ্ডিত, পূজারী মহন্ত লোকগণ আসন জমিয়ে পাঠযজ্ঞ করছেন। সেখানে কোন সরকারী চাকুরের প্রবেশ অনধিকার। ঘি এবং পূজার সামগ্রী না থাকায় সকালের পূজা সন্ধ্যায় হচ্ছে। রসদ না থাকায় পণ্ডিত লোক কৃত্রিম ঘি এবং ফলভোগ অগ্নিকুণ্ডে ঢালছেন। দরবারে আমে ইংরেজী কেতার বন্দোবস্ত। আর দরবারে খাসে দেশী সেকেলে সাজ গোজ।

রাজা দেবমল দরিয়া-দিল লোক। এই বার্ষিক উৎসবে তিনি অকাতরে অর্থ দান করেন। সময়টা বড় দুর্ভিক্ষের। দেশের আধা লোক না খেয়ে মরছে। জ্বর, কলেরা এবং বসন্ত রোগে এ বছর দু হাজার লোক মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। গরীব রাষ্ট্র। তাই না পাঠা-গার আছে, না চিকিৎসালয়, না রাস্তা। বর্ষায় চলাই দায়। আর অন্ধকার রাত্রে ঘোড়াশাল বন্ধ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে এর চাইতেও হৃদয়বিদারক বিবরণ বলা যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও এটা রীতিমত অসম্ভব যে, দশরার পূজা হবে না। এতে দেশের গৌরবে কলঙ্ক লাগে। দেশ গোল্লায় যাক, মহল্লার ইট খসে পড়ুক, তবু এ উৎসবে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয় এ সময়। শামিয়ানা টানিয়ে---মাইল কে মাইল মার্বেল পাথরের এক শহর তৈরি হয়। হপ্তাভর খুব ধুমধাম আনন্দ-উৎসব চলে। এর বদৌলতেই এ তল্লাটে অচলগড়ের নাম আজো অক্ষয়।

রাজা সাহেবের এই অন্যায় ব্যস্ততা কনুরান্দর মলের কিন্তু মোটেই ভাল লাগছিল না। সে স্বভাবতই এক শান্তশিষ্ট, সৌম্য এবং বীর্যবান যুবক। মৃত্যুকে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার বীরত্ব রক্তপাত ঘটায় না। পালকহীন পাখী অথবা ভাষাহীন পশুদের সাথে তার যুদ্ধ হয় না। নির্যাতিতের সাহায্য, অসহায়ের সুপারিশ, গরীবদের দান এবং বড় লোকদের বিরোধিতা—এই তার একমাত্র পসন্দসই কাজ। দু'বছর আগে ইন্দোর কলেজ থেকে পাঠ সমাপন করে এসেছে। বড় সুখে প্রতিপালিত হয়েছে। দুঃখের ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত লাগেনি কোন দিন। যদি কোনদিন কেঁদেও থাকে তো সেটা খুশির কান্না।

উৎসবের দিন কাছে এসে গেছে। মাত্র চার দিন বাকী। আয়োজনের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখা। বেলা তিন প্রহর তখন। রাজা সাহেব জলসাঘরে নির্বাচিতা ক'জন গায়িকার গান শুনছিলেন। তাদের সুরের ইন্দ্রজালে হারিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি বেশী আনন্দিত এজন্য যে, এই সঙ্গীত পলিটিক্যাল এজেন্টদেরকেও মাত করে দেবে। তারা তন্ময় হয়ে শুনবে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে।

এই ভাবনায় যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, তানসেনের তানেও তা নেই। আহ্! এদের কণ্ঠ থেকে এখনি হয়ত বাহবা বেরিয়ে পড়বে। মোটেই আশ্চর্য নয় যে, এখনি উঠে এসে হাত মেলাবে এবং আমার নির্বাচনের প্রশংসা করবে। এমন সময় কনুরান্দর মল খুবি সাদাসিধে কাপড় পরে জলসা ঘরে উপস্থিত হলো এবং সম্ভ্রমনত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা সাহেবের চোখ লজ্জায় ঝুঁকে গেল। এই অপ্রত্যাশিত আগমন বড় অস্বস্তি এনে দিল। সবাইকে উঠে যাবার ইঙ্গিত করলেন রাজা সাহেব।

কনুরান্দর মল বলল,

—'মহারাজ, আমার অনুরোধ উপরোধের দিকে কি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।'

রাজা সাহেব ভাবী শাসনকর্তার বেশ মর্যাদা দিতেন। তবু এই স্থান-কাল-পাত্র অমান্য করা তাঁর ভাল লাগল না। আমি কি অন্ধ? এই সাদামাঠা কথা কি বুঝি না? কিন্তু ভাল কথা হলেও স্থানকাল জ্ঞান থাকা উচিত। অন্তত নাম ও মান-ইজ্জত বলেও তো

একটা জিনিস আছে। দেশে শ্বেতপাথরের সড়ক বানিয়ে দেব। অলিগলিতে পাঠাগার খুলে দেব। ঘরে ঘরে কূপ কেটে দেব। ঔষধপত্রের নদী বইয়ে দেব। কিন্তু দশরার ধুমধামে রাজ্যের যে সুখ্যাতি বাড়ে তা দিয়ে কি হয়? বরং এটা সম্ভব যে, ধীরে ধীরে উৎসবের খরচটা কমিয়ে দেব।

'---অবশেষে তুমি কি চাও দশরা বিলকুল বন্ধ হয়ে যাক?' রাজার উদ্ধত ভঙ্গী দেখে কনুর মাথা নত করল।

'---আমি দশরার বিরুদ্ধে তো কখনো একটি শব্দও মুখ থেকে বের করিনি। এটা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। এটা শুভ দিন। আজকের দিনে দশরা উদ্‌যাপন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আমি শুধু এই গায়িকাদের সম্পর্কে আপত্তি তুলছিলাম। নাচ-গান এই দিনের পবিত্রতাকে যে নষ্ট করে দেয়।'

'—তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেঁদে কেঁদে দশরা উদ্‌যাপন করা হোক, তাই না?'

'—আপনি যা-ই-বলুন এটা ইনসাফের খেলাফ। এখানে আমরা উৎসব করব আর এর কল্যাণে হাজারো লোক কাঁদবে। বিশ হাজার মজুর এক মাস ধরে---মোফত কাজ করছে। তাদের ঘরে কি উৎসবটা হচ্ছে? গায়ের ঘামে রুটি সিক্ত করে তারা। আর যারা হারাম কাজের ব্রত নিয়েছে তারাই এই মজলিসের শোভা। আমি দু'চোখে এই অপকর্ম দেখতে পারি না। তার চেয়ে বরং গা-ঢাকা দিয়ে কোথাও চলে যাব। এমন রাজত্বে থাকা আমার নীতি-বিরুদ্ধ এবং লজ্জাস্কর।'

কনুরান্দর মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো অপরাধজনক কথা বলল। রাজা রক্তাক্ত চোখে বললেন,

'---হাঁ, আমিও এটা ভাল মনে করি। তুমি আপন নীতিতে অটল থাক। আর আমিও আমার কর্মে রত থাকি।'

কনুর একটু তির্যক হাসি দিয়ে সালাম করে চলে গেল। সে হাসি কাটা ঘায়ে লবণ দিল।

এদিকে রাজকুমার ফিরে এল। আর রাজাও গায়িকাদেরকে আবার ডাকলেন। ফের ললিতকণ্ঠে সুখের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়লো। আনন্দ উৎসব আবার জমে উঠেছে। আর ওদিকে রাণী-

ভান কনুর পূজা করে ফিরছিলেন। চাটাইতে শয়ন আর দুগ্ধ পান করে এক হস্তাধরে পূজা করছেন তিনি। এমন সময় এক দাসী এসে হৃদয়বিদারক এক খবর পরিবেশন করল। রাণীর হাত থেকে নৈবেদ্যের থালা মাটিতে পড়ে গেল। কেঁপে কেঁপে মাটিতে পড়ে গেলেন। শুষ্ক ফুল যেন বায়ুপ্রবাহ সহ্য করতে পারলো না। পরিচারিকারা সামলে নিয়ে চারদিক ঘিরে বুকে ও মাথায় হাত মারতে লাগল। আর উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগল অশ্রুহীন কান্না।

এদিকে পরিচারিকারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আর ওদিকে রাণী আপন ভাবনায় বেহুঁশ। কনুর কেন এ রকম বেআদবী করল? না, একথা ভাবনাই যায় না। সে তো কখনো আমার কোন কথার জবাব দেয় না। এটা রাজার বাড়াবাড়িই হবে।

সে নাচ-গানের বিরোধিতা করে থাকবে হয়ত। তাতে ওর মাথা-ব্যথা কেন? যা কিছু বিপর্যয় হোক হবে। তা তো ওর দায়িত্বে পড়ে নেই। অবশ্যিই ওকে কিছু কটু কথা বলা হয়েছে। এমনি তো ও বদমেজাজী—রেগে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু গেল কোথায়? ঈশ্বর, তুমি আমার লালকে রক্ষা করো। আমি তাকে তোমার হাতে সোপর্দ করছি।

এ সব ভাবতে ভাবতে দেহে কম্পন শুরু হলো। তারপর উঠে গিয়ে জলসা ঘরের দিকে চললেন।

রাণীকে দেখেই গানমত্ত লোকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল। কেউ কারো আড়ালে গেল, কেউ দরজার আড়ালে লুকাল। কম্পিত স্বরে রাণী বললেন,

—'আমার কনুরান্দর মল কোথায়?'

—'জানি না।' রাজা বিমুখ হয়ে জবাব দিলেন। রাণী কান্না গদ-গদ কণ্ঠে বললেন,

—'আপনি বুঝি জানেন না? সে কাল দুপুর থেকে নিরুদ্দেশ। কোথাও তার খোঁজ নেই। আপনার এই বিষাক্ত অপ্সরীরা ওকে তাড়া করেছে। আমি বলছি, যদি ওর এক চুল পরিমাণ ক্ষতিও হয় সে জন্য আপনি দায়ী।' রাজা রুষ্ট হয়ে বললেন,

—'ও অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারী এবং অহঙ্কারী হয়ে গেছে। আমি ওর মুখ দেখতে চাইনে।'

রাণী ফণাধর সাপের মত ফোঁস করে উঠল।

—'রাজা, তোমার মুখ দিয়ে একথা বেরুল? হায়, আমার লাল, আমার চোখের মণি, আমার কলিজার টুকরা। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে আর এই নির্দয়ের মন একটুও টলেনা। আমার ঘরে আগুন লেগে যাক আর এখানে আনন্দমত্ত হয়ে থাকবে। আমি কেঁদে কেঁদে চোখ দিয়ে রক্ত ঝরাব আর এখানে রাগ-রং নাচ-গান হবে।'

রাজা উত্তেজিত হয়ে কর্কশকণ্ঠে বললেন,

'—রাণী ভান-কনুর, মুখ বন্ধ করো। আমি এর বেশী শুনতে চাইনে। এখন তুমি মহলে চলে গেলে ভাল হয়।'

—'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। আমি হুজুরের আনন্দে বাঁধ সাধবনা কিন্তু আপনাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। অচলগড়ে হয়ত ভান-কনুর থাকবে, নয়ত আপনার বিষাক্ত পরীরা থাকবে।'

রাজা রাগে বলতে চেয়েছিলেন, 'রাণী থাক বা না থাক, এই পরীরা থাকবে।' কিন্তু সংযত হয়ে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে করগে।'

রাণী ভান-কনুর চলে গেলে রাজা দেবমল কামরায় এসে বসলেন। কিন্তু বিমর্ষ এবং চিন্তিত। রাণীর কঠিন কথাগুলো মনের কোমল অংশে প্রতিক্রিয়া করতে লাগল। প্রথমত নিজেকেই শাসাল, কেন রাণীর এত কথা সে ধৈর্য ধরে শুনেছে? কিন্তু যখন ক্রোধের আগুন নিভে ক্রমেই স্বাভাবিক হতে লাগল, ততই সে সব নিয়ে অন্য রকম ভাবতে লেগে গেলেন। সত্যি, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসেবে এই আনন্দ-উৎসব বেমানান। সত্যিই, প্রজাদের প্রতি তাঁর যে কর্তব্য তা প্রতিপালন হচ্ছে না। কনুর এসব ব্যয়-ভূষণ এবং আনন্দ-উৎসব চায়না। —এই তো? কিন্তু এমন ভঙ্গিতে সে সমালোচনা করে যার ব্যাখ্যা অন্য রকম হয় এবং রাজ্যের সম্মানে ঘা লাগে। তিনি কনুরান্দর মলকে একথাই ত বলেছেন। এর পরও যদি সে প্রত্যাবর্তন না করে ত এটা তার গোঁড়ামী। সম্ভাব্য সকল দিকে রাজা বেশ ভেবেছেন। কনুরের এই চলে যাওয়া সত্যি চিন্তনীয় ব্যাপার। রাজ্যের পক্ষে চাঞ্চল্যকর ঘটনাও বটে। কনুর এমন বোকা এবং ভীরু ত নয় যে, আত্মহত্যা করবে। তবে হ্যাঁ, দু'চার দিন এদিক সেদিক ভবঘুরে হয়ে ফিরবে। আর ঈশ্বর যদি কিছু বোধশক্তি দিয়ে থাকে তো অনুতপ্ত হয়ে অবিশ্যি ফিরে আসবে।

কনুরান্দরের ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রাজার ধ্যান আবার রাণীর দিকে গেল। যখনি কঠিন ক্রুদ্ধ কথাগুলো মনে পড়ল, ঘাম দিতে লাগল সারা গায়। উঠে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। সত্যি আমি রাণীর সাথে কঠোরতা করেছি। মায়ের কাছে সন্তানের মূল্য ঈমানের চেয়েও বেশী। তার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এসব ধমকের কি মানে? যদি সে রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যায় আর আমার বদনাম করে?

এমন সময় বাঁদী এসে খবর দিল মহারাণী হাতী আনিয়েছেন। না জানি কোথায় চলে যাচ্ছেন কিছুই বলছেন না।

রাজা শুনলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অন্দ্রো শহরের তিন মাইল উত্তরে ঘন বনরাজীর মাঝখানে একটা পুকুর আছে। কথিত আছে, কোন কালে এর চার পারে পাকা ঘাট ছিল। কিন্তু এখন শুধু কিংবদন্তী বাকী রয়ে গেছে।

পুকুরের পূর্বদিকে একটা পুরনো মন্দির। সেখানে শিবজী অনেক কাল থেকে আসন মেলে বসে আছেন। জংলী পায়রা এবং আবাবিল পাখী নিত্য মধুর সুর শুনায়। এই অরণ্য বনানীতে তাঁর জাঁকজমকের কমতি নেই। অভ্যন্তরে কলস ভরা পানি। বাইরে পূজার অর্ঘ্য। পথিকরা এই পুকুরে স্নান করে এক ঘট পানি দিয়ে ভগবানের পিপাসা নিবৃত্তি করে যায়। শিবজী কিছু খান না। কিন্তু পানি খুব পান করেন। তাঁর অতৃপ্ত পিপাসা কখনো তৃপ্তি লাভ করে না।

পড়ন্ত বেলা তখন। রৌদ্র তির্যক হয়ে পড়েছে। কনুর ঘোড়ায় চড়ে অন্দ্রোর থেকে এলো। এবং এই মন্দির সংলগ্ন এক গাছের নিচে এসে থামল। বড় ক্লান্ত সে। ঘোড়াকে গাছের সাথে বাঁধল। তারপর জিন পোষ বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে ঘুম এল। স্বপ্নে দেখছে, রাণী এসেছে। তাকে গলায় ধরে কাঁদছে। চমকে গিয়ে চোখ খুলল সে। সত্যি রাণী দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ে চুমো দিল। কিন্তু রাণী পা সরিয়ে নিলেন। মুখে কিছু বললেন না।

---'মা জী, আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?'

---'আমি তোমার কে?'—রাণী জবাব দিলেন।

---আপনি বিশ্বাস করুন, যখন থেকে অচলগড় ছেড়েছি এক দণ্ডও আপনাকে ভুলতে পারিনি। এখনো স্বপ্নে আপনাকেই দেখছিলাম।

শুনে রাণীর রাগ মিটে গেল। তারপর বললেন,

—'এই তিন দিন তুমি ছিলে কোথায় ?'

—'কি বলব কোথায় ছিলাম। অন্দ্রো গিয়েছিলাম। সেখানে পলিটিক্যাল এজেন্টদের কাছে সব কিছু বলে এসেছি।'

---'তুমি তাহলে নস্যাত করে দিয়েছ। আগুন লাগিয়ে দিয়েছ।

---'কি করব ? নিজেই অনুতপ্ত এখন। তখন তো রাগের মাথায় ছিলাম।'

---'আমি যা আশঙ্কা করতাম তাই হয়ে গেল। এখন কোন্ মুখ নিয়ে অচলগড় যাব ?'

এসব কথা হচ্ছিল এমন সময় একদল অশ্বারোহী এবং হস্তি-আরোহী ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। হাতীর পিঠে সুন্দরী মেয়েরা। মায়াবী চাহনী তাদের। এরা সেই নাচ-গানের মেয়েরা—নটি, বাইজি। বিফল হয়ে অচলগড় থেকে ফিরে আসছে। রাণীর বাহন এবং কুমারের ঘোড়া দেখে তারা চিনল। গর্বদীপ্ত ভঙ্গিতে সালাম করে পাশ কেটে চলে গেল। ক্রমে যখন তারা অনেক দূরে চলে গেছে রাজকুমার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বিজয়ের হাসি। রাণী বললেন,

---'এ কি হলো ? এরা অচলগড় থেকে ফিরে আসছে অথচ ঠিক দশরার দিন।'

কনুরান্দর মল বলল,

---'এ হচ্ছে পলিটিক্যাল এজেন্টদের সিদ্ধান্ত। আমার চাল বিলকুল মোক্ষমভাবে লেগেছে।'

রাণীর কাছে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা-মগ্ন থাকলেন তিনি। তাঁর মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন জাগছিল, এরই নাম কি দ্বন্দ্বরাজ ?

চতুর্থ পথ

বেজাহাত আলী সিন্দিলুভী

বেচারী মৌলবী সাব এমনিতে বড় সাদাসিধে লোক, কিন্তু করা কি? মেয়েদের প্রতি তাঁর চরম আসক্তি। পয়লা যৌবন উঁকি ঝুঁকির সাথে এক আধ্‌টু পদস্খলনও ঘটেছিল বৈকি। কিন্তু যখন পীর বদ্দুশাহ তাঁর একমাত্র কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে খলিফা বানিয়ে নিলেন, তখন আপ্‌সেই সোজা রাস্তায় এসে গেলেন তিনি।

টাকা উৎপাদনের মুরীদ এবং যৌতুকমণ্ডিতা এক বাধ্য সাধ্বী বিবি পেয়ে মৌলবী সাব অন্য মেয়েলোকের সাথে আপত্তিকর তেমন কিছু সম্পর্ক আর রাখলেন না। অবশ্য চোখের সামনে কোন প্রাণ ভুলানো চেহারা কদাচিত হাজির হলে পুরনো অভ্যাসের বশে খুব গাঢ় করে একটু দেখে নিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্রুত বিড় বিড় করে দেহে ঝাড় ফুঁক দিয়ে মুচকি হেসে উঠতেন। যেন কোন আসন্ন বালাইকে খুব সাবধানতার সাথে রোধ করে দিলেন।

তিনি বহু পুরনো কিতাবে পড়েছিলেন, সুশ্রী চেহারা দেখে খোদার শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করাও এক জাতীয় এবাদত। এবং এজাতীয় এবাদত বহুতই হাসেল করেন তিনি; যেহেতু তাঁর মুরীদদের মধ্যে মেয়ে, মানে যুবতী মেয়ের কমতি ছিল না। সৌলবী সাবের বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু স্বাস্থ্য বড় ভাল। কারণ, ভুখা মুরীদরা তাদের পরম পীরকে ভাল খাবার থেকে একটুও বঞ্চিত রাখেনি। গৌরবর্ণ দেহ এবং গড়নবেশ পরিপাটি। তাছাড়া পিঙ্গল বর্ণের নিশ্ছিদ্র দাড়ি মুখটাকে আরো আভিজাত্যময় করে রেখেছে।

সময় সময় তিনি ভাবেন, যত মেয়ে মানুষ তাঁর কাছে দম বা তাবিজ নিতে আসে তারা সবাই আর তাঁকে পীরের চোখে দেখে না, বরং অনেকে তাঁকে মনে মনে কামনাও করে। কিন্তু লাহাওলা অলা কুয়াতো পড়ে তৎক্ষণাৎ তিনি এই ক্লেদাক্ত ভাবনাকে দূর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন।

মৌলবী সাবের বিবির অসুখ হওয়াতে শকুরণ নামে একজন আয়া রাখা হলো। চেহারা সুরত ভাল এবং কাজ কামেও খুব চালু। বয়স তিরিশোর্ধ্ব। এক স্বামী তাকে বিধবা করেছে, অন্যজন তালাক দিয়েছে। কিন্তু এ স্বামীদের সম্পর্ক চুকে যাবার পরও তার যৌবনে ভাটা পড়েনি। ছাই ঢাকা স্ফুলিংগ যেন স্পষ্ট চমক মারে। মৌলবী সাব তার কাজকামে খুশীই, কিন্তু তার চটকদার গতিবিধি, তাঁকে হয়রান করে রাখে। আয়া বার বার আঁচল ঠিক করে, চোখ বাঁকা করে কথা বলে, অথবা পেটের অংশ থেকে অজান্তে শাড়ীর আঁচল উন্মুক্ত করে দেয়। এসব ব্যাপার তাঁর মনকে সত্যি নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মন খারাপ করে এক হাত দাড়িতে দিয়ে অন্য হাতে তসবিহ নিয়ে সংযম সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন।

নিজের বিবির অসুখ সম্পর্কে মৌলবী সাব নিশ্চিত ছিলেন যে, তাকে জ্বীনে পেয়েছে। তাই তিনি তাবিজ লিখে তা ধুয়ে সেই পানি খাওয়ানো মায় অজিফা পাঠ এবং ঝাড়ফুঁকের কোন চেষ্টাই বাকী রাখেননি। কেউ যখন ডাক্তারী চিকিৎসার কথা বলে মৌলবী সাব তাদেরকে বেকুব আখ্যায়িত করেন। 'আরে, আপনারা একি কথা বলেন? জ্বীনের চিকিৎসা তো সে-ই করতে পারে যে জ্বীনের খবর জানে। ডাক্তারদের কি সাধ্য? লোহা দিয়েই না লোহা কাটা যায়, তাইনা?'

রাত্রে অজিফা পাঠের সময় শকুরণকে জাগানোর প্রায়ই প্রয়োজন পড়ে মৌলবী সাবের। একরাতে তিনি ক'বারই আওয়াজ দিলেন। কিন্তু শকুরণ জাগল না। ওদিকে বিবির কাঁচা ঘুম আবার বুঝি ভেঙ্গে যায় তাই তিনি আর না ডেকে নিঃশব্দ পায়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ওর কাঁধে ধরে নাড়া দিলেন। শকুরণ চমকে জেগে উঠল। দেহের উপরিভাগ একেবারে খোলা। রাতের অন্ধকারেও তার বিপজ্জনক দেহ-পল্লবী ঝিকমিক করে উঠল। বেচারী মৌলবী সাবের চোখ জোড়ায় ধাঁধা খেলে গেল। কিন্তু তার উপর বিদ্যুৎ বর্ষণ হলো যখন তিনি দেখলেন, সন্ত্রস্ত হবার বদলে দিব্যি মুচকি হাসছে শকুরণ। সে হাসি তার নিষ্কলুষ মর্যাদাকে যেন বেষ্টন করে পিষে কাবু করে আনছে। মৌলবী সাব অপবাদ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু মর্যাদা হানি হতে দিতে পারেন না। মর্যাদাই তাঁর এক মাত্র অবলম্বন এবং সহায়। 'লা হাওলা' পড়ে পায় পায় ফিরে এলেন তিনি। সেই থেকে শকুরণকে আর রাত্রে জাগাবার সাহস করেননি কোনদিন।

বিবি জানের পরলোকগমনের পর বিষাদের পাহাড় নেমে এলো মৌলবী সাবের উপর। প্রথম ক'দিন তিনি মেয়েই দর্শন পাপ মনে করে বসলেন। আর শকুরণকে মনে হলো, তাঁকে খেয়ে ফেলবার জন্যে যেন একটা রাক্ষস বসে আছে। শুধু পানাহার ছাড়া ঘরে পা ফেলাই ছেড়ে দিলেন তিনি। সব সময় বৈঠকখানায় নিঃস্বের মত বসে থাকেন। দোয়া ঝাড়-ফুঁক বা তাবিজ নিতে যে সব মুরীদরা আসে তাদের সাথে বিবি-বিয়োগের করুণ কাহিনী বলে বলে সময়টা কাটিয়ে দেন। বিবির কল্যাণে তিন বছরের যে একটি ছেলে এবং পাঁচ বছরের মেয়েটি রয়েছে, ক'দিনের জন্যে তাদেরকে বোনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

ক'হপ্তা পর ধীরে ধীরে মৌলবী সাব নিজের সাবেক অবস্থায় ফিরে এলেন। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তিনি আগের চেয়ে আরো বেশী সচেতন হয়ে উঠলেন। অন্দরে প্রবেশ করেন তো চোখ নত করে আর শকুরণের দিকে তাকালে আপ্‌সেই মুখাবয়ব আরক্ত হয়ে উঠে। এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন কাচুমাচু করেন যেন তার ঋণ পরিশোধ করতে তিনি একান্তই অক্ষম। কিন্তু শকুরণ মিষ্টি হেসে এমন করে তাঁর দিকে তাকায় যেন বিড়াল ইঁদুরের দিকে তাকাচ্ছে---যার পালাবার সব পথ বন্ধ।

এলো শীতকাল।

শীতের রাতগুলোতে মৌলবী সাবের নিঃসঙ্গতা যখন নিরন্তর বাড়তে লাগল তিনি সব দিকে উদাসীন হয়ে উঠলেন। তাই বেশী সময়টা অজিফা পাঠ করে কাটিয়ে দেন। কতিপয় অভিজ্ঞ মুরীদের পীড়াপীড়িতে মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, আরেকটা বিয়ে করবেন তিনি। কিন্তু মুখে এখনো স্বীকার করেন না। তাঁর ইচ্ছে, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী পয়লা স্ত্রীর চেয়ে কম বয়সী এবং সুন্দরী মেয়ে হতে হবে। কিন্তু বিয়েটা পয়লা স্ত্রীর মৃত্যুর বছর পূর্তির পরে হওয়া ভাল। যাতে করে লোকে বলতে না পারে, আসলে মৌলবী দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে পয়লা স্ত্রীর মৃত্যুর অপেক্ষা করেছিলেন। আর এটাও তাঁর বজ্র-কঠিন শপথ যে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে আর কোন পাপাচার করবেন না। কিন্তু তবু মৌলবী সাবের উপর বিপদের ঘনঘটা নেমে এলো। তাঁর মনে হয়, পুরনো দুশমন শয়তান, যাকে তিনি অহর্নিশি অভিসম্পাত দিয়ে ফেরেন. প্রতিশোধ নেবার জন্য পিছে লেগেছে। এবং তাঁর মুখ কলঙ্কিত করার জন্যে শূন্যে নানা রকম জাল ছড়িয়ে রেখেছে।

দুপুর বেলায় মৌলবী সাব খানা খেয়ে কোমরটাকে একটু সোজা করবার জন্যে নিজের বৈঠকখানায় কাত হয়েছিলেন। শকুরণ সম্পর্কে তাঁর মস্তিষ্কে এমনভাবে এলোমেলো ভাবনা ঘনিয়ে আসছিল যেন দুপুরের রৌদ্রতপ্ত আকাশে চিলের আনাগোনা চলছে। ভাবতে ভাবতে শকুরণ তাঁর কাছে এমন মধুময় হয়ে উঠে যেন তাঁর অস্থির দেহে শান্তি প্রদান করবার জন্যেই আকাশ থেকে প্রেরিত হয়েছে এই মেয়েটি। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে একটা পাপ বিভীষিকা মনে হয়। ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবার জন্যে যেন তার প্রয়াস। কখনো তিনি ঠিক করেন, আজই শকুরণকে বিদেয় করে দেবেন। এরকম আগুন নিয়ে কি খেলা করা চলে? কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠে। তিনি কি এমনি মোম যে, পাপাগ্নির একটু আঁচ পেলেই গলে যাবেন?

বৈঠকখানার পেছনের দরজা ভেতর বাড়ীর দিকে। তার সামনে পানির কল। সেখানে কে যেন গুন গুন করে গান গেয়ে স্নান করছে। মৌলবী সাব বোঝেন শকুরণ ছাড়া আর কে হবে! তবু সন্দেহ দূর করাকে তিনি ত্রুটী মনে করলেন না। চুপি চুপি সন্তর্পণে উঠলেন। তারপর কপাটের ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে যা দেখলেন---অবশেষে নিজেকে সামলাতে না পেরে বাণবিদ্ধ শিকারের মতো বসে পড়লেন। এবং অনেকক্ষণ অবধি চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হঠাৎ কে যেন বাইরের দরজার কড়া নাড়ল। মৌলবী সাব ভাবলেন, ঠিক সময়টিতে কোন ফেরেশতা তার ঈমান বাঁচাতে এসেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। বোরকার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটির উজ্জ্বল চামড়া চক চক করছে, যেন ঘন মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে, মৌলবী সাব অভিভূর্তের মতো তাকে দেখছিলেন। তারপর যখন সে সালাম করে তাঁর দেহ ছুঁই ছুঁই করে এক বিশেষ সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে কামরায় প্রবেশ করল, মনে হলো কোন যাদুচক্রে আটকা পড়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন মৌলবী। মেয়েটির নাম জিদ্দন। জিদ্দনের মা দু'মাস আগে মারা গেছে। সে তার পুরনো মুরীদ ছিল। যখনি প্রয়োজন পড়তো এসে তাবিজ ও পানিপড়া নিয়ে নিতো। কিন্তু মৌলবী সাবের কাছে জিদ্দনের একেবারে একাকী আসা এই প্রথম।

জিদ্দন তার ছোট বোন লিডনের জন্যে তাবিজ নিতে এসেছে। সে শেঠ বেনারসী দাসকে মোটেই দেখতে পারেনা এর একটা বিহিত করতে হবে। '---সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল তুমি একটা সাদা মুরগী পাঠিয়ে দিও। ওটার রক্ত দিয়ে সাতটা তাবিজ লিখে দিতে হবে। আর হাঁ, শেঠ বেনারসী দাসকেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। জরুরী কথা আছে।' ---মৌলবী সাব জিদ্দনকে বললেন।

জিদ্দন যাবার সময় মৌলবী সাবকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিতে চাইল। মৌলবী সাব নিতে রাজী হলেন না। অবশেষে জিদ্দনের পীড়াপীড়ি আর মৌলবী সাবের অস্বীকারোক্তি বাড়তে বাড়তে উভয়ের হাতে হাত লেগে গেল। মৌলবী সাব এই স্পর্শে চমকে উঠলেন যেন বিজলীর কারেণ্ট লেগেছে তাঁর হাতে। এবং তিনি জিদ্দনের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে বুকে ধরে আলিঙ্গনাশিস দিলেন। জিদ্দন দ্রুত নোটটি বিছানায় রেখে বোরখা ঠিক করতে করতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল,

'---মৌলবী সাব, আপনি তো আমাদের ওখানে যাননা? আমি আপনার খেদমত করতে চাই।'

অস্থির মৌলবী সাব বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। বুকটা তাঁর এমন স্পন্দিত হচ্ছিল যেন তাঁর বুকে তুলো ধুনা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে দেখলেন শকুরণ এক পোয়ালা চা নিয়ে তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে।

একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার ছেয়ে গেছে। মৌলবী সাব রবারের জুতো পায়ে দিয়ে ধীরে সন্তর্পণে ভেতরে যাচ্ছিলেন। বারান্দায় রঙ্গিলা ধুপিনীর সাথে ধাক্কা লেগে গেল। হাত থেকে তসবিহ পড়ে গেল। তসবিহ তুলবার জন্যে যখন হাত বাড়ালেন, বুঝা গেল না অন্ধকারে কি যে হয়ে গেল। রঙ্গিলা উহ্ করে উঠল। আর মৌলবী সাব জোরে হাত টেনে নিলেন, যেন তার হাতে বিছে কামড়াচ্ছে। রঙ্গিলা শুধু নামেই রঙ্গিলা নয়, ওর স্বভাবটাও রঙ্গময়। বুড়োস্বামীর চোখে ধুলা দিয়ে মহল্লার যুবা বুড়ো সবাই তাকে ভাবী বলে ডাকে। এবং এই সূত্রে সবাই রসিকতা করে তার সাথে। তবে কেউ যদি তাকে বিরক্ত করে, তাকে অতিষ্ঠ না করে ছাড়ে না সে। আর এমন সব উদ্ভট অশ্লীল কথাও বলতে পারে! শ্রোতাদের কানে

তালা না দিয়ে উপায় নেই। মৌলবী হবার আগে মৌলবী সাবের সাথেও রঙ্গিলার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু আজকাল নিজের বুজুর্গীর নিরাপত্তার জন্যে তিনি তাকে দেখলে ঘাবড়ে যান। এবং সহজে কেটে পড়লেই বেঁচে যান। কিন্তু রঙ্গিলা নাছোড়বান্দা। মওকামতো পেলে পুরনো কথা উঠিয়ে খোচা না দিয়ে ছাড়ে না। মৌলবী সাব তখন রীতিমত আরক্ত হয়ে উঠেন।

রঙ্গিলা তাড়াতাড়ি মৌলবী সাবের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, ---'বড় মৌলবী বনে এসেছ। পুরনো খাস্‌লত তোমার এখনো ছাড়লেনা। চিৎকার করলে অবস্থাটা কি হবে শুনি ?'

মৌলবী সাব একেবারে হতবাক। কি জবাব দেবেন তিনি। ওদিকে শকুরণ আওয়াজ শুনে কুপি হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো। রঙ্গিলা বিদ্যুতগতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর মৌলবী সাব তসবির দানা কুড়াতে মাটিতে বসে পড়লেন।

এমনি আরো ছোটখাট চোটের কথা বলাই বাহুল্য। এক দিনে শকুরণ, জিদ্দন এবং রঙ্গিলা তাকে যে নাড়া দিয়ে গেল তা তাঁর ভেতর অবধি গিয়ে পৌঁছল। একেবারে আকুল হয়ে উঠলেন মৌলবী সাব।

কিন্তু তাঁর মনে হয়---তাঁর মর্যাদা এবং আভিজাত্যের শব সামনে পড়ে আছে এবং তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবার জন্যে চারদিক থেকে বহু শকুরণ, জিদ্দন আর রঙ্গিলা দন্ত বিকশিত করে গটগট করে এগিয়ে আসছে। ক'দিন তিনি বড় অস্বস্তি এবং দ্বন্দ্বে কাটিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নিলেন, মাসের পয়লা তারিখে শকুরণকে কাজ থেকে জবাব দেবেন। তারপর কিছু দিনের জন্যে ঘর-বাড়ী ছেড়ে ছেলেমেয়েদের কাছে বোনের বাড়ী চলে যাবেন। সিদ্ধান্তটা নিয়ে তিনি মনে মনে হাসলেন। শয়তান অবশেষে মনে করলো কি ? যত জালই সে বিস্তার করুক তা থেকে মুক্তি পাবার যথেষ্ট শক্তি রাখেন তিনি।

মাসের শেষ দিন রাত্রে খাবার খেয়ে মৌলবী সাব, শকুরণকে ডেকে বললেন, 'দেখ, আমি কাল ছেলেদেরকে দেখার জন্যে বোনের বাড়ী মইনপুর যাচ্ছি। তুমি কাল সকালে হিসাবটা করে নিও। আর বিবি সাবের পুরনো কাপড়গুলোও নিয়ে নেবে।'

শকুরণ মৌলবী সাবের সামনে বসে বাসন-কোসন মায় আঁচল ঠিক করতে করতে বললে---'ওদেরকে এখানেই নিয়ে আসুন না। সেখানে কি ওদের মন টেঁকে ? আর ওরা তো আমাকে পেলে সব কিছু ভুলে যায়।'

এই জবাবে মৌলবী সাব কেমন যেন একটু আত্মীয়তা অনুভব করেন। মনটা তরল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাহ্যিক কাঠিন্য ঠিক রেখে বললেন,---'বেশ, তা পরে দেখা যাবে খন।'

বলতে বলতে তাড়াতাড়ি তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবং মনে মনে ভাবলেন, সবচে' বড় পরীক্ষাতেই তিনি উত্তীর্ণ হলেন। পরেরগুলো তেমন আর কঠিন কি হবে।

কিন্তু মনটা কিছুতেই ভাল হল না। তাই তিনি বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ পায়চারী করে তারপর আলখেল্লাটা গায়ে চাপিয়ে (যেটার পকেটে জিদ্দনের দেওয়া পাঁচ টাকার নোটটা এখনো মচমচ করছে) বেড়াবার জন্যে পথে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের রাত---তার উপর রাত নয়টা। সড়ক, গলি নীরব থমথমে। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক চৌরাস্তায় এসে পড়লেন। এখান থেকে একটি পথ শকুরণের বাড়ীর দিকে, দ্বিতীয় পথটি জিদ্দনের বাড়ী এবং তৃতীয়টি রঙ্গিলার কুটির অবধি গেছে। মৌলবী সাব অনেক ভেবে চতুর্থ পথকেই আপদহীন মনে করে সেদিকে পা বাড়িয়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর মৌলবী সাব এক ঘিঞ্জি গলিতে এসে পৌঁছলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চাঁদের আলো ছাড়া আর সবি নিকষ কালো অন্ধকার। ---গলির শেষ মাথার নিম গাছ অবধি গিয়ে তিনি ফিরে আসবেন ঠিক করলেন। কিন্তু গলির কোথায় যেন হঠাৎ কিসের শব্দ হলো। তিনিও প্রতিশব্দ করলেন। অকস্মাৎ সামনের একটা ঘরের কবাট থেকে হাতছানি, অতঃপর কবাটটি খুলে গেল। মৌলবী সাব ঘাবড়ে গিয়ে নিম গাছের আড়ালে চলে গেলেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে শালোয়ার আর কোট পরা মেয়েটি পায়ে পায়ে নিম গাছ অবধি এলো। তারপর বড় ঘনিষ্ঠ স্বরে বলল,

---'আপনাকে রামু দাদা পাঠিয়েছে বুঝি? পাঁচটা টাকা দিন। আর এ দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ুন।'

পরের দিন মৌলবী সাব শকুরণ থেকে হিসাব নেবার বদলে তাকে বিয়ে করে ফেললেন এবং পীর ফকিরী ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে খালি বোতল ও বাক্স পেটরার একটা ছোটখাট দোকান খুলে বসলেন। তারপর থেকে তাঁর সেই এক কথা, শয়তান মানুষকে নয়, মানুষই শয়তানকে ভ্রষ্ট করে।

১০ই অক্টোবর ১৯৬৩ সংখ্যা সাপ্তাহিক পূর্বদেশ

সাদাত হাসান মাণ্টো

অমৃতসরে আলী মোহাম্মদের একটি মনিহারী দোকান ছিল। খুবই ছোট, কিন্তু তাতে প্রায় সব রকম জিনিসই থাকত। থরে থরে সাজিয়ে এমন করে সে মালপত্র রাখত, মোটেই তেমন ঠাসাঠাসা বিশ্রী দেখাত না।

অমৃতসরের অন্যান্য দোকানীরা চোরাকারবার করতো। কিন্তু আলী মোহাম্মদ সঠিকমাপে ঠিক দরে মাল বেচত। এবং একারণেই অনেক দূর থেকেও লোক তার দোকানেই কেনাকাটা করতে আসত।

আলী মোহাম্মদ ছিল বড় ধর্মভীরু। কাজেই বেশী মুনাফা সে পাপ মনে করত। তাছাড়া একা মানুষ, যৎসামান্য আয়ই তার জন্যে যথেষ্ট।

সারাটা দিনই আলী মোহাম্মদকে দোকানে থাকতে হয়। কারণ সারা দিনই বেচা-কেনা হয়। আলী মোহাম্মদের সে সময়টায় খুবই আফসোস হয় যখন সে কোন খদ্দেরকে একটা 'লাইফবয়' সাবান বা 'কালিফোর্নিয়া পপি' দিতে পারে না। কারণ এসব মাল নেহাতই কম আসে তার কাছে। চোরাকারবার না করা সত্ত্বেও তার জীবনটা দিব্যি খোশহালে চলছে বলতে হবে। হাতে গুণে হাজার দুয়েক টাকা আলাদা করে রেখে দিয়েছে। বয়েসটা আর মানছে না। একদিন সে দোকানে বসে ভাবছিল এখন বিয়েটা সেরে নিলে হয়। আজে-বাজে চিন্তায় মন-মেজাজ বিগড়ে যায় মাঝে মাঝে। বিয়ে করলে জীবনে একটা স্বাদ আসবে। বালবাচ্চা হবে। তখন তাদের মানুষ করার তাগিদে আমি আরো বেশী রোজগার করব।

মা-বাপতো অনেক আগেই বেহেশতবাসী হয়েছেন। ভাইবোন তো ছিলই না। বলতে গেলে একাই এখন। বছর দশেকের সময় খবরের কাগজ বিক্রির কাজ শুরু করে। তারপর ক'দিন কুলপি

মালাইও বিক্রি করল। এমনি করে যখন তার কাছে হাজার খানেক টাকা জমা হলো কিছু মনিহারী মালপত্র নিয়ে দোকান খুলে বসল। যেহেতু সে বড় ইমানদার ছিল কাজেই অল্প দিনেই দোকানটি চালু হয়ে উঠল। বেশ আয় হতে লাগল। কিন্তু আয় নিয়ে তার বেশী মাথা ব্যথা ছিল না, সে চাইত একটা ঘর-সংসার পেতে স্ত্রী-পুত্র পরিজন সহ একটা সুখী সংযত জীবন-যাপন করতে। মাত্র এই একটি নেশা নিয়েই যন্ত্রচালিতের মতো সে সারাদিন দোকানে কাজ করে। তারপর সন্ধ্যায় দোকানপাট বন্ধ করে শরীফপুরে তার ভাড়াটে ঘরটিতে গিয়ে শুয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়া করতো গাঞ্জার হোটেলে। শুধু একবেলা। সকালের চা-নাস্তা বরাদ্দ ছিল জামিল সিং কাটরার শাভে হালুয়াইর দোকোনে।

বিয়ের ইচ্ছাটা ক্রমেই প্রবল হয়ে দেখা দিতে লাগল। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে তাকে কে সাহায্য করবে? অমৃতসরে তার দোস্তদার বলতে কেউ যে নেই।

এসব ভেবে সে বড় হতাশায় পড়ে গেল। শরীফপুরার ঘরটিতে শুয়ে রাতের বেলা সে অনেক কেঁদেছে। কেন তার বাপ-মা এত সকালে মারা গেল।

ইতিমধ্যে সে একটা ভালো বাসাও ভাড়া করে রেখে দিয়েছে। টাকাও জমেছে প্রায় হাজার তিনেক। তবু সে মোটেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে, সে কি করে কি করবে। এমন সময় একদিন পত্রিকায় সে এক বিজ্ঞাপন দেখল। তাতে লেখা ছিল, বিয়ে করতে ইচ্ছুক লোকদের জন্য বিশেষ সুখবর। বি, এ পাস লেডি ডাক্তার---সব রকম পাত্রী আছে, পত্রালাপ অথবা স্বয়ং দেখা করুন।

রোববারে সে দোকান খুলত না। সেদিন সে বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছল। দাড়িওয়ালা সৌম্যদর্শন এক বয়স্ক লোক এসে দরজা খুলে দিল। আলী মোহাম্মদ তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। লোকটি টেবিলের ড্রয়ার খুলে বিশ পঁচিশটি ফটো বের করে টেবিলে মেলে ধরল। এর মধ্যে একটা ছবি আলী মোহাম্মদের বেশ পছন্দ হলো। অল্প বয়েসী ডাগর ডোগর একটি মেয়ে। এজেন্টকে ফটোটি দেখিয়ে সে বলল,

'এই যে এ'টি আমার পছন্দ।' এজেন্ট মুচকি হেসে বলল, 'আরে এযে হীরা পছন্দ করেছ তুমি।'

আলী মোহাম্মদের মনে হলো মেয়েটি যেন এমনি তার হয়ে গেছে। তাই সে বিলম্ব না করে বলল,

'ব্যস জনাব, কথা পাকা করুন।'

'দেখ ভাগ্যবান, মেয়েটি সুন্দরী ত বটেই তার উপর বেশ আলা খান্দানের। তা যাক, তোমার বেলায় বেশী ফিস নোব না।'

'আপনার বড় দয়া হবে তা'লে। দেখুন আমি এতিম। যদি কাজটি করে দেন তাহলে সারা জীবন আপনাকে আমার বাপ মনে করব।'

এজেন্টের দাড়িভরা মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'বেঁচে বর্তে থাক বেটা। আমি মাত্র তিন শো টাকা ফিস নোব তোমার কাছ থেকে।'

আলী মোহাম্মদ একটুও দ্বিধা না করে বলল ঃ

'বহুত শুকরিয়া। আমি মেনে নিলাম।'

বলে পকেট থেকে বের করে তিন খানা শ' টাকার নোট এজেন্টের দিকে এগিয়ে দিল।

দিন তারিখ ধার্য হয়ে গেল। মেয়ে তুলে দেয়া হলো। আলী মোহাম্মদ তার সেই ভাড়াটে বাড়ীতে বউ নিয়ে এলো। বাসর শয্যার নানা স্বপ্ন তাকে বিহ্বল করে দিতে লাগল। কিন্তু কনের মুখের ঘোমটা তুলে সে একেবারে হতবাক। নেহাত বদসুরত মেয়ে। এজেণ্ট তাকে মস্তবড় একটা ধোঁকা দিয়েছে। আলী মোহাম্মদ একেবারে ভেঙে পড়ল।

পরদিন সে দোকান খুলল না। দু'হাজার টাকা দেনমোহর রাতেই পরিশোধ করে দিয়েছিল। এজেন্টকে দিয়েছিল তিনশ' টাকা। আর তার কাছে রয়েছে মাত্র সাতশ টাকা। সে মনস্থ করল, এই পাপিষ্ঠ শহরটাই ছেড়ে দেবে সে। পরদিন নাম মাত্র দামে পাঁচ হাজার টাকায় দোকানটা বিক্রি করে টিকিট কেটে লাহোর চলে গেলো।

লাহোর যাবার সময় গাড়ীর মধ্যে এক পকেটমার আবার তার সব টাকাগুলো নিয়ে নিল। বড় বিপদে পড়ে গেল সে। তবু সে ভাবল, আরও ভালোর জন্যেই খোদা এসব করিয়েছেন। তবে সৌভাগ্য-ক্রমে তার অন্য পকেট যেহেতু কাটেনি, আর তাতে যেহেতু ছিল সর্ব-মোট দশটাকা এগার আনা, তাই দিয়ে সে লাহোরে ক'দিন বেশ কাটাল। তারপর এলো উপোস থাকার পালা।

ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় সে চাকরির সন্ধান করলো। কিন্তু কোন ফল হল না। ফলে সে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু তার তেমন সাহস ছিল না। তাছাড়া একদিন সে যখন রেল-লাইনের উপর শুয়ে পড়েছিল, ট্রেনটা আসতে আসতে হঠাৎ কাঁটা বদল করে অন্য দিকে চলে গেল। বলাবাহুল্য ট্রেনটা সেদিকেই যাবার ছিল। সে ভাবল, শেষে মৃত্যুও তাকেও ধোঁকা দিতে লাগল। সুতরাং সে আত্মহত্যার খেয়ালটা আপাতত ছেড়ে দিয়ে এক হলুদ মরিচ পেষা চাকা ঘোরানোর কাজে বিশ টাকা বেতনে চাকরি নিল।

সে প্রথম থেকেই জেনে নিয়েছে এই দুনিয়াটা ধোঁকারই জায়গা শুধু। কারণ তার কোম্পানীতে হলুদে হলুদ মাটি আর মরিচে লাল ইটের গুঁড়ো মেশানো হতো।

দু'বছর ধরে সে এই চাকায় কাজ করল। চাকার মালিক মাসে প্রায় সাত শ টাকা রোজগার করত। এতদিনে আলি মোহাম্মদের কাছেও পাঁচশ টাকার মতো জমা হয়েছে। একদিন যে ভাবল সারা দুনিয়াটা যখন ধোঁকাই ধোঁকা, তা'লে সেই বা কেন একটা কিছু ধোঁকার কাজ করবে না?

এই ভেবে সে এক আলাদা চাকা তৈরি করে হলুদ মরিচে ভেজাল দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বেশ মোটা আয় হতে লাগল তার। একদিন আবার বিয়ে করার শখও জেগেছিল। কিন্তু প্রথম রাত্রের সেই স্মৃতি মনে পড়তেই সে গুম মেরে গেল।

দিনগুলো তার সুখেই যাচ্ছিল। হলুদ মরিচে ভেজাল দেয়ার কাজ এখন তার নখদর্পণে। এমন সময় একদিন পুলিশ এসে তার চাকা ধরল। হলুদ মরিচের নমুনার কেমিক্যাল একজামিন হল। তারপর যখন ভেজাল প্রমাণ হলো, আলী মোহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

লাহোরে জামানত দেবার মতো কেউ ছিল না তার। সুতরাং কয়েকদিন হাজতের পর আদালতে পেশ করা হলো, আদালতে তার তিনশ' টাকা জরিমানা ও এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হলো। জরিমানা সে দিয়েই দিয়েছিল; কিন্তু এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে রেহাই পেল না। এই এক মাস তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় গেল। সে তখন ভাবল, কেন সে এই দুষ্কর্ম করতে গেল?

কেন সে এই বেঈমানী করতে গেল যা তার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। না, এবারে আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। জীবনের কোন কূলই যখন আর থাকলো না; বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

তাই যখন সে জেল থেকে ছাড়া পেল আত্মহত্যার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলো। প্রথম সাতদিন কিছু মজুরী করে দু'তিন টাকা জমা করল। তারপর ভাবল, মরার জন্যে ভালো বিষ কোথায় পাওয়া যায়? নানান সূত্রে সে কেবল একটি উৎকৃষ্ট বিষের নামই শুনতে পেল। তা হলো সংখিয়া। কিন্তু সংখিয়াই বা কোথায় পাওয়া যায়?

অনেক তালাশ করার পর অবশেষে এক দোকানে সংখিয়া পাওয়া গেল। রাতের বেলা এশার নামাজ পড়ল এবং খোদার কাছে হলুদ মরিচের ভেজালজনিত পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারপর সংখিয়া খেয়ে ফুটপাতে শুয়ে রইলো।

সে শুনেছিল, এ বিষ খেলে নাকি মুখ দিয়ে লালা বেরোয়, সারা দেহে ভীষণ জ্বালা ধরে যায়। তারপর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যু হয়। সারারাত মৃত্যুর স্বপ্ন নিয়ে কাটল তার। কিন্তু তার কিছুই হলো না।

সকালে উঠে সে দোকানীর কাছে গিয়ে ভর্ৎসনা করে বলল, 'আরে ভাই কি রকম সংখিয়া দিয়েছিলে যে, আমি এখনো মরতে পারলাম না'।

দোকানী দীর্ঘশ্বাস তুলে নাকি সুরে বলল,

'কি বলব ভাই, আজকাল সব জিনিসেই যে ভেজাল---আমি কি করব ভাই।'

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection
বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

২রা মে ১৯৬৫ সংখ্যা দৈনিক পাকিস্তান

ডাকাত

খোদেজা মাসতুর

উট যখন একটা নোংরা অন্ধকার বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়ল, উট-চালক নাকিলটা উটের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল এবার। উটের গলার ঘণ্টা ঠুন ঠুন করে বাজছিল। ভোর হতে তখনো অনেক দেরি। দূর পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাদা মেঘের আল্পনা দেখা দিয়েছে পূর্বাকাশে। সবেমাত্র মার্চ মাস শুরু হয়েছে। অথচ এখনো কন্‌কনে শীত।

চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। হাওদাতে অল্প বয়সী যে ছেলেটি বসে-ছিল, মাঝে মাঝে ভয় করছিল তার। দূরের কালো কালো পাহাড় দেখে মনে হচ্ছিল একদল ডাকাত আসছে এদিকে। ডাকাত এলে কি আর নেবে! কিছু কাপড়-চোপড় আর গোটা চল্লিশেক টাকা। এ সামান্য জিনিসের জন্য ডাকাতদের সাথে হাতাহাতি আর মারামারি তো আর করা যাবে না।

ছেলেটি একবার উট-চালকের দিকে তাকালো। একটা কালো ছায়ার মত উটের পাশাপাশি হাঁটছে সে।

দেড় দু' মাইল আসার পর সূর্য দেখা দিল। এখন সবকিছু পরি-ষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছেলেটি একটা লম্বা শ্বাস টেনে নড়েচড়ে বসল। উট ছন্দোবদ্ধ তালে চলেছে। ছেলেটি দু'দিকের পাকা যবের খেত দেখছিল। হাওয়ার প্রবাহে দুলছিল যবের শিষগুলো। উট-চালক এখন পেছনে পেছনে হাঁটছে।

ছেলেটি তার পড়ার কথা ভাবছিল। ভাবছিল কষ্ট করে সে পড়েছে আর তার বদৌলতে আজ সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চলেছে। পরীক্ষার পর সে লাহোরে থেকেই পড়াশুনা করবে, কত কষ্টে সে বাবাকে রাজী করিয়েছে। তার বাবা মূর্খ। দাদাও তার মূর্খ ছিল। তবে তার দাদার বাবা শিক্ষিত ছিলেন। তার কেতাব-পত্র তাদের

লাহোর সিন্ধুকটায় রয়েছে। সে সব বই-কেতাব পড়েই আরো পড়া-শুনার প্রতি তার আগ্রহ জন্মেছে। সে সব বইয়ে অনেক ভাল ভাল কথা আছে। একটাতে লেখা ছিল, বিদ্যার্জনের জন্যে দরকার হলে চীন দেশেও যাওয়া উচিত। চীন যাওয়া তো আর হবে না। তবে লাহোর যেতে তাকে কেউ বাধা দিতে পারল না। শুধু পড়াশুনার খাতিরেই তাকে এ দুর্দিনে দূর পথে রওনা দিতে হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু সমাজের অবস্থা বিগড়ে গেছে।

ক্ষুধা, বেকারত্ব, চুরি, ডাকাতি এবং নানাবিধ অপকর্ম দিন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভাগ্যিস, পথে-ঘাটে চোর-ডাকাতের সাথে দেখা হয়নি। দেখা হলে সব কিছু নিয়ে নিত। একবার তো তাদের গ্রামের মধ্যেই একদল ডাকাত ঢুকে পড়ছিল। লোকদের সাথে সংঘর্ষ হওয়াতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবে পথে-ঘাটে যাদেরকে পেয়েছিল তাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়নি। তারপর থেকে সন্ধ্যার পর লোকরা আর বাড়ীর বাইরে থাকে না।

এখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। উট চালক তার মাথার পাগড়ী আর জুব্বাজাব্বা খুলে হাওদাতে রেখে দিল। সে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উটের অনেক পেছনে পড়ে গেছে। এক সময় সে উটকে থামিয়ে খেতের আইলে বসে পড়ল।

ছেলেটি গাঁটে লুকনো ঘড়িটা দেখল। বাস আসতে এখনো এক ঘন্টা। তবু এ সামান্য রাস্তাটা শেষ করে তবেই বিশ্রাম নেয়া দরকার।

'একি, ক্লান্ত হয়ে পড়লে?'

'ক্লান্ত তো হবই। এতগুলো পথ।'

উট-চালক একটু হেসে বলল।

'বাস আসতে আর মাত্র এক ঘন্টা আছে।'

'কোন চিন্তা নেই দাদামণি। আধ-ঘন্টা আগে আমরা পৌঁছে যাব। একটু জিরিয়ে নিই।'

দু পুত্তুর আনারাঁ দে
ছাউ দুখ ছুন ছুন কে
—রুন্দে পাথর পাহাড়া দে----।

ছেলেটি উট-চালকের ক্লান্তি নিজের মন দিয়ে উপলব্ধি করল। একটা স্নিগ্ধ শ্বাস টেনে ভাবল, ধর্মে আছে সব মানুষ সমান। অথচ এটা কেমন সমতা? জমিদারের ছেলে বলেই হাওদাতে বসবে, আর উট-চালক বেচারী মাইলকে মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসবে। এখন

মসজিদে গিয়ে নামাজ-রোজা করা পর্যন্তই ধর্মের সীমা। বই-কেতাবের ধর্ম তো এটা নয়।

কতক্ষণ জিরিয়ে উট-চালক আবার উঠল। উটকে চলতে হুকুম করে নিজেও চলতে শুরু করল তার পিছু পিছু। এখনো সে গানটি নিয়ে গুন গুন করছিল।

গন্তব্যস্থলে পেঁছে উট-চালক উটকে বসতে আজ্ঞা করল। নিরাপদে পেঁছিল বলে খোদার শোকরিয়া আদায় করল।

বাস স্টেশনে দূর দরাজ থেকে অনেক লোকজন এসেছে। বেশ সরগরম স্টেশনটি। লোকেরা জোরে জোরে কথাবার্তা বলছিল। চা এবং লসসির দোকানের কাছে কিছু লোক জটলা পাকিয়েছে। উট-চালক একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসে আরাম করছিল। উটটা এক-দু' কামড় ঘাস খাবার চেষ্টা করছিল।

ছেলেটি দু কাপ চা নিয়ে এক কাপ উটচালককে দিল, এক কাপ নিজে পান করল। ড্রাইভার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাসের দিকে রওনা দিল। দূর দূর থেকে লোকেরা বাস ধরবার জন্যে দৌড়ে দৌড়ে আসছিল। ড্রাইভার তাদের দিকে আয়েশী ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল। কাছে আসতেই ঝুঁকে গিয়ে হাত মিলিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল এবং বাসে বসে পড়বার জন্যে বলল। উট-চালক ছেলেটির সাথে হাত মিলাল এবং সাবধানে থাকার উপদেশ দিয়ে নেমে পড়ল।

কাঁচা রাস্তাটুকু পেরিয়ে বাস পাহাড়ী রাস্তায় মোড় নিল। এক-দিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে হাজার হাজার ফিট গভীর খাদ। নিরাপদে পার হয়ে যাবার জন্য লোকেরা দোয়া-দরুদ এবং কলেমা পড়তে লাগল। পথ যখন অনেকটা নিরাপদ মনে হল, লোকেরা জোরে জোরে কথাবার্তা বলতে লাগল।

ছেলেটি উঁচু পাহাড় এবং পিচ ঢালা রাস্তা জীবনে এই প্রথম-বারের মত দেখল। অভিভূত হয়ে দেখতে লাগল সে। লোকগুলো কথাবার্তা না বলে এসব দৃশ্য কেন দেখছে না? পাশের লোকটি বলল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ এবং যাচ্ছ কোথায়?'

ছেলেটি কোত্থেকে এসেছে তা জানাল এবং পড়াশুনার জন্যে লাহোর যাচ্ছে সেকথা বলল। বলে লোকটিকে সে বাইরের দৃশ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল। লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল। লাহোর গিয়ে পড়াশুনা আর দৃশ্য উপভোগ---এসব যেন নেহাতই

নিরামিষ তার কাছে। অতঃপর লোকটি অপর পাশের লোকটির সাথে সে অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত সম্পর্কে গল্প জুড়ে দিল।

বাস বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একটা ছোটমত জেলা শহরে যেয়ে থেমে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাস এখন সারা রাত এখানে থাকবে। পরদিন ভোরে লাহোর রওয়ানা দেবে।

ছেলেটি আল্লাদত্তের হোটেলের সামনে তার মালপত্র রেখে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। হোটেলের মালিক সিগারেট টানছে আর ছোকরাদের এটা-ওটা বলে শাসন করছে। দোকানী ছেলেটিকে বলল,

'শুধু খাবে, না থাকবেও।'

'থাকবও, খাবও।'

'পয়সাকড়ি এনেছ তো? তোমার আম্মা পয়সাকড়ি দিয়েছে তো?'

দোকানীর এধরনের ঠাট্টা শুনে ছেলেটি রেগে গেল। ঝট করে পকেট থেকে একটা টাকা বের করে সশব্দে টেবিলে রাখল। টাকাটা দেখেই দোকানী চিৎকার করে হুকুম করল,

'এক প্লেট তরকারী, দুটো রুটি আর বিছানা করে দে।'

'দুটো কামরাই ভর্তি। কোন বিছানা খালি নেই।'

একজন চাকর ছোকরা জবাব দিল। 'খালি নাই বললেই হলো। নূর মোহাম্মদের ওখান থেকে একটা পালং নিয়ে আয়। বলবি যে আমি বলেছি। ওটা এনে বড় কামরায় জায়গা করে দে।'

ছেলেটি খাবার খেয়ে উঠে দাঁড়ালে একজন চাকর ছোকরা তার বাক্স এবং এটা ওটা নিয়ে বড় কামরায় গেল। কামরাটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। ছ'খানা পালং পাশাপাশি এমনভাবে খাটানো হয়েছে যে, একটুও ফাঁক নেই। বাইরের গ্যাস বাতির আলো আধখোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করছিল। পাঁচটা সিটে আগে থাকতেই লোক এসে শুয়ে পড়েছে। তার আসা দেখতে পেয়েই সবাই উঠে বসল। আবছা আলো তার বড্ড খারাপ লাগছিল। এ আলোতে এক অক্ষরও পড়া যাবে না। বিছানায় বসে পড়ে চাকর ছেলেটিকে সে একটা লণ্ঠন আনতে বলল।

'লণ্ঠন দিয়ে কি হবে?'

লোকদের মধ্য থেকে কে একজন বড় কর্কশ গলায় বলল। 'পড়বার জন্যে। না পড়লে আমার চোখে ঘুম আসে না।'

'এক আনা লাগবে।' চাকরটা বলল।

'দোব এক আনা।'

চাকর ছেলেটি লণ্ঠন নিয়ে এলে লোকগুলোর দিকে তাকাল। সবারই বিকট চেহারা। লম্বা ঘন বাঁকানো গোঁফ। পাঁচজন লোকের মধ্য থেকে হঠাৎ একজনকে চেনা চেনা মনে হল ছেলেটির। ছেলেটি বার বার তাকে দেখতে লাগল। তার চেহারাটাই সবচেয়ে বেশী বিটকেলে।

'তুমি আমাকে চেন নাকি?'

'মনে হয় তোমাকে আমাদের গাঁয়ে দেখেছি।'

'তোমাদের গাঁয়ের কি নাম?'

ছেলেটি গ্রামের নাম বলে দিল। হঠাৎই তার সব কথা মনে পড়ে গেল। যেবারে গ্রামে ডাকাত পড়েছিল, একজন লোকের পেছনে সবাই নাকি ধাওয়া করছিল। সে নাকি বড় ডাকাত। তার চেহারাটা ঠিক এ লোকটির মত।

গ্রামের নাম শুনতেই লোকটি একটা চাপা অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

'আমি তোমাদের গাঁয়ে কখন গিয়েছিলাম?'

'কখন গেছ তা মনে নেই। তবে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কখন গিয়েছ না গিয়েছ---ওসব কিছু মনে নেই। তুমি আদৌ আমাদের ওদিকে গিয়েছ কিনা, তাই বা কে জানে। হতে পারে এ চেহারার অন্য কাউকে দেখেছি।'

বলেই ছেলেটি কাঁপা কাঁপা হাতে বাক্স খুলে বই বের করতে লাগল। কি দরকার ছিল এসব কথা বলার? গ্রামের নামটাই বা ঠিক ঠিক কেন বলতে গেলাম।

বই বের করে সিথানে লণ্ঠনটা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ছেলেটি। একটা বই খুলে তাতে চোখ নিবদ্ধ করল। কিন্তু কান খাড়া করে লোকগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

চেনা চেনা লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'লাহোর। সেখানে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।'

বলেই ছেলেটি বই রেখে বসে পড়ল। আবার বলল,

'আমার পড়ার খুব ইচ্ছা। হাদিসে আছে, পড়ার জন্যে দরকার হলে চীন দেশেও যাও।'

'চিন্তা নেই. আমি তোমাকে চীন অবধি পৌঁছে দেব।'

অন্য একজন লোক গোঁফে তা দিয়ে হাসতে হাসতে বলল।

'চীন যাবার কপাল কি আর আমাদের আছে ? আমরা গরীব মানুষ। তবে যেদিন বেশী পড়ালেখা শিখব সেদিন হয়ত আরো বেশী পড়ার জন্যে বিদেশে যাব।'

ছেলেটি এমন ভাব দেখিয়ে বলল, মনে হল, চীন অবধি পেঁৗছে দেবার আসল অর্থ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে। অথচ সে সবই বুঝতে পারছে। এখন তো সে বেরুতেও পারবে না। বেরুতে দেবেও না তারা। কি করবে সে, রাতও অনেক হয়ে গেছে। কোন মতেই মালিককে খবরটা দেওয়া যাবে না।

কেউ কোন জবাব দিলনা দেখে ছেলেটি আরও বইতে মন দিল। এই শীতের দিনেও তার গা ঘামে ভিজে গেছে। কিন্তু ভয়কে সে থোড়াই কেয়ার করে। সে যে ভয় পেয়ে গেছে বাইরে থেকে মোটেই তা টের করার উপায় নেই।

'ঠিক আছে রাত ভর তুমি পড়াশুনা কর।' একজন একটু ধমকের সুরেই বলল।

'না তা করব কেন ? তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হলে আমি বাতি নিচে রেখে দিচ্ছি। কারণ কারো ঘুমের ব্যাঘাত করে পড়াশুনা করা হারাম।'

বলেই লণ্ঠনটা পালং-এর নিচে রেখে দিলো ছেলেটি। এখন ঘরটিতে আবার জমাট অন্ধকার।

'বেশ চালাকতো তুমি।' একজন বলল।

'এতে চালাকী কি আছে ? এসব আমি বইতে পড়েছি।' ছেলেটি বলল।

'আমিও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ছিলাম। খোদার হুকুম ছিল না, তাই আর পড়তে পারলাম না।' চেনা চেনা লোকটি বলল।

'বাইরে পেশাব টেশাব করতে যাবে না?' একজন আজব ধরনের সুরে বলল।

'না, আমি সেরে এসেছি।' বলেই ছেলেটি পাশ ফিরে শুল। ছেলেটির জবাব শুনে সবাই একসাথে হেসে উঠল। অনেকটা ভূতুড়ে হাসির মত। কিন্তু ছেলেটি তাতে একটুও নড়ল না।

বাইরের গ্যাস বাতিও ততক্ষণে নিভে গেছে। রাস্তায় দু'চারটা বেওয়ারিশ কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। একজন উঠে দরজাটা বন্ধ করে সশব্দে শিকলটা লাগাল। ছেলেটি আস্তে আস্তে চাকুটা খুলে তার বালিশের নিচে রাখল। আপদ বিপদের কথা চিন্তা করে মা তাকে চাকুটা দিয়েছে।

ওরা পাঁচজন এখন একেবারে চুপ করে আছে। তাদের শ্বাস টানার শব্দ শুনে মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে পথ চলার ক্লান্তি, ওদিকে ভয়। তার ঘুম এসেও আসছিল না।

এভাবে ঘন্টা দেড় ঘন্টা অতিবাহিত হল। হঠাৎই---কে একজন তার বিছানার পাশে একটা ঘুষি মারল। চকিতে ছেলেটির সারা দেহ পাথর বনে গেল। ইচ্ছে করেও সে নড়তে পারছে না।

'ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু নড়ছেওনা।'

যে লোকটি ঘুষি মারল সে আর চারজনকে জানিয়ে দিল।

'বড্ড চালাক ছেলেটি।' অন্য জন বলল। 'সে আমাকে চিনে ফেলেছে, অথচ স্বীকার করতে চায় না।'

চেনা চেনা লোকটি বলল, 'এখন সারা রাত জেগে থাকতে হবে। একটু ঘুমিয়ে পড়লেই ছোকরাটা বাইরে গিয়ে সবাইকে বলে দেবে।'

'না হয় পাজী ছেলেটাকে শেষ করে দাও। আমরা কিছুক্ষণ পর অন্য দিকে কেটে পড়ব।'

একথা শুনে ছেলেটির কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে মা বাপ ভাই বোন সবাইর কথা মনে পড়ল তার। তারপর দোয়া দরুদ পড়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

'এত তাড়া কিসের? ঘুম যদি আসে তখন দেখা যাবে।' সম্ভবত চেনা চেনা লোকটি বলল।

যাক, কিছু সময়ের জন্যে বেঁচে থাকা যাবে দেখছি। সে মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করল রাতভর ওদের যেন আর ঘুম না আসে।

'আচ্ছা, তোমার সেই মেয়েটির কি খবর আরতো কিছুই শুনলাম না।'

'ও তার কথা বলছ? মাত্র দশ দিন রেখেছিলাম কাছে। তারপর শেষ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। ক'দিন আর সাথে সাথে রাখা যায় বলো। চারদিকে পুলিশ ডি ডি করছে। একবার ছাড়া পেলে আমার আর উপায় থাকত?'

ছেলেটি হঠাৎ মাংস পোড়ার গন্ধ পেল যেন। একসময় মনে হল তার গালেও আগুন লেগেছে। অনেক সাবধানে চোখ খুলে সে তার আপাদমস্তক দেখল এবং চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'কিন্তু তোর সাথে তো বেশ ইয়ে ছিলরে মেয়েটির। মেয়েটির জন্যে আতরের শিশি কিনে নিয়েছিলি। যখন মেয়েটির লাশ আগুনে পুড়ছিল নিশ্চয়ই আতরের গন্ধ পেয়েছিস তুই।'

এমন চমৎকার রসিকতা শুনে সবাই একসাথে হেসে উঠল।

'আসলে মেয়েটিই আমাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু মেয়েদের ভালবাসায় তোয়াক্কা করার মত গর্দভতো আমি ছিলাম না। মারবার জন্যে যখন ছোরা বের করলাম, মাটিতে বসে পড়ে বলল তোমার হাতে মরতে পেরে আমি ধন্য হচ্ছি।'

সবাই চাপা হাসছিল।

'মনে করেছিল ছাড়া পাবে। ছাড়া পেলেই বুঝবে মজাটা। একেবারে লাল ঘরে পৌঁছে দিতো।'

'ছোরা দেখে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।'

'না তেমন মনে হলনা। আমার দিকে এমন করে তাকালো, মনে হল কত ভালবাসে আমায়।'

'খুবতো ধোঁকাবাজ ছিল।'

'আরে ইয়ার, একটা মজার গল্প বলছি শোন্।'

'বল্।'

'যেবারে পুলিশ আমার পেছনে ধাওয়া করছিল, আমি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে একটা জংগলে ঘাপটি মেরে রইলাম। ইমানে বলছি পুরো দুদিন উপবাস ছিলাম। শেষে একদিন অধৈর্য হয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লাম। খোদার কুদরত দেখো, দশ এগার বছরের একটা ছেলে দোকান থেকে রুটি কাবাব কিনে বাড়ী ফিরছিল, আমি তার পিছু নিলাম। একটা নিরাপদ জায়গায় এসে আমি তার ঘাড় ধরে রুটি দিতে বললাম। ছেলেটি আমার পেটে একটা লাথি মারল কিন্তু রুটি হাতছাড়া করল না এমন পাজির পাজি ছেলেটি।'

'রুটির কি দরকার। তুইতো লাথিই খেলি। লাথিতে পেট ভরে না?'

সবাই আবার একচোট হেসে নিল।

'লাথি তো খেয়েছি। আমিও ওর ঘাড়টা ধরে মটকে দিলাম। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটি কিন্তু তবু হাতের রুটি ছাড়াতে পারিনি। সেই লাথি খেয়ে তিনদিন অবধি আমার পেট ব্যথা ছিল।'

আবার একসাথে হেসে উঠল তারা। একজন হঠাৎ সন্দেহ করে বলল।'

'ছেলেটি আবার জেগে আছে কিনা কে জানে।'

'জেগে থাকলেইবা কি? বিদ্যা শিক্ষা করার জন্যে ওকে চীন দেশে পৌঁছে দেব।'

আবার হাসল সবাই। একজন পরীক্ষা করার জন্যে তার পালংটা নেড়ে চেড়ে দেখল। ছেলেটার কান গরম হয়ে উঠলো।

'দিব্যি ঘুমাচ্ছে ছেলেটি।'

'মনে হচ্ছে শশুর বাড়ীতে ঘুমাচ্ছে।'

'সে ঘুমাচ্ছে, আর তোমরা হতভাগারা জেগে আছ।'

'আমরা ঘুমাতে চাইলে কে আমাদেরকে বাধা দিতে পারে ওস্তাদ ?

'যে বাধা দিচ্ছে, সেতো দিব্যি ঘুমিয়েই আছে, আর-------'

'দাঁড়াও ওস্তাদ আমরাও ঘুমাব। ছোঁড়াটাকে মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ছেলেটির পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন লোপ পেয়ে আসছিল। এক সময় সে বেহুঁশ হয়ে গেল।

কয়েকঘন্টা পর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল চোখ টান টান করে চারদিকে তাকাল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না এখন সে কোথায় আছে। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন তার পুরোপুরি সম্বিৎ ফিরে এলো তখন সব কথা মনে পড়ে গেল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, দরজা খোলা। লণ্ঠনের চিমনীটা কালো হয়ে গেছে। দরজাটা একেবারেই খোলা। রাত ফুরিয়ে এসেছে। রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ী যাচ্ছে। গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ অনেক দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়লো ছেলেটি। বাইরে লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। দোকানের বাইরে চুলাতে চায়ের পানি গরম হচ্ছে। ক'জন লোক বাসগুলোকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। ছেলেটি বাতি নিভিয়ে দিয়ে বইগুলো বাক্সে পুরে নিল। বিছানা তুলে নেবার আগে ছেলেটি চাকুটা তালাশ করতে লাগল। হঠাৎই ধারাল চাকুটির পাশে বিশটি টাকা এবং একটি চিরকুট কুড়িয়ে পেল সে। চিরকুটে লেখা ছিল ঃ

'যারা পড়াশুনা করে তারা কত সুখে নিদ্রা যেতে পারে। এই টাকা কটা তোমার ফিসের জন্যে দিলাম। চাকুটা আর সাথে রেখো না। ইতি

—যাকে তুমি চিনে ফেলেছিলে।

উর্দু ডাইজেস্ট থেকে অনূদিত। রবিবার ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ বাং দৈনিক পাকিস্তান।

সা'দত হাসান মাণ্টো

ঈশ্বরসিং হোটেলের কামরাতে ঢুকতেই কলাবন্ত পালং থেকে উঠে তার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকালো এবং দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল। রাত বারটা পেরিয়ে গেছে। সারা শহরে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে তখন।

কলাবন্ত কাউর পালং-এর উপর ধপাস করে বসে পড়ল। ঈশ্বরসিং কৃপাণ হাতে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সে ভাবেই ভাবলেশহীন দাঁড়িয়ে রইলো এক কোণে। কিছু সময় কেটে গেল এভাবে। কলাবন্ত এবার পা দুটো পালং-এর নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে অন্য রকম করে বসল। এবং পা ঝুলাতে লাগল। এরপরও ঈশ্বর সিং কিছু বলল না।

ভরা গা-গতর, বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ, কিশোরের মত হালকা এক পোঁচ গোঁফরেখা এবং ঘনকালো কেশদাম মিলিয়ে কলাবন্ত কাউরকে বেশ রাশভারী-যৌবনদীপ্ত মনে হয়।

ঈশ্বরসিং মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। মাথার পাগড়ী আস্তে আস্তে ঢিলা হয়ে যাচ্ছিল তার। কৃপাণটা হাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম করছিল। কিন্তু দেহের বাঁধন দেখে মনে হচ্ছিল সে একজন শক্তসামর্থ্য সাহসী পুরুষ।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটল আরো। কলাবন্ত তার জ্বলজ্বল চোখ দুটো হঠাৎ আনত করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ঈশ্বর সিঁয়া।'

ঈশ্বর কোনমতে ঘাড়টা তুলে কলাবন্তর দিকে তাকাল। কিন্তু তার দৃষ্টিবাণ সহ্য করতে না পেরে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

কলাবন্ত চিৎকার করে উঠল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ'---সহসা স্বরটাকে আবার সামলে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আস্তে করে বলল, 'কোথায় ছিলে তুমি এতদিন ?'

ঈশ্বরের সাদা ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, 'জানিনা কলা।

কলাবন্ত জ্বলে উঠল, 'এটা কি রকম জবাব হল ?'

ঈশ্বরসিং কৃপাণটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে পালং-এ সটান এলিয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হলো সে যেন কতদিনের রোগী। কলাবন্ত পালংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল সারাটা বিছানা জুড়ে শুয়ে আছে সে। কলার মনটা একটু নরম হয়ে এলো। কাছে এসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'কি হয়েছিল তোমার ?'

ঈশ্বর সিং অপলক চোখে ছাদ দেখছিল। হঠাৎই দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে কলাবন্তর চেহারাটায় তন্ন তন্ন করে কি খুঁজতে লাগল---'কল্লাবন্ত' ----ভরা কণ্ঠে ডাক দিল সে। কলাবন্তও গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল, 'বল, শুনছি।'

ঈশ্বর সিং পাগড়ীটা খুলে ফেলল। আশ্রয়কাতর একটা দৃষ্টি নিয়ে কলাবন্তর দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ তার চর্বিভরা পেটে একটা গুঁতা মেরে চুল ধরে টান দিয়ে নিজে নিজে বলতে লাগল, 'মাথাটাই বিগড়ে গেছে আমার কলা।'

কলাবন্তর আঁচড়ানো চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। আংগুল দিয়ে চুলগুলো ঠিক করতে করতে প্রেমসিক্ত স্বরে বলল, 'আসলে এতদিন কোথায় ছিলে তুমি সিয়াঁ ?'

ঈশ্বরসিং আড়চোখে একবার কলাবন্তর দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, 'কবরে'---বলেই কলাবন্তর বাহু দুটি জাপটে ধরে বলল, 'গুরুর কসম করে বলছি, তোর মত মেয়ে আর হয়না।'

একটা বিলোল ভঙ্গিতে কলাবন্ত ঈশ্বরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, 'দোহাই, তুমি সত্য কথাটা বলো, শহরে গিয়েছিলে বুঝি ?'

'না।'

কলাবন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে বলল, 'না, তুমি শহরেই গিয়েছিলে। আমার কাছে লুকালে কি হবে, তুমি অনেক টাকা খুইয়ে এসেছ।'

'বাপের জন্ম না, যদি তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলি।'

কলাবন্ত একটু চুপসে গেল। তারপর হঠাৎই জ্বলে উঠে বলল, 'কিন্তু তোমার সে রাতে কি হয়েছিল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বেশ ভাল মনে ছিলে। শহর থেকে যে গয়নাগুলো এনেছিলে, আমাকে পরতে দিলে, বড় হাসি খুশী ছিলে, জানিনা হঠাৎই তোমার কি হল, উঠেই কাপড় পরে বেরিয়ে গেলে।'

ঈশ্বর সিং-এর মুখাবয়ব পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করল। কলাবন্ত তা লক্ষ্য করে বলল,

'এই তো তোমার চেহারা কেমন হয়ে গেছে। কসম করে বলছি, সিঁয়া, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কিন্তু আছে।'

'আমার মাথার দিব্যি, সত্যি কিছু হয়নি।'

ঈশ্বর সিং-এর স্বরে তেমন জোর নেই। কলাবন্তর সন্দেহটা আরো গাঢ় হয়ে আসে। ঠোঁট দুটো বজ্রের মত এঁটে বলল,

'সিয়াঁ, কি হয়েছে তোমার, আট দিন আগে তুমি যেমন ছিলে, আজ তার কিছুই নেই তোমার মধ্যে।'

ঈশ্বর একদম উঠে বসল। মনে হল কে যেন তার উপর হামলা করেছে। কলাবন্তকে কাছে টেনে বসিয়ে বলল,

'কে বলে আমি বদলে গেছি, আমি তো আগের মতই কলা।'

'কিন্তু সে রাতে তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

'জাহান্নামে গিয়েছিলাম।'

'বলবে না?'

'বলার কিছু থাকলে তো বলব।'

'আমার মাথা খাও যদি সত্যি কথাটা না বল।'

ঈশ্বর সিং কলাবন্তর কাঁধে হাত দুটো তুলে দিয়ে মুখটা কানের কাছে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হল। তারপর দু'জন একসাথে হেসে উঠল।

ঈশ্বর সিং হাসির শেষ রেশটুকু টেনে নিয়ে বলল, 'যা হবার হয়েছে, এখন রেখে দাও দেখি ওসব।'

কলাবন্তর নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে সে বলল, 'ঠিক আছে, মাটি দিলাম।'

ঈশ্বর সিং তার বাহু সাপটে ধরে জোরে চাপ দিল। কলাবন্ত কঁকিয়ে উঠে সরে গিয়ে বলল, 'ইতরামি করোনা বলচি, বড্ড ব্যথা করে।'

ঈশ্বর সিং উঠে গিয়ে আবার জড়িয়ে ধরল তাকে। এবং আবেগ-ভরে এটা ওটা বলে তাকে কাবু করতে লাগল। শেষ অবধি সে একেবারে গলে গেল।

কলাবন্তর উপরের ঠোঁট মৃদু কাঁপছিল। ঈশ্বর সিং-এর মাথায় দুষ্টুমি মাথা চাড়া চিদয়ে উঠল। জোরসে তার বাহু-যুগল চেপে ধরে বলল,

'মাইরি বলছি, বড্ড ভালো মেয়ে তুমি।'

বাহর যেখানটায় লাল দাগ পড়েছে, সেখানে তাকিয়ে কলাবন্ত বলল, 'তুমি বড় দুষ্টু সিয়াঁ।'

ঈশ্বর সিং ঘন কালো গোঁফের ভিতর লুকিয়ে একটু হাসল।

'তুমিও কম দুষ্টু নও কলা।'

উত্তপ্ত হাঁড়ির মত কলাবন্তর ভেতরটা গরম হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু ঈশ্বর সিং হঠাৎ তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে কি এক চিন্তার পাথারে ডুব দিল যেন।

কলাবন্ত ভরা গলায় ডাকল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ, তুমি কোথায় ?'

একথা শুনতেই ঈশ্বর সিং-এর হাতের তাসগুলো যেন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে গেল। সে চমকে উঠে ইতিউতি করে চারদিকে তাকাল। ঘামে ভিজে তার মাথার চুলগুলো চুপ চুপ হয়েছে। কলাবন্ত তাকে জাগ্রত করার বহু চেষ্টা করল। কিন্তু কোন মতেই কিছু হলো না। শেষে সে রাগে গজর গজর করতে করতে তার কাছ থেকে উঠে তিক্ত স্বরে বলল, 'এতদিন কোন্ হারামজাদীর কাছে ছিলে ? কোন্ হারামজাদী আমার কাছে থেকে তোকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ?'

ঈশ্বর সিং বিস্ফোরণের মত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কলাবন্ত আরো শক্ত হয়ে বসল, 'আমার কথার জবাব দাও। কে সে ? কে ? কে ? কে ?'

ঈশ্বর সিং এসব প্রচণ্ডতা গায়ে না মেখে মরণোন্মুখ মানুষের মত করে বলল, 'কেউ না, কলাবন্ত, কেউ নয়।'

কলাবন্ত কোমরে হাত রেখে চোখ কাঁপিয়ে বলল,

'ঈশ্বর সিয়াঁ, আজ আমি সত্য মিথ্যা জেনে তবে ছাড়ব। গুরুর কসম খেয়ে বল্ কোন হারামজাদী সে ?'

ঈশ্বর সিং কিছু বলতে চাচ্ছিল। কলাবন্ত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কসম খাবার আগে মনে থাকে যেন আমি সর্দার নেহাল সিং-এর মেয়ে-----একতিল মিথ্যা কথা বললে তোকে আস্ত রাখবনা। তোকে কেটে কুচি কুচি করব। বল্, সত্যি করে বল্, কোন হারামজাদীর কাছে ছিলি এদ্দিন ?'

ঈশ্বর সিং অপরাধ স্বীকার করে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। কলাবন্ত পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে কৃপাণটা হাতে তুলে নিল এবং

ঈশ্বর সিং কিছু টের না পেতেই কয়েক কোপ বসিয়ে দিল তার গায়।

ফোয়ারার মত চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তাতেও কলাবন্তর জিদ মিটল না। সে পাগলের মত হয়ে ঈশ্বরের চুল ছিঁড়তে এবং সেই অদৃশ্য নারীসত্তাকে জীবনের সমুদয় জিঘাংসা একত্র করে গালি দিতে লাগল। রক্তাক্ত ঈশ্বর সিং নিরুত্তাপ স্বরে বলল, 'আর কেন কলাবন্ত, আর কেন ?'

অন্তিম আবেগে সিঞ্চিত সে স্বর। শুনে কলাবন্ত একটু পিছু হটে গেল।

ঈশ্বর সিং-এর গলা থেকে চির চির করে রক্ত এসে তার গোঁফকে সিক্ত করছিল। ঈশ্বর সিং অনেকটা কৃতজ্ঞতা এবং অভিযোগের দৃষ্টিতে কলাবন্তর দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'এত জলদি না করলেই কি চলতো না কলা ? যাক, যা করেছ ঠিক করেছ।'

কলাবন্তর মনে জিঘাংসাটা তখনো গুমরে মরছিল। প্রায় চিৎকার করে সে বলল, 'বল্‌না, কে সে মেয়েটি ?'

'সে ? সে রক্ত'। ঈশ্বর সিং-এর ঠোঁট অবধি এসে রক্ত জমেছে। জিহবা দিয়ে সে রক্তের স্বাদ নিয়ে বলল, 'আর আমি-----আমি এই কৃপাণ দিয়েই----ছ'জনাকে শেষ করেছি।'

কলাবন্তর মনে শুধু সে মেয়েটিকে জানার ইচ্ছা মাথা কুটে মরছিল। 'আমি শুধু জানতে চাই সেই হারামজাদীর পরিচয়।'

'গালি দিসনে তাকে কলা। সে মাসুম, নিষ্পাপ।'

'আমি জানতে চাই সে কে ?'

ঈশ্বরের আওয়াজ গর গর করে উঠে, 'বলছি কলা বলছি।' একথা বলেই সে গলায় হাত দিয়ে রক্তাক্ত হাতটা চোখের সামনে এনে একটু মৃদু হেসে বলল,

'মানুষও এক আজব জানোয়ার, পশু।'

কলাবন্ত অধৈর্য হয়ে বলল, 'ওসব রেখে তুমি আসল কথা বল।'

রক্তাক্ত মুখে আরো একটু হেসে নিয়ে সে বলল, 'আসল কথাই বলছি----বলতেই যখন হচ্ছে সবই বলব। কলাবন্ত, প্রিয়তমে আমার, আমি সেকথা তোমাকে কি করে বলব কলা। মানুষও এক আজব জানোয়ার----শহরে দাঙ্গা শুরু হল----সবার মত আমিও

---গয়না পত্র টাকা পয়সা পেলাম----তোমাকে এনে দিলাম---কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে বলিনি।'

ঈশ্বর সিং-এর জখমগুলোতে ব্যথা জমতে লাগল। এবারে সে কাতরাতে লাগল। কলাবন্ত সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে রূঢ় কণ্ঠে বলল,

'সে কথাটা কি ?'

ঈশ্বর সিং ঠোঁটের উপরের রক্তগুলো ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলতে লাগল,

'যে বাড়ীতে আমি----সে বাড়ীতে সাত জন লোক ছিল। আমি ছ'জনকেই শেষ করে ফেললাম। এ কৃপাণটা দিয়েই----আর সেই কৃপাণ দিয়ে আজ তুই আমাকে----থাক সেকথা,----হাঁ, একটা মেয়ে----খুবই সুন্দরী,----আমি তাকে তুলে নিয়ে এলাম।'

কলাবন্ত কাউর চুপচাপ শুনছিল। ঈশ্বর সিং আবারও ফুঁ দিয়ে ঠোঁটের জমা রক্তগুলো সরিয়ে নিল, 'কলাবন্ত, আমি তোকে কেমন করে আমি----আমি ওকে মেরে ফেলতাম।----কিন্তু কিন্তু---- কিন্তু মারতে পারলাম না।'

কলাবন্ত তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে বলল. 'হুঁ'।

'-----আমি তাকে কাঁধে করে চলেছি----পথিমধ্যে----কি যেন বলছিলাম----হাঁ, পথিমধ্যে----একটা গাছের নিচে এসে তাকে----কাঁধ থেকে নামালাম।'

---এতটুকু বলতেই ঈশ্বর সিং-এর গলা শুকিয়ে গেল। কলাবন্ত গলা থেকে থুথু টেনে ঢোক গিলে বলল, 'তারপর ?'

ঈশ্বর সিং অনেক কষ্টে বলল,'কিন্তু---- কিন্তু-----'

কলাবন্ত অধৈর্য হয়ে বলল, 'বলনা, তারপর ?'

ঈশ্বর সিং তার নিমীলিত চোখ অতিকষ্টে একবার খুলে জিঘাংসার আগুনে বিদগ্ধ কলাবন্তর দিকে চেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে থেমে থেমে বলল, 'আসলে মেয়েটি মরে গিয়েছিল----একেবারে মরা লাশ---- একেবারে ঠাণ্ডা গোস্ত------ কলাবন্ত তোমার হাতটা দাও, তোমার হাতটা---।'

কলাবন্ত কাউর ঈশ্বর সিং-এর হাতে হাত রাখল, যে হাত একেবারে ঠাণ্ডা, বরফের চাইতে ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা গোস্ত।

মাসিক অন্তরঙ্গ, চট্টগ্রাম---১৯৬৭ ইং

কুকুর

হাজেরা মসরুর

'নে নে যা---ধ্যাৎ,'

এটা লালু হালওয়াইর বরাবরের অভ্যাস। যখন কুকুর দোকানের দিকে মুখ বাড়ায়, পুরনো বাসি মিষ্টিগুলো কুকুরকে খেতে দেয় আর বলে, 'ধ্যাৎ' যা।'

খেতেও দেয় আবার ধমকীও দেয় এটা লালুর আজব অভ্যেস। রোজ কুকুরের জন্যেই সে তার বাসি মিষ্টিগুলো আলাদা করে রাখে। বাসি মিষ্টিগুলো থালাশুদ্ধ কুকুরের সামনে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু তা না করে সে একটা একটা করে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তামাশা করে। লোকেরা তার এ তামাশা দেখে মুখ চাপা দিয়ে হাসে। লোকেরা হাসে তাতে লালুর কিছু আসে যায় না। তারা বোঝেই বা কি, জানেই বা কি? তারা শুধু লালুর খেলাটাই দেখে। আসলে রাস্তার বেওয়ারিশ কুত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা কি জানে? তা যদি জানত তা' হলে আর হাসত না। না খেতে পেয়ে কুকুরগুলোর হাড় বেরিয়ে গেছে। একটা তাড়া দিলে কেঁই কেঁই করে লেজ গুটিয়ে দৌড় মারে। ক্ষুধার জ্বালায় এখানে ওখানে ঢুঁ মারে। কুকুরের এ দুর্দশা এবং হতশ্রীর মাঝে একটু অমঙ্গলের আশংকা করে লালু। সে অমঙ্গলের কথা একমাত্র লালু ছাড়া আর কে বুঝতে পারে? তাই সে কুকুর দেখলে আগে খেতে দেয় এবং তারপর ধ্যাৎ ধ্যাৎ বলে। খুলেই সবটা বলা যাক।

শহরের সবচে' আজব জায়গায় লালুর মিষ্টির দোকানটা। দোতালা বাজারটির আসল দোকানগুলো লালুর মাথার উপর দোতালায়। লালুর দোকান নিচু তলায়। তার আশপাশে আরো দোকান রয়েছে। রাতের বেলা এ বাজার জমে ভাল। দিনের ভাগে সে দোকান খোলেই

না একরকম। কিন্তু যখনি বেলা পড়ে আসে আর দোতালার শো কেসে নানা সাজের মেয়েদের আবির্ভাব হয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই ভুঁড়িওয়ালা লালু হালওয়াই চটপটে হয়ে উঠে। থরে থরে মিষ্টির থালা সাজাতে থাকে। রূপালী কাগজে ঢাকা রং বেরং-এর মিষ্টি—দেখে লোকদের জিহ্বায় পানি এসে যায়। কিন্তু দেখতে যেমন, মুখে দিলে তেমন লাগে না। দোকানের সামনে একটা পুরনো তক্তায় লেখা রয়েছে 'খাঁটি ঘির তৈরি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন। এটা যখন লেখা হয়েছিল তখন হয়ত মিষ্টান্ন খাঁটি ঘিতেই তৈরি হত।

বিজলী বাতির আলোকে যখন বাজারটা ঝকমক করতে থাকে, লালুর দোকানেও ঠাঁট বেড়ে যায় তখন। দলে দলে লোক এসে জমা হয় লালুর দোকানের সামনে। প্রায় লোকই দোকানের তক্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোতালার দিকে তাকায়। দোতালার দোকানগুলো খুব উঁচু মনে হয় তাদের কাছে। তারা সেখানে উঠতে পারবে বলে ভরসা পায় না। তবু নিচের লোকেরা বরাবর উপরের দিকে তাকায়। নিচের লোক হয়ে উপরটা যে দেখে নিতে পারে এটাই তাদের পক্ষে বেশী। লালু এ ধরনের লোক-দেরকে দুচোখে দেখতে পারে না। পকেটে পয়সা নেই, অথচ দোতালায় তাকানোর নেশা। তবে এরাও লালুর খদ্দের। তাদের এক দু' আনার কেনাকাটা থেকে দেরীতে হলেও লালুর ট্যাঁকটা ভারী হয়ে আসে। কম হোক বেশী হোক পয়সা দিয়ে জিনিস কিনে। কিন্তু হতভাগা হাড়জিরজিরে কুকুরগুলোকে দেখলে লালুর গায়ে জ্বালা ধরে যায়। তার বাসি মিষ্টি খাবার জন্যেই যেন এদের জন্ম হয়েছে। রোজ রোজ বাসি মিষ্টিইবা আর কটা দেওয়া যায়। লোকসান দেওয়ার চেয়ে মিশাল দিয়ে বিক্রি করলে চালানটা বেঁচে যায়। রোজ মিষ্টির লোভে দোকানের সামনে এসে জিব বের করে লালা ঝরাতে থাকে। বিনে পয়সায় এত মিষ্টি হয় না। মিষ্টি দোব না কচু—যত সব অনাচারের দল। এই অপদার্থগুলো কোন কাজেও আসে না। চোর বদমাশ তাড়ানোর কাজে লাগতে পারে। কিন্তু এ বাজারে চোর আসবে কোন দিক দিয়ে। এখানে দিনরাত সমান। দিনের চেয়ে রাতেই বরং এখানে বেশী আলো। না কোন পাহারাদারের দর-কার, না কোন কুকুরের দরকার। অথচ লোকেরা বেদরকারী এ

কুকুরগুলোকে কেন যে এ বাজারে আমদানী করেছিল বুঝি না। এ হতভাগা কুকুরগুলো মিষ্টির লোভে পড়ে এ বাজারেই জীবনটা অতিবাহিত করছে। ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে ওদের কিছু আছে কি? ভাবতে ভাবতে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল লালু। 'পাজি কুত্তাগুলো---

কিন্তু কুকুরতো কুকুর। কুকুর রাগের কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হতেই বাজারের জৌলুষ চতুর্গুণ বেড়ে যায়। রূপালী কাগজে ঢাকা তার মিষ্টিগুলো কত সুন্দর দেখায় তখন। মৌমাছির ঝাঁকের মত যত লোক আসে, লালুর দোকানের সামনেই তাদের ভিড় বেশী। নানাধরনের লোক। গাড়ীতে করে আসে একদল। পায়ে হেঁটে আসে একদল। তাদের পকেটে গাদা গাদা নোট থাকে। এদের মধ্যে যারা উপরে যাবার তারা দেরী না করে তরতর করে উঠে যায়। আর বাদবাকীরা এক খিলি পান আর এক সলা সিগারেট নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে আর উপরের দিকে তাকিয়ে হাপিত্যেশ করতে থাকে।

এছাড়া যাদের সাথে কোন রকম ব্যবসারই আশা করা যায় না, তাদের সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয় এখানে। এ হাড়ক্লিষ্ট লোকগুলো দোকানের চারদিকে চক্কর কেটে এমন একটা ভাব দেখায় যে, তাদেরও অনেক কাজ আছে এ বাজারে। সবার অলক্ষ্যে লালুর মিষ্টির দিকে তাকিয়ে তারা যে মাঝে মাঝে ঢোক গিলে এটাও লালুর দৃষ্টি এড়ায় না। এসব লোকদেরকেও কুকুরের মত মনে করে লালু।

এদের পকেটও নেই, পকেটে পয়সাও নেই। অথচ এরাও উপরের দিকে তাকায়। যতসব নির্লজ্জগুলো। যেসব মেয়েরা দেহের দোকান সাজিয়ে বসেছে তাদের আর খাওয়া পরা নেই।

ভাবতে ভাবতে দোতলাওয়ালাদের প্রতি মায়া হয় লালুর।

লালু জানে এ লোকগুলো কোনদিনই দোতলায় যেতে পারবে না। অথচ দোতলার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে একে অপরকে খোঁচা দিয়ে নানা অশ্লীল আলাপ করছে। তাদের অশ্লীল কথাবার্তা জঘন্য গুলির মত এসে লালুর কলজেতে বিঁধে। লালু তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা তার নিজের দোকানের দিকে ফিরিয়ে এনে কানটা সেদিকে ফেলে রাখে।

'বড় খাসা মালরে ভাই---যেমন শরীর তেমন রূপের বাহার ---।'

লালু মনে মনে বলে,

আঙ্গুর ফল টক। কুকুরদের ঘেউ ঘেউ কেঁই কেঁইর চেয়েও নিরর্থক এদের এ হাপিত্যেশ। কুকুর প্রতীক্ষা করে তবু কিছু পায়। কিন্তু এরা ?

রোজকার মতই বিকিকিনি চলছিল এ আজব বাজারে। সেদিন লালু কুকুরদেরকে মিষ্টির লোভ দেখিয়ে একটা ছড়ি দোলাচ্ছিল আর ধ্যাৎ ধ্যাৎ করছিল। এমন সময় তার মাথার উপর দোতালায় একটা ভয়ার্ত চিৎকার শুনা গেল। চিৎকার শুনে লালু ভড়কে গেল। 'কি হল কি হল' বলে সবাই সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরের দিকে উঠছিল। কে একজন বুকে হাত মেরে মাতম করতে করতে বলল, 'হায়, মেরে ফেলেছেরে। জোহরাকে ছোরা মেরেছেরে। হায়, হায়- - - -।'

ক'জন জোহরার বোনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ধরে এনে একটা চেয়ারে বসাল। মাথা কুটতে কুটতে প্রাণটা যেন তার বেরিয়ে যাচ্ছিল। লালু একবার উপরে যেতে চাইল। আর না হোক জোহরার বোন সুলতানাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। কিন্তু দোকানে কাকে রেখে যাবে ? বাধ্য হয়ে সে দোকানেই বসে থাকল।

রক্তাক্ত জোহরাকে নিচে নামানো হল। খুনী লোকটাকে চার-পাঁচজন শক্তসামর্থ্য লোক ঝাপটে ধরে রেখেছে। জংলী জানোয়ারের মত কর্কশ চেহারা তার। বিজলী বাতির আলোকে জোহরার তাজা রক্ত আর খুনীর চকচকে চোখ দেখে সহসা লালু ভড়কে গেল। এ লোকটাকে সে অসংখ্যবার তার দোকানের সামনে দেখেছে। তার পকেটে কোন পয়সা কড়ি থাকত না। বুভুক্ষু কুকুরের মতই তার চোখ দিয়ে লোভের লালা ঝরত।

সুলতানা মাথায় হাত মেরে বলতে লাগল, 'জোহরা আপার সাথে বিনে পয়সায় দরদাম করছিল, আপা রাগ করে হারামজাদাকে বের করে দিচ্ছিল, এমন সময় সে ছোরা বের করে... ...হায়রে আমার জোহরা বুবু... ... ...হায়রে।'

জোহরা আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছিল। খুনী লোকটি নির্ভীক শ্বাপদের মত ক্রুদ্ধ জনতার দিকে ততোধিক ক্রুদ্ধ চোখে তাকাচ্ছিল। লোকরা অতঃপর জোহরাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে লোকটিকে পুলিশে দিয়ে দিল।

যখন ভিড় ভেঙ্গে গেল, সবাই সবার কাজে আত্মনিয়োগ করল। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ আগে এখানে যেন কিছুই হয়নি।

লালু যেমন বসেছিল তেমনি ঠায় বসে র'ল। সে কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না, কোনরূপ মন্তব্যও করল না।

পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই-- এসব লোকের এত সাহস ? অথচ এ লোক এক সময় তারই দোকানের সামনে ঘুরাফিরা করত। ভাবতে গিয়ে লালুর গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে একদল ভুখা কুকুর এসে জমা হয়েছে সেখানে। কুকুর-গুলো দেখে লালু শিউরে উঠল। ক্ষুধা, ক্লান্তি এবং চরম বিদ্বেষের চোখে যেন কুকুরগুলো লালুর দিকে তাকাচ্ছে। লালুর মিষ্টির সম্ভারের দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ লালুর মনে হল কুকুরগুলো পায় পায় তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং সে কোনরূপ আত্মরক্ষা করার আগেই কুকুরগুলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় মটকে দিল এবং পরমানন্দে তার তাজা রক্তগুলো চেটে খেতে লাগল।

সেই থেকে রোজ কুকুরদের সাথে এই ব্যবহার তার। কুকুর এসে দোকানের দিকে মুখ বাড়াতেই বাসি মিষ্টিগুলো দিয়ে দেয় কুকুরকে। তারপর একটু ভয় ভয় স্বরে বলে "নে নে যা--ধ্যাৎ।"

---

২৪ শে ভাদ্র, ১৩৭৪ বাং সংখ্যা দৈনিক পাকিস্তান।

কুদরতুল্লা শাহাব

—'কদ্দিনের ছুটিতে এসেছ?'

নিসার কোন অভিবাদন প্রত্যাভিবাদন ছাড়াই জিজ্ঞেস করল।

—'পনের দিনের।' আমি জবাব দিলাম।

—'চমৎকার! চল এবার তোমাকে লাহোরের নিম্নগামী মাল-গাড়ী দেখাব। আমি ভ্রমণ করব।' তারপর একটু ভেবে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আর তুমি গল্প লিখবে।'

এই প্রসঙ্গটার প্রতি দুজনেরই টান ছিল। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে নিসার আমাকে মল রোডের এক হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলের লনে গিয়ে আমরা দুই মহারথী এমন এক টেবিলে নিঃসঙ্কোচে জেঁকে বসলাম যেখানে আগে থেকেই দু'একজন সম্পাদক, কিছু রেডিও আর্টিস্ট, কিছু সাহিত্যিক আর কিছুসংখ্যক অগাধ প্রজ্ঞা-পুষ্ট রাজ-নীতিক বিরাজমান। চা-চক্র চলছে। এক সাহেব 'কোল্ড টি'তে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছেন। গরম চা গরমে প্রশান্তি এনে দেয়। আর তা সাধারণ মানসের লোকরা পান করে থাকে। কিন্তু এ পানীয় খাস লাহোরের সৃষ্টি। আর নিয়ম-মাফিক এ সৃষ্টিরও উৎস প্রয়োজন। সে প্রয়ো-জন 'প্রহিবিশনের' কারণে অনেক হজরতকে গোপন রোগের মত সংক্রমিত করেছে।

জ্ঞানী-গুণীদের এই মজলিসে পোস্ট মর্টেমের পরিবেশ বড় জম-কালো ভাবে ছেয়ে গেছে। জাতির 'শব' সামনের টেবিলে রাখা হয়েছে আর প্রত্যেকেই তার কোন না কোন অঙ্গ হাতে নিয়ে বড় অনুসন্ধিৎ-সার সাথে পোস্ট মর্টেমের কাজে ব্যাপৃত। আধ্যাত্মিক, দৈহিক, আর রাজনৈতিক রোগ থেকে শুরু করে আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক কারণ

অবধি খুব মনোযোগের সাথে পরখ করা হচ্ছে। এসব বিষয়ের উপর গরম বিতর্ক চলছে। টেবিলে থাপ্‌পড় পড়ে। চেয়ার পড়ি পড়ি করে বেঁচে যায়। কিন্তু এ সময় জাতির সমুদয় রোগের একমাত্র অমোঘ ঔষধ সেই চায়ের পাত্রে। যেটাতে 'কোল্ড টি' বড় সযত্নে রাখা। কোল্‌ড টিওয়ালা সাহেব কাপ মুখে লাগিয়ে মজা করে চুমুক দিচ্ছেন। আর নিজের আশপাশের সকল বালাইর ত্রাতা যীশুদের প্রলয়-কল্লোল সত্ত্বেও বড় নির্বিকারচিত্তে কবি দাগের এককলি প্রেম-কাব্য ভাঁজছেন।

—'আজ সিনেমার প্রোগ্রাম আছে।'

কোল্ড টি সাহেব নিসারকে জিজ্ঞেস করেন।

—'জী না। আজ অন্য প্রোগ্রাম আছে।'

নিসার আমার দিকে ইঙ্গিত করে 'অন্য' কথাটির উপর খুব জোর দিল।

—'হু, কোল্ড টি' সাহেব চোখ তুলে আমার আপাদমস্তক গাঢ় করে দেখলেন। 'নিসার, একটু আগে এর কথাই কি তুমি বলছিলে? কোথাকার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার?'

নিসার উচ্চহাস্যে সংশোধন করল,

—'মিউনিসিপ্যাল কমিশনার না ভাই, ভাগ্যবান ডেপুটি কমিশনার।'

কোল্‌ড টি বিশেষ উৎকন্ঠিত হন না।

—'ঠিক আছে' বড় মুরুব্বিয়ানা করে বলেন, 'এই দুর্দিনে এক আধজন ডেপুটি কমিশনার হাতে রাখা তেমন দোষের কিছু না।'

তারপর বড় ঘনিষ্ঠ স্বরে তিনি আমাকে নানা বলভরসা দিতে থাকলেন, 'ভাগ্যবান, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি লাহোরে তোমাকে দিয়ে খুব উপকৃত হবার চেষ্টা করব। ইনশাল্লা।'

—'এই বেচারা লাহোরের নিম্নগামী মালগাড়ী দেখতে চায়।' নিসার সসম্ভ্রমে বলে, 'ও এর উপর গল্প লিখবে।'

—'তুমি গল্প লিখ?'

কোল্‌ড টি সাহেব এমন করে জিজ্ঞেস করলেন যেন গল্প লেখাটা খুব বড় একটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স। 'কোথায় লেখ?'

আমি লজ্জায় নিচুস্বরে 'নকুশ', 'ছাতেরা', 'সাকী', 'হুমায়ুন', 'আদবী দুনিয়া' ইত্যাদি পত্রিকার নাম করলাম।

—'এগুলো ছাপে কোথায়? আমি তো দেখিনি।'

কোল্‌ড টি সাহেবের চোখে আমার সাহিত্যিক পজিশন কমে যেতে লাগল। তিনি চোখের তারা আবার স্থির করে নেন। তারপর বড় বন্ধুসুলভ স্বরে আমাকে পরামর্শ দেন যে, যদি আমার গল্প লেখার এতই শখ চেপে থাকে তো 'শামা', 'ডাইরেক্‌টর' এবং 'চিংগারি'তে যেন লিখি।

এই সংক্ষিপ্ত শিক্ষা ও সাহিত্য-বিতর্কের পর যখন আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এক টাংগায় সওয়ার হলাম, টাংগাওয়ালার সাথে নিসার ও কোল্‌ড টি সাহেবের ভাব বিনিময় শুরু হলো। টাংগা-ওয়ালা বড় পাকামি করে তার রসবুৎপত্তির প্রচার শুরু করেছে। পত্রিকা অফিসে থাকে যে মেয়েটি ইংরেজী বলে, জমিদার..., চুবর জি ওয়ালী যার গায়ের রং গোরা আর সোনালী চুল—, মেয়ো গার্ডেনওয়ালী যে এ বছর ম্যাট্রিক ফেল করেছে—, ঘোড়া হসপিটা-লের কাছে যে লতা মুঙ্গেশকরের মত গায়—মডেল টাউনওয়ালী যে হসপিটালের নার্স—।

কিন্তু নিসার এবং কোল্‌ড টি সাহেব টাংগাওয়ালার এই প্রপা-গাণ্ডায় প্রভাবিত হন না।

—'তুমি শালা বড় পুরান চাটুকার।' কোল্‌ড টি সাহেব রেগে উঠেন, 'তোমার চেয়ে তো মজংএর টাংগাওয়ালা হাজার গুণে ভাল।'

টাংগাওয়ালা মজং ঘাঁটিওয়ালাদের খুব ঝেড়ে একচোট গালি দিয়ে নাটকীয় কায়দায় নিজের সদ্যকৃত মহাকর্মের বর্ণনা দিয়ে চলল।

—'আরে সাব মেয়ে না যেন আলু বোখারা। এই তো কলেজে পড়তো। সবেমাত্র এ লাইনে এসেছে। এ যাবত মাত্র চার বার বাইরে গেছে। কালে খান পাঠান পুরা সাত শ' টাকা দিয়েছিল। তোমার বেলাতে না হয় দু'শতেই মানিয়ে নোব। যাবে?

আলু বোখারার নামে নিসার এবং কোল্‌ড টি সাহেবের লালা ঝরতে লাগলো। কিন্তু দু'শো টাকার কথা শুনে মুখব্যাদান প্রশস্ত। দু'জনেই আশান্বিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে কোল্‌ড টি সাহেবের খুবই হাপিত্যেশ অবস্থা।

—'দেখ ভাগ্যবান, আমি তোমাকে উপকার করার সুবর্ণ সুযোগ

দিচ্ছি। যদি তুমি এ সময় কাজে না আস তো ডেপুটি কমিনার নও। অকেজো, অথর্ব।'

কিন্তু আমি চেয়েছিলাম মুখের উপর একটা কড়া জবাব শুনিয়ে দিই। আর শুনে হাঁ করে বসে থাকুক।

আমার নীরবতায় কোল্ড টি সাহেবের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় বদলে গেল। টাংগাওয়ালা ঘোড়াকে সম্বোধন করে বড় তিক্ত এবং পেঁচালো গালি বকতে থাকে। নিসার তার বিশেষ বন্ধুদের প্রশংসা পাড়ে, যারা প্রয়োজনকালে তার পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেও পেছ পা নয়। আর কোল্ড টি সাহেব নির্বিশেষে পাকিস্তানের সব অফিসারদের দুর্নীতিপরায়ণতা, অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে প্রাণ খুলে আলোচনা করেন। এভাবে যখন আস্তে আস্তে কোল্ড টি সাহেব বেশ রং চড়িয়েছেন, টাংগাওয়ালা ঘোড়াকে উপলক্ষ্য করে কিছু বিদায়-গালি শুনিয়ে হিরামণ্ডির ন'গজি কবরের পাশে নামিয়ে দিল সবাইকে। তখন কোল্ড টি সাহেবের পা নড়বড়ে অবস্থা। আর 'ছ' উচ্চারণকে 'স'-এ বদল করে বড় সম্ভ্রম নত হয়ে পুলিশ কনস্টেবলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

—'সিপাইজি, সালাম, বেঁচে থাক।'

সিপাইজি নাক আগায়ে এনে কোল্ড টির মুখের গন্ধ নিল।

—'আচ্ছা, আজ তো বেশ সালাম দিয়েছ। পারমিট কোথায় ?'

কোল্ড টি সাহেব বিজয়ী মুর্গির মতো বুক ফুলিয়ে আমার গলার দিকে হাত বাড়াতে থাকেন। সম্ভবত পারমিটের বদলে তিনি আমাকে সিপাইর খেদমতে পেশ করতে চান। কিন্তু আমি চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলাম আর ন'গজি কবরের কাছে গিয়ে লুকালাম।

আমাকে উপস্থিত না পেয়ে কোল্ড টি সাহেবের স্ফীত বক্ষ অবনমিত হয়ে গেল। তিনি বুশ শার্টের পকেট তদন্ত করে পাঁচ টাকার নোট কনস্টেবলের হাতে দিলেন। কনস্টেবল তাতে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। এরপর—অনেকক্ষণ ধরে আমার অপেক্ষা করে এক সময় কেটে পড়েন।

ন'গজি কবরের পাশে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ, সেই পারমিটওয়ালা সিপাইর তীক্ষ্ণ চোখ আমার দিকে ঘুর ঘুর করছে। আমি বেরিয়ে পড়বার জন্য এমন এক রাস্তা তালাশ কর-

ছিলাম যেখানে নিসার, কোল্ড টি এবং পারমিট-সিপাইর দর্শন না মেলে। সে সন্ধানে গিয়ে হিরামণ্ডির ঘিঞ্জি গলিতে ফেঁসে গেলাম। এক হামামে সব নাঙ্গা। গলি আর সড়কে সন্ধানী চোখওয়ালাদের গাড়ীর আনাগোনা, পায় পায় চিলের মতো ছোঁ পাতা দালাল, দরজা বারান্দায় পুতুলের মতো সাজগোজ করা মেয়েরা---চটকদার পরিচ্ছদ ছাড়া এ সমুদয় দৃশ্য বিলকুল নগ্ন। তাদের দেহ এবং অভিব্যক্তিতে এক শব্দহীন সুর আকুল আহ্বান নিয়ে নৃত্য করছে। বাতাসের শূন্যতায় কাঁচা মাংসের উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর বেশী শক্তির ঝকমকে সম্মিলিত আলো গলি-সড়কে শ্বেত আঁখর মেলে ধরেছে। আমার বার বারই মনে হয় এই দরজা জানালার ঘাড় লটকে যে মেয়েরা বসে আছে, ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে আর আবাবিলের মতো চঞ্চুতে পাথর কুড়িয়ে এনে সারা জগৎকে অবরোধ করে নেবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পাথরের পরিবর্তে আমার ঘাড়ে একটুখানি থুথু এসে পড়ল। কয়েকটা দুর্মুখ মেয়ে বারান্দায় বসে থক্ থক্ করে থুক ফেলছিল। আমি এই থুক বর্ষণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার ফিকির করছিলাম, এমন সময় আল্লার বিশেষ দয়া-দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। নিকটের গলিতেই একটা মসজিদ পেয়ে গেলাম। মসজিদের দ্বারে কালো কালিতে 'ইয়া আল্লাহ' এবং অন্য দ্বারে 'ইয়া মোহাম্মদ' লেখা। এই ছোট মতো মসজিদ সুউচ্চ বিরাট দুটো প্রাসাদের মাঝখানে ভিখিরীর মতো পড়ে আছে। ভেতরে পেশাবখানার বন্দোবস্ত রয়েছে। একদিকে ড্রেনে বিয়ারের কয়েকটা খালি এবং ভাঙ্গা বোতল। অজুর জন্য এক পুরনো হামাম। সেটার পানি বাসি লালার মতো দুর্গন্ধ-যুক্ত। থেকে থেকে জোরসে দমক মারে। এ মসজিদকে দেখে কেনই জানি আমার রেল-ইঞ্জিনের কথা মনে পড়ে যায়। যে ইঞ্জিন দ্রুতগতিতে চলতে চলতে হঠাৎ টিলা অতিক্রম করে নীচে নেমে যায়।

হিরামণ্ডি থেকে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে অবশেষে আমি শাহী মসজিদে এসে পৌঁছলাম। আর খোদার শূন্য দিগন্তে শ্বাস টেনে স্বস্তি অনুভব করলাম। রাত বারটায়ও মসজিদের আশপাশে কয়েকটা দামী গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের ড্রাইভারগুলো এদিকে সেদিকে বড় আনমনা হয়ে ইতিউতি করছে। এসব গাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকরা বেগমদের অনুমতি নিয়ে শাহী মসজিদে একটু স্বস্তি-তন্দ্রা অথবা

ইকবালের মাজারে ভক্তি-অর্ঘ্য দিতে আসেন। আর এ কথাও আছে যে, মসজিদের মসৃণ সিঁড়িতে অধিকন্তু তাদের পা পিছলে যায় এবং হোঁচট খেতে খেতে অজ্ঞাতসারে হিরামণ্ডির গোপন কক্ষে মেয়ে পৌঁছন। যদি ইকবাল বেঁচে থাকতেন তো এই অদৃষ্ট এবং বাধ্যগত ব্যাপারের নতুন বিকৃতিটা বুঝতে পারতেন।

শাহী মসজিদের সোজা বিপরীতে পুরনো কেল্লার বিপর্যস্ত ইমারত। শীর্ষে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা মৃদু দুলছে। ইকবালের মাজারে একটা ছোট বাল্বের আলো। বড় বাল্ববটি কিছুদিন হল চুরি গেছে। লাহোরে বিজলীর বাল্ব মেলা বড় কষ্টসাধ্য। কারণ, তার চাহিদা হিরামণ্ডিতে খুব বেশী। সেহেতু ইকবালের মাজারে একটা ছোট বাল্বেই যথেষ্ট মিতব্যয়িতা। মাজারের দরজায় মরচে পড়া একটা তালা। যাতে করে ভক্তরা ভেতরে গিয়ে সুইচবোর্ড না চুরি করতে পারে। বাইরের লনে হিরামণ্ডির দু' এক দালাল পথভ্রষ্ট পথিকদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এক টাংগাওয়ালা দু' দু' আনায় দাতাগঞ্জের দরবারে পৌঁছাবার কথা ঘোষণা করছে। আমি ত্বরিৎ সেটায় চড়ে বসলাম। টাংগায় ঝিলম জেলার দুই মামলাবাজ বসে আছে। দিনভর মকদ্দমা এবং কাচারীর গ্লানি মিটাবার মানসে দু ঘড়ির জন্যে হিরামণ্ডিতে এসেছিলেন। তারপর এখন হজরত দাতা-গঞ্জ বক্স রহমুল্লার দরবারে সালাম করতে চলেছে।

---'করে তো সবি আল্লায়।' এক মামলাবাজ সাথীকে বলছে, 'তবু বুজুর্গদের দোয়াটাও তো বড় জিনিস।'

দ্বিতীয়জনও এই কথা সমর্থন করে। তারপর এই আধ্যাত্মিক আলোচনান্তে তারা দু'জনে একটু কানাকানি করে হিরামণ্ডির স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে যায়।

জুমারাত (বৃহস্পতি) বলে দাতার দরবারে মেয়ে-পুরুষ এবং ছেলে-বুড়োর অঢেল ভিড়। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি। সেখানে ফটকে নিসার এবং কোল্ড টি সাহেব হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের প্রবাহে তৃণের মতো ভেতরে চলে যায় আবার ফিরে এসে সেই মাঝ ফটকে স্থান করে নেয়। আমার একান্ত চেষ্টা, ওদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে একদিকে কেটে পড়ব। কিন্তু নিসার আমাকে দেখে ফেলে এবং জবরদস্তি কাছে টেনে নেয়। কোল্ড টি সাহেব পেছনের

নোংরামিটাকে ভুলিয়ে দিয়ে বড় ভালমানুষ সেজে ঘনিয়ে আসে। এবং দাতার দরবারে মুসলমান মেয়েদের ভক্তি অর্ঘ্যের সমুদয় উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা জুড়ে দেন।

নিজেদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী এই লোকরা এখন এখান থেকে মুজংএর ঘাঁটিতে যাবে। সেখান থেকেই নিম্নগামী মালগাড়ীর দোসরা ঘাঁটির আরম্ভ। লাহোর ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে জংশন। এখানকার নিম্নগামী মালগাড়ী অলিগলি, সড়কে, আনাচে কানাচে চলে। এখানে ওখানে লাল বাতির টিমটিমে আলো। এ বাতি থাকা সত্ত্বেও কত গাড়ী কাঁটা বদলাতে বদলাতে পদস্খলিত হয়। প্রায়ই ধ্বংস-সংঘর্ষ ঘটে। যদি কোন দ্রুতগামী ইঞ্জিন চলতে চলতে টিলা থেকে পড়ে যায় তো তাকে বাতিল করে ফিকে ফেলা হয় না। বরং তার কপালে কাল কালিতে আল্লা রছুলের নাম লিখে মসজিদের কাজে লাগান হয়।

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

সা'দত হাসান মাণ্টো

সংসারে সবাই জয়ী হতে চায়। জয়ী হতে পেরে আনন্দ পায়। কিন্তু সে লোকটি পরাজয়ের মধ্যেই আনন্দ পেত।

জয়ী হতে তার বেশী দিন লাগেনি। কিন্তু পরাজিত হতে তার বেশ সময় লেগেছিল। প্রথম দিকে ব্যাংকে চাকরি করার সময় যখন হঠাৎ তার খেয়াল হল বিস্তর টাকা-পয়সা হওয়া দরকার, বন্ধুরা তাকে নিয়ে খুব হাসল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা বোম্বেতে চলে এল এবং অভাবগ্রস্ত বন্ধুদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল।

বোম্বেতে পয়সা উপার্জনের বহুতর পন্থা ছিল। কিন্তু সে অন্য কোন দিকে না গিয়ে সিনেমা লাইনে যোগ দিল। কারণ, সিনেমা লাইনে যেমন পয়সা আছে, খ্যাতিও আছে। এ লাইনে সে দু'হাতে কামাইও যেমন করতে পারত, উড়িয়েও দিতে পারত।

এ লাইনে এসে সে কোটি টাকা কামাই করেছে আবার উড়িয়েও দিয়েছে সে টাকা। এ টাকা উপার্জন করতে যে তার সময় লেগেছে, তা খরচ করে ফেলতে তার অনেক বেশী সময় লেগেছে। একটা ছবির জন্যে গান লিখে লাখো টাকা কুড়িয়ে নিল এক দণ্ডে। কিন্তু তা গণিকালয়ে, বন্ধুদের আড্ডায়, ঘোড় দৌড়ের মাঠে এবং জুয়ার আড্ডায় নিঃশেষ করতে তার বেশ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

একটা ছবি তৈরি করে দশ লাখ টাকা পেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ টাকা নিঃশেষ করতে হবে। সুতরাং তার খরচের ফর্দ মোটা হয়ে চলল। তিনটা গাড়ী কিনে নিল, একটা নতুন আর দুটো পুরনো। পুরনো দু'টা দিয়েই এখানে ওখানে যাওয়া আসা করত। নতুনটা গ্যারেজে বন্ধ করে রাখত। বলত, পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে না।

সকালে উঠে দরজায় দাঁড়ানো টেক্সিতে বসতো, এবং মাইল খানেক গিয়ে একটা জুয়ার আড্ডায় ঢুকে পড়ত। পরদিন আড়াই হাজার টাকা হেরে বেরিয়ে পড়ত ট্যাক্সি ডেকে। বাড়ী এসে জেনে শুনে ট্যাক্সির ভাড়া দিতে ভুলে যেত। সন্ধ্যায় বেরিয়ে দেখত ট্যাক্সি তখনও দাঁড়িয়ে।

'আরে হতভাগা, তুই এখনো এখানে? চল্, অফিসে নিয়ে চল। অফিসে থেকে নিয়ে নিস্।'

কিন্তু অফিসে এসে আবারও পয়সা দিতে ভুলে যেত।

একবার সে উন্নত মানের দু'তিনটা ছবি করল। পুরনো সব রেকর্ড ভঙ্গ করে দিল। দু'হাতে ভুরি ভুরি টাকা কুড়িয়ে নিল। আকাশ অবধি গিয়ে তার খ্যাতি স্পর্শ করল। এরপর সে কি মনে করে উন্নতমানের এখন ক'টা ছবি তৈরি করল যার কারণে তার খ্যাতি একেবারে মাটিতে মিশে গেল। এরপর সে আবার আস্তিন গুটিয়ে বুঝে শুনে আবার এমন এক ছবি তৈরি করল যা একেবারে সোনার খনি হিসেবে প্রতিপন্ন হল।

মেয়েদের ব্যাপারেও তার অনুরূপ জয় পরাজয়ের খেলা ছিল। কোন গেঁয়ো বা পুরনারীকে তুলে এনে মেজে ঘষে খ্যাতির চূড়ান্ত আসনে বসিয়ে দিত এবং তার নারীসত্ত্বাকে হাস্যাস্পদ করে এমন পর্যায়ে ঠেলে দিত, বাধ্য হয়ে তখন তাকে যেন-তেন লোকের দ্বারস্থ হতে হতো।

বড় বড় শিল্পপতি এবং কার্তিক চেহারার যুবকদের সাথে তাকে অনেক সময় যুঝতে হতো। অনেক কাটার সাথে যুদ্ধ করে ঝোপের মাঝে লুকানো রঙ্গিন ফুলটি সে তুলে নিয়ে আসত এবং পরদিন তা কোটের কলারে লাগিয়ে নিত। কিন্তু কি মনে করে সে কোন ভিলেনকে সুযোগ দিয়ে দিত। ভিলেন তা এক সুযোগে নিয়ে ভাগতো।

একবার সে ফারেস রোডের একটা জুয়ার আড্ডায় একাধারে দশ দিন যাওয়া-আসা করছিল। পরাজয়ের ভূত তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, সে কোন ক্রমেই নিরস্ত হলো না। হালেই কম-বয়সী এক অপরূপ সুন্দরী অভিনেত্রীকে হারিয়েছে এবং একটা ছবির কারণে দশ লাখ টাকা গচ্চা দিয়েছে। এ দুটো দুর্ঘটনা অপ্রত্যাশিত-ভাবে হয়েছে। এক সাথে এত বড় ক্ষতিকে সামলে নেবার জন্যে সহসা আর বড় কোন ঝুঁকি কাঁধে নিতে চাইল না সে। শুধু ফারেস

রোডের জুয়ার আড্ডাতে প্রতিদিন একটা পরিমিত অংক হারাবার জন্যে আসা-যাওয়া করত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ' দুয়েক টাকা পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ত। ট্যাক্সি চলতে চলতে দু'পাশের দোকানের সারি পেছনে রেখে একটা বিজলী বাতির খামের কাছে এসে থেমে যেত। পুরো লেন্সের চশমা জোড়া সাফ করে বড় আয়েশী ভঙ্গিতে নাকের উপর লাগিয়ে নিয়ে ধুতির কুচি ঠিক করতে করতে নেমে পড়ত সে। তারপর এক পলকের জন্যে ডান দিকে একবার দেখে (যেখানে নেহাতই কুশ্রী একটি মেয়ে রোজ ভাঙ্গা আয়নার সামনে বসে প্রসাধন করত) তাড়াতাড়ি দোতালায় উঠে যেত।

দশদিন থেকেই সে এক জুয়ার আড্ডায় দু'শ টাকা হারবার জন্যে আসছিল। কখনো দু'তিন দানেই সব টাকা হেরে যেতো। আবার কোন কোন দিন সব টাকা হারতে সকাল হয়ে যেত।

একাদশ দিনে যখন ট্যাক্সি এসে বিজলী বাতির খামের কাছে থামল, চশমা সাফ করে ধুতির কুচি ঠিক করে সে দোতালায় উঠতে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে গেল। তারপর লোহার জাংলার কাছে যেয়ে ভাঙ্গা আয়নার সামনে প্রসাধনরতা মেয়েটিকে দেখতে লাগল। রং একেবারে কালো, ত্বক মসৃণ, গালে বৃত্তাকার উল্কি আঁকা, বিশ্রী দাঁত, পান আর তামাক খেয়ে দাঁতগুলোকে আরো বিশ্রী করে রেখেছে---সে ভাবল, এ মেয়ের কাছে কে আসে? তাকে দেখেই মেয়েটি ভাঙ্গা আয়না সরিয়ে ওঠে এসে একটু হাসল এবং বলল, 'বসবে নাকি শেঠ?'

সে মেয়েটিকে আরো খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগল। অর্ধবয়েসী মেয়েটি হয়ত ভাবে, এখনো তার অনেক গ্রাহক আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'বাঈ' তোমার বয়েসটা কত এখন?'

শুনেই মেয়েটি যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর মারাঠি ভাষায় কি সব গালিগালাজ করল। নিজের ভুলটা শুধরে নিয়ে সে বলল, 'মনে কিছু নিয়োনা, বাঈ, আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, রোজ তুমি সেজেগুঁজে থাক, তোমার এখানে লোকজন তো দেখি না। তোমার কাছে কোন লোক আসে কি?' মেয়েটি কোন জবাব দিল না। এবারও তার মনে হল সে ভুল করেছে। ভাবে সেটা কোন রকম প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করল,

'তোমার নাম কি বাঈ ?'

মেয়েটি নিরাশ হয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করছিল, একটু দাঁড়িয়ে বলল, 'গাঙ্গুলী বাঈ।'

'সারাদিনে তুমি কত পাও ?'

'ছ' সাত টাকা—আবার কখনো কিছুই না ?'

'ছ'সাত টাকা আবার কখনো কিছুই পাও না ?'

বলে সে একটু বিস্মিত হয়। সে ভাবল, তার পকেটে দু'শ টাকা রয়েছে। টাকাগুলো হারাবার জন্যেই তো সে যাচ্ছে। সে হঠাৎ কি ভেবে বলল, 'দেখ গাঙ্গুলী বাঈ, তুমি রোজ ছ' সাত টাকা পাও—আমি তোমাকে রোজ দশ টাকা দেব।'

'থাকবার জন্যে ?'

'না, তবে তুমি মনে করো থাকবার জন্যেই দিচ্ছি।'

একথা বলেই সে পকেট থেকে বের করে দশটা টাকা এগিয়ে দিল মেয়েটিকে। গাঙ্গুলী বাঈ টাকাটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

'আমি রোজ এমনি করে দশ টাকা দেবো। কিন্তু একটা শর্ত মানতে হবে তোমাকে।'

'শর্ত ?'

'শর্ত হলো, তোমার ঘরে বাতি জ্বলতে যেন আর না দেখি।' শুনে মেয়েটি একটা রহস্যময় হাসি হাসল। 'হেসো না। সত্যি বলছি। এভাবে চললে আমি রোজ তোমাকে দশ টাকা দেবো।'

এরপর সে রোজ যখনি সন্ধ্যার সময় থামের কাছে এসে গাড়ী থেকে নেমে মোটা লেন্সের চশমা আর ধুতি ঠিক করে নেমে পড়ত, সিঁড়িতে পা রাখার আগে গাঙ্গুলী বাঈকে দশ টাকার একটি নোট এগিয়ে দিত। গাঙ্গুলী বাঈ তা হাতে নিয়ে মাথায় ছুঁয়ে সালাম করত। এরপর সে একশ' নব্বই টাকা নিয়ে উপরে চলে যেত। যেদিন রাত এগার-বারটার মধ্যেই সে সব টাকা হারিয়ে ফেলত, বাড়ী ফেরার সময় খেয়াল করে দেখতো গাঙ্গুলী বাঈর দরজা বন্ধ।

এতদিন রাত দশটার মধ্যেই সব টাকা হারিয়ে ফেলল সে। সিঁড়ি ভেঙ্গে ধুতির কোচা ঠিক করতে করতে যখন সে নিচে নামছিল

গাঙ্গুলী বাঈর ঘরের দিকে তাকাতে মনে ছিল না তার। ট্যাক্সিতে বসতেই হঠাৎ খেয়াল পড়ল। উঠে এসে দেখলো গাঙ্গুলী বাঈর সেখানে বাতি জ্বলছে। গাঙ্গুলী বাঈ খদ্দেরের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

'এ কি গাঙ্গুলী বাঈ!'

গাঙ্গুলী বাঈ কোন জবাব দিল না।

'তুমি কথা রাখতে পারলে না, তোমাকে বলেছি, তোমার এখানে যেন আর বাতি জ্বলতে না দেখি। অথচ তুমি দিব্যি আগের মত বসে আছ।'

সে খুবই ক্ষুণ্ণ হলো। গাঙ্গুলী বাঈ চিন্তা করছিল কি উত্তর দেবে। 'তোমরা খুবই খারাপ মেয়ে।'

একথা বলেই সে চলতে উদ্যত হচ্ছিল। গাঙ্গুলী বাঈ মাথা তুলে বলল, 'শোন শেঠ।'

সে দাঁড়িয়ে গেল। গাঙ্গুলী বাঈ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—

'আমি খারাপ মেয়ে সেটা ঠিক। কিন্তু এখানে ভাল মেয়ে কে আছে শুনি? দশ টাকার বিনিময়ে তুমি আমার বাতি নেভাতে চেষ্টা করছ। চেয়ে দেখ তো কত বাতি জ্বলছে।'

মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে সে গাঙ্গুলী বাঈর মাথার উপর লটকানো বাতিটা দেখল। তারপর গাঙ্গুলী বাঈর মোটা দেহটা খুঁটে খুঁটে দেখে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে বলল,

'না, গাঙ্গুলী বাঈ, তা হয় না, তা হতে পারে না।'

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং যত্নতার সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

পর্যটক

কুররাতুল আইন হায়দার

গত বছর এক সন্ধ্যায় দরজায় ঘন্টা বাজল। আমি বাইরে এলাম। এক লম্বা ছিপ-ছিপে ইউরোপীয়ান ছেলে ক্যানভাসের থলে কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ঝুলানো রয়েছে দ্বিতীয় একটি থলে। পায়ে ধুলো মলিন পেশোয়ারী চপ্‌পল। আমাকে দেখে বিনীত হয়ে নাম জিজ্ঞেস করল। তারপর একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল,

'আপনার মামার চিঠি।'

'ভেতরে এসো।'

আছান মামুর চিঠি। তিনি লিখেছেন, আমরা করাচী থেকে হায়দারাবাদ (সিন্ধু) ফিরে যাচ্ছিলাম। খাটের মাকালী ছিলের কবরের মাঝে ছেলেটি বসেছিল। আংটি দেখিয়ে পাথেয় চাইলে আমরা তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। ছেলেটি বিশ্ব-ভ্রমণে বেরিয়েছে। এখন ইণ্ডিয়াতে যাচ্ছে। অটো বড় ভালো ছেলে। আমি তাকে ভারতীয় আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানা লিখে দিয়েছি--সে তাদের কাছে থাকবে। তুমিও তাকে আতিথ্য দিও।

নোট ঃ ওর কাছে সম্ভবত টাকাকড়ি নেই। ছেলেটি কামরায় এসে মেঝেয় থলে রাখলো। তারপর চোখ রগড়ে দেয়ালের চিত্র দেখতে লাগলো। এত উঁচু ছেলেটির মুখখানা বাচ্চার মতো ছোট। আর তার উপর আবছা সোনালী দাড়ি গোঁফ বড় আশ্চর্য লাগছে।

এ দেখছি আরো এক আপদ। আমি একটু বাঁকা করে ভাবলাম। আছন মামু বেচারা ফেরেশতা চরিতের লোকটা এর কাবুতে পড়ে গেল কি করে? এরা হলো বিশ্বপর্যটক। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পথিকদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোতে এরা বেশ ওস্তাদ।

'শাহেদাও আপনাকে সালাম বলেছে।' সে বড় আপন ভঙ্গিতে বলল।

'শাহেদা'?

'হাঁ, আপনার কাজিন। বেনারসে আমি তাদের সেখানে ছিলাম। আর লক্ষ্ণৌতে আপনার ফুফুর সেখানে। চাঁটগাতে গিয়ে থাকব আপনার আঙ্কলের কাছে। আর যদি দার্জিলিং যেতে পারি আপনার কাজিন তাহেরার ওখানে উঠব।'

সে পকেট থেকে আরো একটা লম্বা লেফাফা বের করল।

'বসে যাও অটো, চা খাও।'

আমি দীর্ঘশ্বাস নিলাম। আমার মনে পড়ল সেই দু'জন ডাচ পর্যটকের কথা। যারা করাচী এসে হামেদ চাচার ওখানে ঘাঁটি করে বসেছিল। তাদের পয়সা-কড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

'আমি তুরস্ক এবং ইরান হয়ে এসেছি। জার্মেনী থেকে এ পর্যন্ত মোটর ও লরিতে লিফ্‌ট্ পেয়েছি। এখন যাব লংকা। তার পর থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি। সেখান থেকে কার্গো বোটে চড়ে জাপান, আমেরিকা তারপর বাড়ী পৌঁছব। এখন আমি আওরঙ্গাবাদ থেকে এক ট্রাকে চড়ে এসেছি।'

'তোমার এ সফর বড় এডভেঞ্চার হবে দেখছি।'

'হাঁ, ইস্তাম্বুলে তিনরাত আমি গ্যালাটার পুলের নিচে ছিলাম। আর ইরানে--------'

তারপর বিভিন্ন ছোটখাট এডভেঞ্চার শুনালো। 'আমি কলোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।' এটুকুও শেষে সে বলল।

'সেখানে সবাই আমার সাথে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে খুব বেশী রকম আলোচনা করেছে। অথচ এখানে কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের আলোচনা খুব কম হয়। এখানকার আসল সমস্যা হল...'

বলতে গিয়ে সে ভারতের সমস্যাবলী সম্পর্কে বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। তারপর একটু থেমে শুরু করল,

'আমি ধনী পর্যটক এবং সাধারণ ইউরোপীয়দের মতো শুধু তাজমহল দেখতে আসিনি। আমি রাতভর দোকানের বারান্দায় শুই। কৃষকদের ঝুপড়িতে থাকি এবং মজুরদের সাথে ভাব করি। অবশ্য আমি তাদের ভাষা বুঝতে পারি না।'

খাওয়ার পর সে বোম্বের মানচিত্র বের করে মেঝেয় রাখল।

'বেচারী ইংরেজ বোম্বাইয়ের স্থাপত্য রীতিকে ভিক্টোরিয়ান গথিক বলে। এখানে কি কি দেখবার মতো আছে বলুন দেখি।'

'কেন, এলিফ্যান্টা—আপালু বন্দর আর.....

'এ সব তো গাইড বুকেও আছে।'

সে অধৈর্য হয়ে আমার কথা কাটল। এবং ভারতের জীবন ব্যবস্থা ও রীতি-নীতির উপর বড় ভারী এবং উদাহরণ সমৃদ্ধ আলোচনা করে আমাকে শুনালো।

'অটো, তোমার বয়স কত?'

—আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম। 'একুশ। আর যখন জার্মানীতে যেয়ে পৌঁছব তখন বাইশ। এবং তার পরের বছর আমি ডক্টরেট পাব। আমি জার্মানীর গীতিকাব্যের গবেষণা করছি। জার্মেনীতে শুধু ডক্টরেট দেয়, যেমন আপনাদের এখানে বি. এ. এম. এ.।'

এরপর বহুক্ষণ সে জার্মেনীর গীতিকাব্য, বিশ্ব রাজনীতি মায় ভারতের শিল্প-কলার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। সে নাকি ছবিও আঁকে। কি রকম ডাকসাইটে ছেলে। আমি মনে মনে বললাম। প্রায় জার্মানদের মতোই মার্জিত এবং স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন সে। 'আমি রাত্রে শোবার আগে আপনার বইগুলো দেখতে পাব কি?'

'অবিশ্যি।'

রাতভর বসার ঘরে বাতি জ্বললো। সকাল তিনটেয় গোসলখানায় পানি ঝরার শব্দে আমি জেগে উঠলাম। সে নেয়ে ধুয়ে একদম সাফ সাফাই। যাতে তার জন্যে বাড়ীর কারো অসুবিধা না হয়। নাস্তার সময় সে রাতভর পড়ে শেষ করা পুস্তকের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সম্পর্কে নানা মতামত ব্যক্ত করল। তারপর বোম্বের মানচিত্র বের করে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

কামরা ঠিক করার সময় হঠাৎ তার থলেতে আমি চারিটি বই দেখলাম। গ্যটের ফাউস্ট, হাইনের কাব্য, রিলকে, ব্রেশট এবং পবিত্র ইঞ্জিল।

সন্ধ্যায় সে ভারী ক্লান্ত এবং বিবর্ণ হয়ে ফিরলে আমি বললাম,

'অটো, কালরাতে তুমি তো খোদার অবাধ্য ছিলে—অথচ ইঞ্জিল সাথে নিয়ে চলেছ।'

একথা শুনে অটো খোদার ধ্যানে আবেগ-অন্ধ মানবিক বাধ্যতার উপর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে ফেলল।

'অটো, তুমি এলিফেন্টা গিয়েছিলে? সেখানকার ব্রিমূর্তি আর দেবতা...'

'আমি কোথাও যাইনি। সারাদিন ভিক্‌টোরিয়া গার্ডেনে বসে ভিড় জমা মানুষদের দেখেছি। মানুষ---মানুষই সবচে বড় দেবতা।'

'হাঁ, তাতো বটে। কিন্তু তুমি খেয়েছ কোথায়?'

'আমি এক ডজন কলা কিনে নিয়েছিলাম।'

হঠাৎই আমি খুব লজ্জিত হলাম। যাবার সময় কিছু খাবার দিতে আমার কেন মনে ছিল না। আর আছান মামুর কথাও মনে পড়ল, সম্ভবত ওর কাছে পয়সা কড়ি নেই।

খাবার টেবিলে সে বলল,

'আমি অনেকদিন পর পেটপুরে খাচ্ছি।'

আমি তার সাথে জার্মেনীর আলোচনা করতে লাগলাম। বার্লিনের প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে জানিয়ে দিল যে, সে পাক্কা এন্টি কমুনিস্ট।

'বাড়ীতে আমার মাও আমার জন্যে মজার মজার খাবার পাকায়। আপনি মাকে দেখলে খুব খুশী হতেন। মা'র বয়স এখন বিয়াল্লিশ। নানান বিপদ আপদ বেচারীকে অকালে বুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখনো মা সুন্দরীদের একজন।'

'তুমি কি তার একমাত্র ছেলে?'

'হাঁ, আমার পিতা সৈন্য বিভাগের অফিসার ছিলেন। মা'র বাড়ী প্রসা। মার বয়স যখন সতের এবং যখন বাবার সাথে বিয়ে হয়, তখন বাবা পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে নিহত হন। তার পরের মাসেই আমার জন্ম। বোমা বিস্ফোরণ থেকে বাঁচাবার জন্যে মা আমাকে কাঁধে করে না জানি কোথায় কোথায় ফিরতেন। আমাকে কোলে নিয়ে, মাথায় রুমালের ফলবুট পরে, সামান্য আসবাবপত্র প্রেম্বুলেটরে এঁটে গাঁয় গাঁয় ফিরতেন। আর ক্ষেত খামারে লুকিয়ে থাকতেন। মা যখন পোল্যাণ্ডের এক গাঁয় লুকিয়ে ছিলেন তখন সৈন্যের লোকেরা ঘরে এলো। আমি সে সময় মাত্র বছর চারেকের। আমার শৈশবের অবিস্মরণীয় স্মৃতি এই ভীষণ রাতটা। আমি ভয়ে পালংকের নিচে লুকালাম। লোকেরা যখন মাকে টেনে নিলো আমি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম। মাকে তারা টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল। এর পর মা

বেশ ক'দিন পর ভয়ে ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরে এলেন। এদিকে আমি সে খালি ঘরে একা। বাইরের গোলাগুলির আওয়াজ ঘরের কোণে ছম ছম করে বেড়াত। বাবুর্চিখানা এবং ভাঁড়ারের আলমারি খুলে আমি খাবার তালাশ করতাম। যা কিছু পেতাম তাই ক্ষুধার জ্বালায় খেয়ে ফেলতাম। আলমারিগুলোর তাক ছিল অনেক উঁচুতে। এবং সেগুলোতে অনেক খাবারও ছিল। কিন্তু আমি নাগাল পেতাম না।'

এতটুকু বলে সে চুপসে গেল। এবং নীরবে খেতে থাকলো।

'এ চাউলের খাবার খুব ভাল লাগে।' কয়েক মিনিট পর সে একটু আস্তে করে বলল---।

এই জন্যে প্রায়শই আমি যুদ্ধের ধ্বংসকাহিনী পড়িনা। বড়দের কাছ থেকে শোনা এমনি আরো অসংখ্য বীভৎস কাহিনী শুনেছি। আমার সেই ফরাসী মেয়েটির কথা মনে পড়ল, যে এই অটোরই স্বজাতি জার্মানদের মৃত্যু লীলার কাহিনী শুনিয়েছে। এই পোল্যাণ্ডেই যেখানে অটো এবং তার মা'র এই দুরবস্থা, তখন নাৎসীরাও রাতদিন সেখানে কাজ করেছে। রোজ যেখানে হাজারো ইহুদিদেরকে নিষ্ঠুর মৃত্যুর যন্ত্রে নিপতিত করা হতো। বৃটিশের গোলা বারুদ এ অঞ্চলকে করে দিয়েছিল একেবারে ধ্বংসস্তূপ। আমার সেই রুশ বালিকার কাহিনীও মনে পড়লো। কে যেন কাহিনীটা শুনিয়েছিল। নিজের সারা পরিবার জার্মানদের নির্মম মেশিন গানের সামনে আহুতি দিতে দেখে ভয়-বিভীষিকায় পলকের মধ্যে বালিকাটির মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।

অথচ এরা ছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশোত্তর ইউরোপের নবীন বংশধর। পৃথিবীর সভ্যতার মানবতার সেবক যীশুর অনুসারী পশ্চিম ইউরোপ তার সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে কি দিয়েছে!

'তোমার মা এখন কি কাজ করেন?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। তিনি এখন হাউস কিপার। সামরিক বিধবা হিসেবে পেনশন পান। আমাদের দু কামরার ছোট ঘর। আমি সন্ধ্যা শিফ্‌টে এক ফ্যাক্‌টরীতে কাজ করি। আমার মা বড় ভালো। এসট্রলজিতে পূর্ণ বিশ্বাসী, রীতিমত গির্জায় যান। গত বছর আমি সাইকেলে সারা জার্মেনী ভ্রমণ করেছি। জার্মেনী পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দেশ।'

'সব দেশই তার বাসিন্দাদের কাছে সুন্দর হওয়া চাই। কিন্তু তুমি নব্য নাৎসী যেন না হও।'

'না আমি নাৎসী হবনা। ইহুদিদের প্রতি আমার বড় বেশী ঘৃণা নেই।'

সে সহজে বলল। আর আমার হাসি পেল।

'আমার মাতুলরা এখনো পূর্ব জার্মেনীতে রয়েছে। যেমন আপনার কিছু লোক এখানে, আর কিছু পাকিস্তানে।' সে ম্যাপ দেখিয়ে বুঝাল।

দ্বিতীয় দিন সে কথা দিয়েছিল শহরের দর্শনীয় সব কিছু দেখবে। কিন্তু সে দিনও সারাক্ষণ সে রাণীবাগে বসে কাটাল।

চতুর্থ দিন সে ওয়ার্ডেন রোডের ভুলা ভাই দেশাই ইনস্টিটিউটের বারান্দায় বসে লাওস যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়ে দিনটা কাটাল।

'ভেতরে মেয়েরা নাচ শিখছিল আর হল ঘরে হোসাইনের নতুন চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছিল। অতএব সেই সাথে আমি আর্ট কালচার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছি।'

সে ফিরে এসে বলল।

বোম্বের সব দূরত্ব সে পায়ে হেঁটে দূর করতো। ওয়ার্ডেন রোড থেকে ফ্লোরা ফাউন্টেন অবধি সে পায়ে হেঁটে গেছে। আমার মনে হয়েছিল জার্মান জাত নিঃসন্দেহে জীন বা দেও জাত-সম্ভূত।

'আমি আট আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত রোজ খরচ করি। এবং প্রায়শ কলা খেয়ে থাকি। সবখানেই অনেক অতিথিপরায়ণ লোক মিলে যায়। কি আশ্চর্যের কথা মানুষ এককভাবে কত সাদাসিধে এবং নিষ্পাপ, অথচ সমষ্টির আবর্তে সেও পশু বনে যায়।'

এরপর সে মুখ উঁচু করে বসল। সেদিন সে এক ট্রাক কোম্পানীর সাথে চুক্তি করে এসেছে। বাঙ্গালোর অবধি সে ট্রাকে চড়ে যাবে। খুব সকালে সে তার বই-পত্র, কাপড়-চোপড়, তাঁবু এবং বিছানা-পত্র দিয়ে থলে দুটি ভরে কাঁধে তুলে নিল। এবং খোদা হাফেজ বলে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর অফিসে ফ্লোরা ফাউন্টেনে পায় হেঁটে রওনা দিল।

অটো চলে গেছে কয়েক মাস হলো। আছান মামুর চিঠি এলে আমি তাকে অভিযোগ করে লিখলাম, সেই ছেলে অটো এখান থেকে

যে গেলো এতটুকু খবরও আর দিলনা যে, সে এখন কোথায় কোথায় ফিরছে। আছান মামুর চিঠি ডাকস্থ করে ফিরতেই বিকেলের ডাকে অটোর চিঠি এলো। খামে লাওসের রাজার ছবি। চিঠিতে লিখেছে।

'সেই জার্মান ছেলেটি, যে আপনার বাড়ীতে ক'দিন থেকে ছিল, আপনাকে ভুলে যায়নি। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। (মাফ করবেন, আমি ইংরেজীতে দুর্বল) আপনি আমাকে বড় বোনের মত স্নেহ দিয়েছেন। আমি ভালবাসায় আস্থাবান। এর কারণ হয়ত আমি এখনো কম বয়সী। কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন।' পৃথিবীতে সে সব লোকেরাই সুখী, যারা কোন দিকে না দেখে, প্রশ্ন না করে সব কিছু মেনে নেয়। আমরা যতই প্রশ্ন করছি ততই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জীবনটা নিছক নিরর্থক।

লংকায় নিউয়েলিয়া থেকে কেনেডি পর্যন্ত এক টুরিস্ট বাসে গিয়েছি। বাসে এক সিংহলী ছাত্রের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সে আমাকে তার সাথে খাইয়েছে। তার নাম রাজা। সে আমার জন্যে পথে কিছু ফুলও কিনেছে। বাসে ক'টা ঢোল ছিল। রাজা সেগুলো বাজিয়ে গান গাইল। সে গান আমার বড় ভাল লাগল। এক সময় রাজা আমাকে বলল, চলো আমরা স্নান করি। অথচ কয়েক মিনিট পরে সে মরে গেল। হঠাৎ পানিতে ডুবে গিয়েছিল। দু'ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর আমরা তার শব এক বাঁকের নিচে পেলাম। এসব কি? আমি ভাবতে লাগলাম, এমন হল কেন? আমাদের কেউই রাজাকে বাঁচাতে পারলো না। এটা কি ঘটনা চক্রে ঘটলো, না এটাই তার ভাগ্যে ছিল। রাজা মা-বাবার একমাত্র ছেলে। তার বোন এবং ভাইও পাঁচ থেকে পনের বছরের মধ্যে মরেছে। তার বাপ অন্ধ। মাও বড় রুগ্না, রাজাই তাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

মাদ্রাজের এক যুবক কবি আমাকে জানালো, এই পৃথিবীর কারণে সে খুব দুঃখী। মাদ্রাজে আমি রেডিও ইন্টারভিউ দিয়ে কিছু টাকা উপার্জন করলাম। তারপর আমি পেনাং গেলাম। খুব সুন্দর দ্বীপ সেটা। সেখানে অসংখ্য চীনারা থাকে।

এক মালগাড়ীর শেষ ডাব্বায় চড়ে আমি ব্যাংককে পৌঁছলাম। সেখানে এক বৌদ্ধ মন্দিরে থাকি। মন্দিরের যাজকদের সাথে আমি খাবার খেয়েছি। দ্বিপ্রহরের সময় সুন্দরী মেয়েরা এবং মহিলারা নানা

বেশ-ভূষায় তাদের ভাগ্য এবং ভবিষ্যত জানবার জন্যে যাজকের কাছে আসে।

বেশীর ভাগ ভিক্ষুই প্রেমপিয়াসী। দেদার তামাক টানে। কোন কাজ করে না। ধর্মভীরু বৃদ্ধরা তাদের খাবার এবং পয়সা জোগায়। অনেক ভিক্ষুই মন্দিরে বসেছে পরিশ্রম ভালো লাগে না বলে। লোক-গুলো ভারী দুর্বল। অথচ তাদের ধর্মে এই হীনতার এক সুস্পষ্ট বৈধতাও বিদ্যমান। এদের অনেকে যথানিয়মে শুচিশুভ্র হয়ে যোগ সাধনায়ও বসে। বেশীর ভাগ ভিক্ষুই খাওয়া এবং মেয়েদের সাথে আলোচনা ছাড়া বাকী সময় শুয়ে শুয়ে কাটান।

নাংকাইতে আমি মেকং নদীতে স্নান করেছি। তারপর লাওস চলে এসেছি।

দিয়েন ভিয়েন একটা বড় গ্রামের মতো। রৌদ্র বড় কড়া। সড়ক ধুলোয় ধূসর। শুধু রাতটা বড় সুন্দর। কারণ, অন্ধকার সব কদা-চার, অত্যাচার, হানাহানি এবং রক্তপাত বুকে লুকিয়ে নেয়। এখানে মশা বড় বেশী।

সুফানা অবধি এক প্লেনে ফ্রি লিফ্‌ট্ পেলাম। এখন আমি পাক-শাতে আছি। তারপর যাব কম্বোডিয়া। আংকল আহমদের ওখানে মানে চিটাগাং যেতে পারিনি। কারণ বর্মায় প্রবেশ করতে হিমশিম খেয়ে গেছি। আমি লালচীন এবং ভিয়েতনামের ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছি। পিকিং বা হ্যানয়ে গিয়ে জবাব পেয়ে যাব। কাল আমি এখান থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাচ্ছি।

আপনার চির কৃতজ্ঞ

'অটো'

উনিশশো তেষট্টির এক বিদেশী পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'ভিয়েতনামের অরণ্যপুরী' শীর্ষক রঙ্গিন সচিত্র প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে রয়েছে গেরিলা সৈনিকদেরকে গুলী করে মারার দৃশ্য। নৌকায় করে গেরিলা কয়েদীদেরকে মেকং নদী পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কৃষাণ মেয়েরা তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওপারে পৌঁছলে তাদেরকে গুলী করে মারা হবে। প্রবন্ধের শেষ দিকে দু'পৃষ্ঠা ব্যাপী রঙ্গিন ছবি রয়েছে। তাতে রয়েছে সজীব ধান ক্ষেত। ধানের শীষ হাওয়ায় দুলছে। প্রান্তসীমায় গাছের লম্বা পাতা দুলছে। সবুজ সতেজ বনানী তার

পাশে ছল ছল করা নদী। বড় মনোরম দৃশ্য। শিল্পী যা দেখে ছবি আঁকে। কবি কবিতা লেখে। আর গাল্পিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পট-ভূমিকায় গল্প লেখে। কিন্তু এ ছবির শেষ দিকে বিস্রস্ত বিবর্ণ অর্ধ-নগ্ন রক্তাক্ত এক যুবক পড়ে আছে। কিছু দূরে কালো রঙের যুদ্ধ বিমান ভয়াল দানবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছবির নীচে লেখা রয়েছে

"মৃত্যুর খামার"

ভিয়েত কং গরিলা, তাকে মেকাং নদীর ধানক্ষেতে মারা হয়েছে, তার সাথীরা একে অপরের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় এক কোণে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। এই রক্তাক্ত খণ্ডযুদ্ধে এক পর্যটক যুবক মেকং নদী পার হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাচ্ছিল। হঠাৎ ফসকে যাওয়া এক গুলি তাকে ভেদ করে যায়। এই সুন্দর দেশে ১৯৪৪ সাল থেকে ভীষণ যুদ্ধ চলে আসছে, এবং .....।

নকশা করাচী অক্টোবর ৬৩ ইং সংখ্যা থেকে অনূদিত। সোনালী জীবন, ১৯৬৩ ইং

সোনার চুড়ি

খাজা আহমদ আব্বাস

বর্ষা রাতের আঁধারকে আরো নিকষ কালো করে দিয়েছে। মনে হয় (সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে শংকর ভাবছে) আজ ভগবানও বাদলার লেপ গায় দিয়ে গুম মেরে গেছে। আজ সারা বিশ্বচরাচরে একা আমি আর আমার মনের স্পন্দন জেগে আছে শুধু।

আর একবার বিজলী চমকালো। সে ভাবল, আমার জীবনও এই সড়কের মতো--যে সড়ক নাসুক থেকে জুনার অবধি গেছে।

নাসুক ঃ সেই পবিত্র তীর্থস্থান, যেখানে ভগবান রাম বনবাস কালে ক্ষণকাল পদার্পণ করেছিলেন।

জুনার ঃ ঐতিহাসিক জায়গা, যেখানে ছত্রপতি শিবাজীর জন্ম। একদিকে নাসুক অপরদিকে জুনার, মাঝখানে যোগসূত্র এই সড়ক। রাতদিন গাড়ী-ঘোড়ার আনাগোনায় কর্মচঞ্চল। লাখ টাকা দামের গাড়ীতে দু' দু' লাখ টাকার হীরা জহরতমণ্ডিতা শেঠদের স্ত্রী। ট্রাকে ট্রাকে লাখো টাকার মালপত্র। গাড়ী ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে রাস্তার বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আর এই ক্ষত স্থানে এখন কাদার পুঁজ জমা হয়েছে। মুষলধারার বর্ষা পাহাড়ের কোল থেকে ঢল নিয়ে এসেছে। মাঠঘাট সমুদ্রের মত থৈ থৈ করছে। এখন সড়কও ডুবতে শুরু করেছে। আজ রাতে এই বৃদ্ধ সড়ক তার ক্ষত-বিক্ষত বুক নিয়ে ডুবে যাবে—মরে যাবে আর সেই সাথে শংকরও মরে যাবে এবং ধানের কচি শীষের মত গজিয়ে ওঠা মনের গভীরে স্বপ্নশতদলগুলোও বিলীন হয়ে যাবে তার। নাসুক থেকে জুনার অবধি সড়ক আমার জীবনেরই মতো। যে জীবন শুরু হয়েছে ছোট্ট পাঠশালাতে। আমার বাবা পাঠশালাতে মাস্টারী করতেন। কত আশা করতেন বাবা আমাকে নিয়ে। বাবার আদর-সোহাগের স্পর্শে আমি

কোনদিন ভাবতেও পারিনি যে, আমার মা নেই। তিনি মায়ের মমতা, বাবার ভালবাসা দিয়েছেন আমাকে। বলতেন, ছেলেকে কলেজে পড়াব। দেখবে আমার শংকর অফিসার হবে, অফিসার। সবাই তাকে সালাম করবে। কিন্তু আমি মাইনরও পাস না করতেই বাবা ভগবানের ডাকে চলে গেলেন। যা কিছু জোত-জমা ছিল তাঁর চিকিৎসা এবং শ্রাদ্ধে চলে গেছে। সংসারকে দারিদ্র্যে গ্রাস করল আর আমি পাঠশালা এবং স্বপ্নময় ভবিষ্যতকে পদদলিত করে এসে দাঁড়ালাম এই সড়কে। চৌরাস্তায় গাড়ী থামলে আমি দৌড়ে দৌড়ে আরোহীদের চা-সোডা-লেমন এনে দিতাম। ইঞ্জিনে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিতাম। রাস্তার আবর্জনা সাফ করে দিতাম। আর এতেই শেঠরা এক আনি দু'আনি ছুঁ দিত আমার দিকে। আমি খুশী হয়ে মিলিটারী কায়দায় সেল্যুট জানাতাম। তারপর বখশিশের আশায় আবার অন্য গাড়ীর দিকে দৌড়াতাম। এমনি করে রাতের শেষ গাড়ীটাও যখন চলে যেত কিছু খেয়ে বা না খেয়ে হোটেলের বারান্দায় শুয়ে পড়তাম আমি।

শংকর চোরা-বাজার থেকে যে পুরনো বর্ষাতিটা নিয়েছিল, তা দিয়ে পানি চুয়ে চুয়ে জামা ভেদ করে গায়েও এসে পৌঁচেছে কিছু পানি! শো শো ঠাণ্ডা বাতাস শিহরণ জাগিয়ে যায় সারা দেহে। বাতাস থেকে বাঁচবার জন্যে বর্ষাতির কলারটা উঠিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল সে। এরি মধ্যে তীব্র বিদ্যুৎ চমকালো একবার। কর্দমাক্ত পথ ঝলসে উঠল এক দণ্ডের জন্য। দূরের নিমগিরি পাহাড় উটের মেরুদণ্ডের মত মনে হল শংকরের। মেঘের তীব্র গর্জনে শংকরের পায়ের নিচের মাটি যেন দুলে উঠল। তারপর আবার অন্ধকার, আবার অখণ্ড নীরবতা। এমন সময় ডান পায়ের জুতার ওপর দিয়ে একটা মসৃণ বস্তু যেন গড়িয়ে নামছে বলে অনুমান করল সে। সাপ! গা কাঁটা দিয়ে উঠল তার। সারা দেহ তার পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে গেল। এ সময় স্থির থাকাই কল্যাণ, না হয় বেঘোরে প্রাণটা যাবে নির্ঘাত। দু'তিন সেকেণ্ড লাগল সাপটা গড়িয়ে যেতে। কিন্তু তার মনে হল অনেক ঘন্টা চলে গেছে।

তারপরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। অতঃপর বর্ষাতির পকেট থেকে পাঁচ ব্যাটারীর লম্বা টর্চটা বের করল। তত-

ক্ষণে সাপটি কাদা পানির মধ্যে আত্মগোপন করেছে। সড়কের ক্ষত-বিক্ষত বুকের ওপর টর্চের আলোটা মেলে ধরল। কাদা আর পানি ভর্তি একটা গর্তের চারিদিকে ক'টি সোনালী চক্র চিক চিক করে উঠল। না, এ আলোর চক্র নয়। চুড়ি, চারগাছি সোনার চুড়ি।

চারগাছি সোনার চুড়ির বিনিময়েও সে পার্বতীকে পেতে পারে না। ডাগর ডাগর চোখ, কালো কুন্তল আর যৌবনবতী তার প্রিয়তমা পার্বতী। পার্বতী তার ভবিষ্যৎ। তার জীবনপথের দিশারী। মামলতদার তার মেয়েকে একজন বেকার ভবঘুরে যুবকের কাছে বিয়ে দিতে নারাজ। চার পয়সার জন্য যে মোটরের পেছনে পেছনে দৌড়ায়, বউকে পরাবার মত তার কাছে চারগাছি সোনার চুড়িও তো হবে না।

জুনারের এক স্বর্ণকারের কাছে চারগাছি চুড়ির দাম জিজ্ঞেস করেছিল শংকর। বলেছিল, চার চুরিতে চার তোলা সোনা ছ'শ টাকা আর মজুরী বিশ কি পঁচিশ। পার্বতীর জন্যে চার তোলা সোনা কেন বিশ তোলা সোনাও নগণ্য। কিন্তু শংকর হিসেব করে দেখেছে চারগাছি সোনার চুড়ি তৈরি করতে তার সাত বছর লাগবে। এর মধ্যে যদি আবার দর বেড়ে যায় তো আরো বছর ছ'মাস বেশী লাগতে পারে। না, এতদিন সে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারে না। বরং টাকা কামাবার জন্য তাকে নতুন নতুন পথ খুঁজতে হবে।

এই ভেবে সে একদিন এ-স-টি-র বাসে চড়ে সোজা বোম্বে চলে গেল। সেখানে সে জুতা পালিশ করল কিছুদিন। এক আনা দু'আনার জন্যে ট্যাক্সির পেছনে দৌড়াল। ছোটখাট হোটেলে বয় হিসাবেও কাজ করল কিছুদিন।

কিন্তু এতকিছু করা সত্ত্বেও সে দশ টাকার বেশী জমাতে পারল না। একদিন জানা-শোনা একজন লোক একটা কাপড়ের পোঁটলা দিয়ে বলল, এতে দুটো হুইস্কির বোতল। এগুলো ওয়ার্ডেন রোডের অমুক বিল্ডিং-এর অমুক নং ফ্লাটে পৌঁছে দিয়ে এসো। দশ টাকা পাবে। শংকর ভাবল, কাজটাতো বেশ। বাসে-আসতে যেতে আট আনা লাগবে। আর বাদবাকী সাড়ে ন'টাকাই লাভ।

এবং হলোও তাই। বরং সেখানে সে বোতল পৌঁছে দিলে সে ফ্লাটের শেঠও তাকে এক টাকা এনাম দিল। তারপর আর কি,

শংকর মদ সাপ্লাইর ধান্ধায় লেগে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই সে দু'শ টাকা জমা করে ফেলল। এখন মন চায় চারগাছি সোনার চুড়ি বানিয়ে খেদগাঁয় ফিরে যায়। কিন্তু এখন ফিরে গিয়ে কি হবে? এখন সে টাকা রোজগারের ফন্দি জেনে গেছে। দু'হাজার টাকা জমলে তবে সে খেদগাঁয় ফিরে যাবে। তখন পার্বতীর জন্যে শুধু চুড়িই বানাবে না বরং ঘর-সংসার পাতবার জন্যে একটা কুঠুরিও বানিয়ে নেবে সে। একদিন এসব মধুর স্বপ্নে পথ চলছিল আর হঠাৎ বে-খেয়ালে তার পোঁটলাটা রাস্তায় পড়ে গেল এবং সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

প্রথমবার দু'মাসের সাজা হলো।

দ্বিতীয়বার তিন মাসের।

তৃতীয়বার যখন জেল থেকে ছাড়া পেল, বোম্বের প্রবাদে তাকে ত্রিপাড় করা হল। অর্থাৎ তাকে খেদগাঁয় ফিরে আসতে হল। খেদ-গাঁয় এসে চারগাছি সোনার চুড়ি তৈরি করার জন্যে সে অভিনব পন্থায় পয়সা উপার্জনের ধান্ধায় লেগে গেল। রাতের অন্ধকারে সে লোহার পেরেক ছড়িয়ে রাখত সড়কে। আর তাতে চলন্ত গাড়ীর চাকা হঠাৎ ফুটো হয়ে যেত। চাকা বদলাতে হতো তখন। শুধু স্টার্টারে কাজ না হলে ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট করিয়ে দিত সে। এ কাজের বদলে সে টাকা সোয়া টাকা পেত। অবশ্য এটাই তার আসল উপা-র্জন ছিল না। গাড়ী স্টার্ট হবার সুযোগে লোকদের চোখ বাঁচিয়ে এটা-ওটা তুলে রাখত সে। একবার সে পেছনের লাগেজে কেরিয়ার থেকে একটা স্যুটকেসই উঠিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে তাতে শুধু উলের কাপড়-চোপড়ই ছিল। তবু সে স্যুটকেসে গোটা পাঁচেক টাকা পেয়েছিল। একবার তো সে ট্রানজিস্টার সেট পেয়ে গিয়েছিল একটা। যে দালাল তার কাছ থেকে মাল নিয়ে বোম্বের চোরাবাজারে পৌঁছে দিত তাকে সেটা পঞ্চাশ টাকায় দিয়ে-ছিল। আর দালাল সেটা বেঁচল শ'টাকায়। তারপর বোম্বের এক রেডিও দোকানের শেলফে গিয়ে সেটা বলাকে বিক্রি হল সাড়ে তিনশ' টাকায়। কম্বল, শাল, হ্যাণ্ড ব্যাগ, বর্ষাতি, কোট—যে বস্তুই তার নাগালে আসতো সহজে ছাড়তোনা সে। একবার কিছুই মেলেনি বলে পেট্রোল ট্যাঙ্কের কাপ উঠিয়ে নিয়ে এক টাকার বিক্রি করেছিল।

এমনি করে প্রায় পাঁচশ' টাকা জমিয়ে ফেলল শংকর। ব্যাস, এখন চুড়ির অর্ডার দিতে মাত্র একশ' টাকার কমতি। আজ এই হতভাগা বর্ষাটা না হলে আজ রাতেই সে টাকাটা পূরণ হয়ে যেত।

মানলাম (শংকর ভাবল) ছ'শ টাকা হলো, চার তোলা সোনাও হলো, মামলতদারও মেয়ে দিতে রাজী হলো, কিন্তু পার্বতী কি রাজী হবে? পার্বতী আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। বোম্বে থেকে ফিরে এসেছে অবধি পার্বতীর কি যেন হয়েছে। আগে সে কত হেসে হেসে কথা বলত, লাজ-নম্র চোখে ফিরে তাকাত। কিন্তু আজকাল শংকরকে দেখলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। একদিন সে একাকী পেয়ে পার্বতীকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আরে তোর কি হলো? ভাল করে কথা বলিস না কেন? আমার সাথে দেখা হলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে তোর। আমি এমন কি দোষ করেছি যার জন্যে তুই এমন করিস?'

'তুমি শহরে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছ। তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে।' 'তার মানে তুই আমাকে বিয়ে করবিনে?'

পার্বতী মুখ লুকিয়ে নিয়ে জবাব দিল,

'আগে আয়নায় নিজের চেহারা একটু দেখে নাও।'

হ্যাঁ, পার্বতী ঠিকই বলেছে। শুধু সোনার চুড়ি জোগাড় করলেই হবে না, চেহারাটাকেও মেজে-ঘষে সুন্দর করতে হবে। চেহারাটা রুক্ষ না হলে পার্বতী বলবেই বা কেন?

হায় ভগবান, (সে মনে মনে প্রার্থনা করল) আজ রাতে অন্তত একটা মোটর তো পাঠিয়ে দে। মোটর না হোক, ট্রাক। ট্রাক না হয় গরুর গাড়ীই সই। আর কিছু না পেলে এই রাতে আমি খেত থেকে ফলমূল ছিঁড়ে নিলেও নোব।

এরপর তার প্রার্থনার জবাবে মুষলধারা বর্ষার বুক চিরে একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। খুব কাছেই খুব দ্রুত আসছে মোটরটি। না, না, (তার অভিজ্ঞ কান সাক্ষ্য দিল) এতো মোটর এঞ্জিন না। এতো বিমান।

সপ্তাহে দিনে দু'তিনবার এবং এই শেষ রাতে এই গাঁয়ের উপর দিয়ে একটা বিমান বোম্বের দিকে চলে যায় প্রায়শঃ।

বিমানটি এত উপর দিয়ে যায় যে, কখনো ঠিক করা মুস্কিল

যে, এটা চিল কাক, না বিমান। আর রাতে তো লাল নীল হলদে আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু শংকর যখন বোম্বেতে ছিল সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে এসব বিমানগুলোকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখছে। এক এক বিমানে শ' সোয়াশ' যাত্রী, তিন-চার ট্রাক মালপত্র, অসংখ্য স্যুটকেস, ডজন ডজন বড় বড় জাহাজী ট্রাক আরো নানা মালপত্রের গাঁট--চোখের পলকের মধ্যে সব বাক্স তোরঙ্গকে এক্সরে করে ফেলল শংকর। এসব বাক্সের মধ্যে রয়েছে জমকালো স্যুট, হাল ফ্যাশনের টেডি পাতলুন, সিল্কের বুস সার্ট, নাইলনের কাপড়, রেশমী শাড়ী, রেডিও ট্রানজিস্টার, প্রসাধন দ্রব্য, পুরুষের হাতঘড়ি, মেয়েদের হাতঘড়ি, গহনা আর সোনার চুড়ি।

নিমগিরি পাহাড়ে বাদলা ছেয়ে আছে। মুষলধারে বর্ষা চলছে বর্ষার মধ্যে বিমানের বাতি কেমন দেখাবে? শব্দটা ক্রমেই নিকটতর হতে লাগলো। মনে হচ্ছে একেবারে নিচে দিয়ে আসছে বিমানটা শংকর মোটর কাবু করার জন্যে পেরেক ছড়িয়ে রাখে। কত ভাল হয় (শংকরের মনের শয়তানটা নিঃশব্দে বলল) যদি আমি পেরেকগুলো হাওয়ায় ছড়িয়ে দিই আর আজ এই অন্ধকার রাতে কোন মোটরের বদলে গোটা একটা বিমানই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে!

ঠিক তখনি নিমগিরির শিখরে বিজলী চমকালো। কিন্তু এতো বিজলীর চমক নয়। বিজলী তো শুধু পলকের জন্যেই চমকায়। কিন্তু এ আলো তো লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলছে।

'হায় হায়।' শংকরের প্রাণের স্পন্দনগুলো যেন চিৎকার করে উঠল। বিমানটা নিমগিরির সাথে ধাক্কা খেয়েছে।

শংকরের শতয়ান মন চুপি চুপি বলল, সোনার চুড়ি। কিন্তু তার মানুষ মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। হায় ভগবান, বেচারী যাত্রীদের কি অবস্থা তাহলে? আর অমনি সে পাগলপ্রায় হয়ে নিমগিরির দিকে দৌড়াতে লাগল।

ছেলেবেলায় কতবার সে নিমগিরির চূড়ায় উঠেছে। চূড়ায় উঠবার সব পথঘাট তার জানা। কিন্তু এ সময়তো অন্ধকার। বর্ষা, কাদা আর পদে পদে পিচ্ছিল।

তবু সে আছড়ে--পিছড়ে হোঁচট খেয়ে রাস্তা খুঁজে খুঁজে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে বিজলী চমকালে মনে হয় চূড়াটা অনেক কাছেই।

পরক্ষণেই আবার মনে হয় নিমগিরি কতদূর। হিমালয় অভিযানে চলেছে যেন সে, ঝোপের কাঁটায় খোঁচা খেয়ে তার পুরনো বর্ষাতিটা ছিঁড়ে গেল। জুতা জোড়াও কাদা পানিতে আটকে গেছে। শংকর জুতা রেখে দিয়ে খালি পায়েই রওয়ানা দিল। নগ্ন পা পাথরের খোঁচায় কেটে রক্তাক্ত হচ্ছে কিন্তু তবু সে চলেছে অবিরাম। ওর বিবেক ওকে তাড়া করছে। জলদি যাও--হয়ত তুমি কোন লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারবে।

পাশাপাশি শয়তান মনটাও তাকে তাড়া করছে। চলো জলদি চলো। পথ দেখবার জন্যে যতবার টর্চটা জ্বালাচ্ছে, ততবারই রক্তালোক ফুটে উঠে কাদা পানিতে। কতকগুলো সোনার চুড়ি ছাপিয়ে ওঠে তার মনে।

চলতে চলতে না জানি ওর কত ঘন্টা ব্যয় হলো। তখনো সে নিমগিরিতে উঠছিল। পথ এত পিচ্ছিল যে, দু'কদম উঠে চার কদম নিচে নেমে আসে। একবার পিছলে নিচের দিকে পড়ে যেতেই একটা ঠাণ্ডা মতো কি যেন পায়ে ঠেকল। আলো ফেলে দেখলো একটা মোটা অজগর। সামনের অংশ একটা গর্তে লুকানো। ভাগ্যিস পা'টা লেজেই পড়েছিল। সাপের লেজ পেরিয়ে আরো একটু এগিয়ে গেল সে। হঠাৎ একটা টিলা থেকে একটা ভয়ানক গর্জন ভেসে এল। অন্ধকারে বাঘের চোখ দুটো জ্বলন্ত আগুনের হলকার মত জ্বল জ্বল করছিল। শংকর একটা টিলার আড়ালে পালিয়ে গেল। জ্বলন্ত চোখ দুটো ক্রমশ তার দিকে এগোচ্ছে। ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, বাঘটা আস্তে আস্তে ওর কাছ ঘেঁষে চলে গেল। অনিবার্য মৃত্যুর আশংকায়, ভয়ে সে চোখ দুটো বন্ধ করে নিয়েছিলো। বাঘের শ্বাস এবং ঘ্রাণও পেয়েছে সে। কিন্তু বাঘ তাকে কিছুই করলনা। বাঘের গন্ধ, শ্বাস এবং পদশব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। বর্ষা এবং ঠাণ্ডা সত্ত্বেও সে অনুভব করল তার ভেতরের জামাটা ঘামে ভিজে গেছে।

এখন টিলা পেরিয়ে এসেছে। ঝোপ-ঝাড়ও আর নেই সামনে তেমন। প্রশস্ত ঢালুতে শুধু গাছ আর আগাছা ছড়ানো। বর্ষা থেকে গেছে। এখন যতই সে চূড়ার দিকে উঠছে ততই বাতাস বাড়ছে যেন। বর্ষাতিটার কিছু অংশ এখনও গায়ের সাথে লেপ্টে আছে।

কাঁধের উপর সেটা ফরফর করছে। এক সময় সেটা খুলে ফেলে দিল সে।

অবশেষে চূড়ায় পৌঁছল শংকর। বাতাসের টান নিজেকে সামলে রাখতে পারছেনা। শংকর টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক তাকায়। সহসা কি যেন বাতাস ফর ফর করতে করতে ওর গায়ে এসে লাগল। ঘাবড়ে গিয়ে সেটাকে ফেলে দিতে গিয়ে অনুভব করল, সেটা কাগজ। আলো জ্বেলে দেখল নোট। কিন্তু এ দেশী নোট নয়। অন্য কোন দেশের। বিদেশী বর্ণে কি জানি লেখা আছে নোটে।

নোট, শুধু নোট। শুকনো পাতার মতো বাতাসে উড়ছে নোট। টর্চের বৃত্তাকার আলোতে চারগাছি সোনার চুড়ি নৃত্য করতে লাগল শংকরের মনের চোখে।

যেদিক থেকে নোটগুলো উড়ে আসছিল, বিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং সমুদয় মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখানে। সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল শংকর। হঠাৎ পায়ে একটা ঠাণ্ডা কি যেন ঠেকল আবার। টর্চ ফেলে দেখল লাশ। টর্চের আলো কালো জুতা, দামী প্যান্ট এবং কোটের ওপর দিয়ে যেয়ে লাশের শেষ প্রান্তে যেয়ে থামল। কিন্তু মাথা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। শুধু রক্তরঞ্জিত গলাটা কলারের সাথে লেপ্টে আছে। শংকরের আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। টর্চের আলো নিভিয়ে দিল সে। একটু পিছে হটে গেল। অন্যদিকে টর্চ জ্বেলে দেখল একটা লেডিজ ব্যাগ। তাড়াতাড়ি তুলে নিল সেটা। ওটার পাশেই একটা ট্রানজিস্টর চূর্ণ-বিচূর্ণ। কোন পরোয়া নেই—মেরামত করিয়ে নেয়া যাবে।

নিমগিরির চূড়ায় উষার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। শংকর টর্চটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর পাগলের মতো দৌড়ে দৌড়ে এটা-ওটা জমা করতে লাগল। একটা কম্বলও পেল। সব কিছু কুড়িয়ে কুড়িয়ে সেটায় রাখতে লাগল। এত ধন সে সারা জন্মেও দেখেনি।

লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ।
ট্রানজিস্টর রেডিও।
নোটের বাণ্ডিল।
সোয়েটার, মাফলার হ্যাট।
তালা দেয়া স্যুটকেস।

প্লাস্টিক-মোড়কে দামী বিলেতী স্যুট।

গ্রামোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার।

ক্যামেরা, এক, দুই, তিন, চারটে ক্যামেরা।

চকলেটের প্যাকেট।

হাত থেকে সিটকে পড়া ঘড়ি।

বিচ্ছিন্ন পায়ে বিলেতি জুতো।

ওরা সব মরে গেছে। ওদের আর এসব জিনিসের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে। এসব মাল সামান আমার। আমি জীবন ভর ধন খুঁজে বেরিয়েছি। এসবে আমি ছাড়া আর কারো অধিকার নেই।

সে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছিল। পাগলের মত ভাবছিল। পাগলের মতো নিজে নিজে কথা বলছিল।

একটা শিশুর (যে মরে গিয়েও হাসছিল) হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিল সে। ঘাসের উপর দু'টা বই পড়েছিল। একটা বাইবেল অপরটি ভগবদ্‌গীতা। বিনা দ্বিধায় তাও তুলে নিল সে। একটা ঝোপের আড়ালে মহাত্মা বুদ্ধের প্রতিমূর্তি একটা। তাও তুলে কম্বলের স্তূপে রাখল সে। তারপর সে আনন্দ এবং ভয়প্রকম্পিত হাতে কম্বলের গাঁট বাঁধল। বোঝাটা বেশ ভারি হল। অনেক কষ্টে সে মাথায় তুলে নিল। তারপর ধাপ খুঁজে খুঁজে নিচে নামতে লাগল সে। ততক্ষণে সূর্যালোক মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। আবার ফোটা ফোটা বৃষ্টি শুরু হলো। হঠাৎ কারো অস্ফুট কাতরানির আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। সে চারিদিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

আবার এগিয়ে চলল সে আবার সে কাতরানি। এবার আর কোন সন্দেহ রইলোনা তার। নিশ্চয়ই কোন মরণোন্মুখ মানুষ কাতরাচ্ছে।

কেউ বেঁচে আছে তা'লে--ওর বিবেকটা আর্তনাদ করে উঠল। জলদি করো-- জলদি। কেউ এসে পড়লে এ ধন নিয়ে সরতে পারবে না তুমি। ওর মনের শয়তানটা চিৎকার করে উঠল।

না, কেউ বেঁচে আছে। তাকে বাঁচাতে হবে। বিবেক বাধা দিয়ে বলল। সোনার চুড়ি---চারগাছি সোনার চুড়ি। শয়তানটা তার পুরনো সবক বাতলে দিল।

'উফ্।' তৃতীয়বার কাতর ধ্বনি শোনা গেল আবার। শংকরের চোখটা এবার ঝোপের কাছে গিয়ে আঁটকে গেল। হঠাৎই যেন তার বুকের স্পন্দনটা থমকে গেল। পার্বতী! পার্বতী এখানে পড়ে কাতরাচ্ছে আর আমি এ পাপের বোঝা নিয়ে চলেছি কোথায়? বোঝা নামিয়ে সে পার্বতীর দিকে দৌড়াল।

কিন্তু পার্বতী নয় সে। পার্বতীর মতই অন্য এক মেয়ে। পার্বতীর মতোই পাকা ধানের মতো তার গায়ের রং। কালো কুণ্ডল কেশদাম। তার আধখোলা ঠোঁট দিয়ে শ্বাস বেরুচ্ছে।

এতো পার্বতী নয় শয়তান মন ধমক দিয়ে বলল।

কিন্তু যেই হোক, সেতো জীবিত। বিবেক প্রতিবাদ করে বলল।

মেয়েটি তখনো অবশ্য জীবিত। কিন্তু বড় শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তার। দেহে কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। তবু সে অজ্ঞান। মুখাবয়ব রক্তশূন্য পাণ্ডুর। মৃত্যু ভয়াল বিভীষিকা তার ফুলের পাপড়ির মতো পেলব মুখখানাকে মসীকৃষ্ণ করে ফেলেছে। বর্ষা ক্রমশ বেড়ে চলেছে বাতাসও বাড়ছে। অচেতন অবস্থায়ও মেয়েটি ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

হঠাৎ কম্বলের কথা মনে পড়ে গেল তার। গিঁট খুলে সব কিছু উল্টে পাল্টে ফেলে কম্বলটা টেনে নিল শংকর। সব কিছু সিটকে গিয়ে ঝোপে ঝাড়ে, কাদা পানিতে যেয়ে পড়ল।

শংকরের ওসব দেখার অবসর নেই এখন। সে কম্পিত হাতে মেয়েটাকে কম্বলে জড়িয়ে নিল। মেয়েটির ঠাণ্ডা হাতগুলোও কম্বলের ভেতর নিয়ে নিল শংকর। ভেতরে নেবার সময় দেখল মেয়েটির হাতে চারগাছি সোনার চুড়ি।

কিন্তু এসময় শংকরের কাছে সোনার চুড়ির কোন মূল্য নেই। সে শুধু ভাবছে বর্ষায় ভিজে পাছে মেয়েটির নিমোনিয়া না হয়ে যায়। গরমের স্পর্শ পেয়ে মেয়েটির অধর প্রান্তে যেন এক স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। দেহে তাপ সঞ্চালনের জন্যে মেয়েটিকে সে আরো বুকের সাথে জড়িয়ে নিল। কম্বল থেকে মেয়েটির মৃদু স্পন্দন শোনা যায়। কিন্তু ক্রমেই সে স্পন্দন যেন স্তিমিত হয়ে আসছে! কি জানি গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে পেঁছিতে পারে কিনা পিচ্ছল পথে দ্রুত চলতে পারেনা। পদে পদে পড়ে যাবার ভয়। হঠাৎই এক সময় তার মনে হলো এখন সে শুধু তার নিজের স্পন্দনটুকু শুনতে পাচ্ছে। কম্বল জড়ানো

দ্বিতীয় স্পন্দনটি ততক্ষণে স্তব্ধ। সহসা তার হাতের বোঝা ভারী হয়ে গেল। যেন ফুলের সম্ভার হঠাৎ পাথর বনে গেল। সে অতি ধীর সন্তর্পণে মেয়েটিকে ঘাসে নামিয়ে রাখল।

মরে গেল মেয়েটি।

শংকর চেয়ে দেখল আধখোলা ঠোঁটে সেই স্নিগ্ধ হাসি মেয়েটির।

পরদিন সন্ধ্যায় মৃত লোকদের ক'জন আত্মীয়-স্বজন নিমগিরি থেকে ফিরে এল। তাদের এক যুবক (যার চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে গিয়েছিল) মৃদুস্বরে বলল, 'আমাদের বিয়ে এমাসেই হবার ছিল।'

'আপনি কি আপনার বাগদত্তার শব চিনতে পেরেছিলেন?

কেউ জিজ্ঞেস করল। 'জী, হা। কোন মানসিক আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। দেহে কোন যখমতো দূরের কথা একটা আঁচড়ও নেই। মনে হয় কেউ তার হাতের চুড়িগুলো খুলে নিয়েছিল বলে---'

'কেন চুড়িগুলো কি এতই দামের?'

'দাম সোনার নয়, ভালবাসার। বাগদানের সময় আমি এগুলো পরিয়েছিলাম তাকে। যদি আমি জানতাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুড়ি-গুলো তার হাতে ছিল.....

বলতে বলতে তার স্বর কান্নায় কান্নায় ভেঙ্গে আসতে লাগল। কান্না লুকাবার জন্যে সে মাথা নত করে নিল।

তার এক সাথী তাকে সে অবস্থায় রেখেই পুলিশ স্টেশনে চলে গেল। অনেকক্ষণ পর ক্রন্দনমান যুবকটি যখন মাথা উঁচু করল, সামনে একঠী গেঁয়ো যুবক দাঁড়িয়ে। তার কাপড় জীর্ণ, কাদা পানি এবং রক্তে মিশান। তার চোখও ফোলা ফোলা।

'এই নিন'।

গেয়ো যুবকটি শহুরে যুবকটির দিকে কাগজে মোড়ানো কি যেন এগিয়ে দিল। যুবকটি কাগজ খুলে দেখল সোনার চুড়ি।

'এই শোনো, তুমি এগুলো.....'

কিন্তু ততক্ষণে গেঁয়ো যুবকটি চলে গেছে। আর খুঁজে পাওয়া গেলনা তাকে।

শ্রাবণ, ১৩৭০ বাং সংখ্যা মাসিক সমকাল।